তফসীরে নূরুল কোরআন

একুশ পারা

২১

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

একুশতম খণ্ড

اقرأ باسم ربك الذي خلق

তফসীরে নূরুল কোরআন

একুশতম খন্ড

২১

একুশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ,
সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ,
সাবেক সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বোর্ড অফ গভর্ণরস.
চেয়ারম্যান, তফসীরে তাবারী শরীফ সম্পাদনা বোর্ড,
বহু গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ ইং

তৃতীয় প্রকাশ ঃ মহররম ১৪৩৩ হিঃ
ডিসেম্বর ২০১১ ইং
পৌষ ১৪১৮ বাং

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

স্বর্বস্বত্ব ঃ গ্রন্থকারের

মুদ্রণে ঃ নিউ এস, আর, প্রিন্টিং প্রেস
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা,
ফোন ঃ৯৫৫৮৯১৩

Tafseer-e Nurul Quran (V) 21, by Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam, Published by Al-Balag Publications, 12/17, Sir Sayed Ahmed Road, Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207
Phone : 01713014889
Price 350.00 Tk., $ 20

https://t.me/islaMic_fdf

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! পরম করুণাময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের মহান দরবারে অনন্ত অসীম শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের একুশতম খণ্ড রচনা ও প্রকাশনার তওফিক দান করেছেন। এজন্যে তাঁর পাক দরবারে আদায় করি সেজদায়ে শোকরানা।

আর অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নেক নজরের বরকতে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ অহরহ আমরা লাভ করছি এবং তফসীরে নূরুল কোরআনের একুশতম খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। হে আল্লাহ! দরুদ পেশ কর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, এত বেশী যেন সে দরুদ আসমান জমিনকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

যে মহান গ্রন্থ আল্লাহ পাকের সাথে তাঁর বন্দার সম্পর্ককে ঘণিষ্ঠতর করে,

যে পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে বন্দা স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়,

যে বিশ্ব গ্রন্থ পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তন করে দিয়েছে,

যে বিশ্ব গ্রন্থ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, যা সমগ্র পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে।

যে মহা গ্রন্থ আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে শুধু যে আত্মসচেতন করেছে তাই নয়; বরং বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত লাভের পথও সুগম করেছে,

যে মহান গ্রন্থ বিশ্ব সভ্যতায় অমর অবদান রেখেছে,

যে মহান গ্রন্থ বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করেছে, বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছে,

যে মহান বাণী নিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ২৩ বছরের মধ্যে ২৪ হাজার বার আসতে হয়েছে,

যে মহান গ্রন্থে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বকালের মানুষের জন্য একমাত্র সুন্দরতম মহত্তম আদর্শ, সে অবিস্মরণীয় গ্রন্থই হলো পবিত্র কোরআন।

স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক মানব জাতিকে দান করেছেন তার রুহ এবং দেহ। দেহের উপজীবিকার সংস্থান রেখেছেন তিনি মাটিতে, তাই সারা বিশ্বের মানুষ তার খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করে মাটি থেকে, আর রুহের খাবার রেখেছেন পাক কোরআনে। দেহ যদি তার খাদ্য না পায় তবে মানুষ অনাহার-ক্লিষ্ট হয়ে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যায়, অন্যদিকে রুহের খাবার পেতে হলে পবিত্র কোরআন থেকেই তা সংগ্রহ করতে হয়। এজন্যে যারা পবিত্র কোরআন থেকে রুহের আহার্য সংগ্রহ করে না, তারা সত্যিকার অর্থে জীবন-মৃত, তাদের জীবন অশান্ত, দুর্বিষহ, এজন্যেই আজকের পৃথিবী অশান্ত কেননা, আজকের পৃথিবী পবিত্র কোরআনের শিক্ষা বিবর্জিত। অতএব, পবিত্র কোরআন পাঠ করা, তার মর্মবাণী উপলব্ধি করা এবং কোরআনে পাকের মহান শিক্ষার উপর আমল করা, তার প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করা কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের তাগিদেই আজ থেকে প্রায় দু' যুগ পূর্বে শুরু হয় তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের শোকর কোন্ ভাষায় আদায় করবো তা জানিনা, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, শুধু আল্লাহ পাকের রহমতেই এ মহান গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন, পবিত্র কোরআন হলো হেদায়েত ও রহমত। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

إِنَّهُ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"নিশ্চয় মোমেনদের জন্যে কোরআন হেদায়েত ও রহমত"।

অতএব, আল্লাহ পাকের রহমত ও হেদায়েত পেতে হলে পবিত্র কোরআন থেকেই তা লাভ করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে, পবিত্র কোরআন শুধু কি মোমেনদের জন্যেই রহমত ও হেদায়েত, সমগ্র বিশ্ববাসী কি তার হেদায়েত থেকে বঞ্চিত? এর জবাব রয়েছে অন্য আয়াতে-

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِينَ

(সূরা তাকভীর)

"এটি তো শুধু সমগ্র বিশ্বের জন্যে উপদেশ মাত্র"।

অতএব, সর্বকালের সকল মানুষের জন্যেই রয়েছে পবিত্র কোরআনে হেদায়েত এবং নসিহত। তবে পবিত্র কোরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে কিছু পূর্বশর্তও রয়েছে আর তা হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর প্রতি ভয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"এই কিতাব পথপ্রদর্শক সে সব লোকদের জন্যে, যারা মোত্তাকী বা পরহেযগার"।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা সংযম-চর্চা করে, যারা সতর্কতা অবলম্বন করে, যারা তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে, তারাই পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করে এবং আল্লাহ পাকের রহমত লাভে ধন্য হয়। পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের আরো কিছু শর্ত রয়েছে,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (সূরা কা'ফ)

অর্থাৎ নিশ্চয় এই কোরআনে অবশ্যই নসিহত রয়েছে সে ব্যক্তির জন্যে যার অন্তর রয়েছে, তথা যে বিবেকবান, যে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে।

পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের অন্য একটি শর্ত হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন জীবন্ত, চলন্ত কোরআন। পবিত্র কোরআন তাঁর প্রতিই নাজিল হয়েছে। তিনিই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর যা কিছু পবিত্র কোরআনে রয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান জীবনে।

আর যারা পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে, তারা আল্লাহ পাকের নূরের মধ্যে নিমজ্জমান থাকে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ (সূরা যুমার)

"আল্লাহ পাক ইসলামকে বুঝবার জন্যে যার মনের কপাট খুলে দিয়েছেন, সে তার প্রতিপালকের নূরের মধ্যে রয়েছে"।

দুনিয়াতে যে আল্লাহ পাকের নূরের মধ্যে থাকে, পবিত্র কোরআনের নূরানী হেদায়েত লাভ করে, পরকালে তার স্থান হবে নূরের তৈরী জন্নাতে।

অতএব, তফসীরে নূরুল কোরআনের একুশতম খণ্ডের সমাপ্তির এ শুভ-ক্ষণে এ দোয়া করি, হে আল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআনের এই সাধনাকে কবুল কর। পবিত্র কোরআনের নূরানী হেদায়েত গ্রহণ ও বরণ করার তওফিক দান কর এবং পবিত্র কোরআনের আলো বিকীরণের সুযোগ দান কর। হে আল্লাহ! তোমার খাছ রহমতে তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর। হে আল্লাহ! যারা তফসীরে নূরুল কোরআন পাঠ করে, এর প্রচার-প্রসারে অংশ গ্রহণ করে, সকলকে তোমার প্রিয় বন্দা হিসেবে কবুল করে নিও। হে আল্লাহ! আমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, আপনজনদের প্রতি এককথায় সকল মোমেনের প্রতি খাছ রহমত নাজিল কর।

হে আল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআনের এ সাধনাকে সহজ করে দাও, তোমার রহমতের চাদর দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে রাখ।

হে আল্লাহ! তোমার পেয়ারা হাবীব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠের এবং তাঁর মহান আদর্শের অনুসরণের তওফিক দান কর। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

২০.১২.৯৪

https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র

১।	প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	২
২।	নামাজ মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে	৩
৩।	আল্লাহর জিকর	৬
৪।	আয়াতের মর্মবাণী	৯
৫।	আহলে কেতাবদের সঙ্গে আচরণের পদ্ধতি	১১
৬।	পবিত্র কোরআন সংরক্ষিত	২০
৭।	শানে নজুল	২৬
৮।	শানে নজুল	২৯
৯।	হিজরতের আদেশ	৩০
১০।	শানে নজুল	৩৬
১১।	আল্লাহ পাকের নেয়ামত	৪৫
১২।	সূরা রুম প্রসঙ্গে	৫০
১৩।	পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৫৪
১৪।	মোমেনগণ আনন্দিত হবে	৫৭
১৫।	জয় পরাজয় আল্লাহ পাকের হাতে	৫৯
১৬।	সৃষ্টির বুকে কেয়ামতের প্রমাণ	৭৮
১৭।	মানব সৃষ্টির ইতিকথা	৮০
১৮।	মানুষের প্রধানতম কর্তব্য	৮২
১৯।	দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি	৮৩
২০।	আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের নিদর্শন	৮৮
২১।	আয়াতের মর্মকথা	৯০
২২।	শেরকের বাতুলতার একটি দৃষ্টান্ত	৯৩
২৩।	স্বভাব ধর্মের উপর স্থির থাক	৯৭
২৪।	নাজাত লাভের উপকরণ	১০১
২৫।	আয়াতের মর্মবাণী	১০৫
২৬।	শেরক বিবেক বর্জিত	১০৬
২৭।	কাফেরদের বিচিত্র চরিত্র	১০৬
২৮।	মোমেনের অবস্থা বিস্ময়কর	১০৭
২৯।	সুখ দুঃখ আল্লাহ পাকেরই নিয়ন্ত্রণে	১০৭
৩০।	শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই হতে হবে দান-খয়রাত	১১১
৩১।	আয়াতের মর্মকথা	১১৪
৩২।	তওহীদের প্রমাণ	১১৪

৩৩।	নাজাতের জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত	১২০
৩৪।	প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	১২৫
৩৫।	একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	১২৬
৩৬।	বৃষ্টিপাতের মূল কারণ	১২৮
৩৭।	প্রিয়নবী (দঃ)-এর একটি মোজেযা	১২৮
৩৮।	প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	১৩২
৩৯।	মৃত ব্যক্তিরা কি কথা শুনতে পারে?	১৩৩
৪০।	প্রিয়নবী (দঃ) কে সান্ত্বনা	১৩৯
৪১।	সূরা লোকমান প্রসঙ্গে	১৪৪
৪২।	শানে নজুল	১৪৭
৪৩।	আয়াতের মর্মকথা	১৪৯
৪৪।	নাফরমানীর শাস্তি দুনিয়াতেও হয়	১৫০
৪৫।	হেকমতের তাৎপর্য	১৫৬
৪৬।	লোকমান কি নবী ছিলেন?	১৫৭
৪৭।	লোকমান সম্পর্কে আরও কথা	১৫৮
৪৮।	শোকরের তাৎপর্য	১৬০
৪৯।	শেরক হলো মহাপাপ	১৬১
৫০।	পিতা-মাতার হক্ব	১৬২
৫১।	ঈমানের দৃঢ়তা	১৬৬
৫২।	আয়াতের মর্মকথা	১৬৬
৫৩।	অহংকার পরিহার কর	১৭১
৫৪।	লোকমান হাকীমের আরও কিছু উপদেশ	১৭৫
৫৫।	প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নেয়ামত	১৭৮
৫৬।	প্রকৃত মোমেনদের জন্যে সু-সংবাদ	১৮২
৫৭।	প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	১৮৪
৫৮।	শানে নজুল	১৮৬
৫৯।	সূর্যের গন্তব্য কোথায়?	১৯১
৬০।	আল্লাহ পাকই ধ্রুব সত্য	১৯২
৬১।	শানে নজুল	১৯৬
৬২।	কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা	১৯৮
৬৩।	ইহুদী-নাসারাদের আকীদার বাতুলতা ঘোষণা	১৯৮
৬৪।	আয়াতের মর্মকথা	২০০
৬৫।	আয়াতের মর্মকথা	২০৩
৬৬।	সূরা সজদা প্রসঙ্গে	২০৬
৬৭।	এ সূরার ফজিলত	২০৬
৬৮।	এ সূরার আমল	২০৬
৬৯।	কেয়ামতের দিনের সময়ের পরিমাণ	২১২
৭০।	জীবনঃ মৃত্যুঃ পুনর্জীবন	২১৯

৭১।	মৃত্যু সম্পর্কে আরও কথা	২২০
৭২।	পুনর্জীবন পুনরুত্থান কঠিন নয়	২২৩
৭৩।	মোমেনদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য	২২৮
৭৪।	কল্যাণ অর্জনের পথ	২২৯
৭৫।	মোমেনদের উদ্দেশে সু-সংবাদ	২৩৪
৭৬।	শানে নজুল	২৩৬
৭৭।	মোমেন ও কাফের এক সমান নয়,	২৩৬
৭৮।	মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য	২৩৭
৭৯।	দুনিয়াতে হবে লঘু শাস্তি	২৪০
৮০।	আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা	২৪২
৮১।	পূর্ণ বিশ্বাস এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা	২৪৫
৮২।	আয়াতের মর্মকথা	২৪৬
৮৩।	মুর্শেদে কামেলের বৈশিষ্ট্য	২৪৬
৮৪।	কেয়ামতের দিন হবে ফয়সালা	২৪৮
৮৫।	শানে নজুল	২৫১
৮৬।	সূরা আহযাব প্রসঙ্গে	২৫৫
৮৭।	পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২৫৬
৮৮।	এই সূরার ফজিলত	২৫৬
৮৯।	শানে নজুল	২৫৬
৯০।	শানে নজুল	২৫৯
৯১।	নবীর সাথে উম্মতের সম্পর্ক	২৬৬
৯২।	প্রিয়নবী (দঃ) সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী	২৭৩
৯৩।	আহযাব যুদ্ধ	২৭৬
৯৪।	'ইয়াসরেব' নামটি বর্জনীয়	২৯৯
৯৫।	ঈমানের পরীক্ষা	৩০১
৯৬।	প্রিয়নবী (দঃ) সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র আদর্শ	৩১১
৯৭।	প্রিয়নবী (দঃ)-এর অনুসরণ একান্ত কর্তব্য	৩১২
৯৮।	মোমেন ও মোনাফেকের মধ্যে পার্থক্য	৩১৪
৯৯।	এ আয়াত সম্পর্কে একটি বর্ণনা	৩১৭
১০০।	মোমেনদের ত্যাগ-তিতিক্ষা	৩১৭
১০১।	যুদ্ধের তাৎপর্য	৩২০
১০২।	দুশমন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল	৩২০
১০৩।	বণী কোরায়জার শোচনীয় পরিণতি	৩২১
১০৪।	প্রিয়নবী (দঃ)-এর বিস্ময়কর বদান্যতা	৩৩২
১০৫।	হযরত সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ) প্রসঙ্গে	৩৩৩
১০৬।	শানে নজুল	৩৩৬
১০৭।	দুনিয়া ও আখেরাত	৩৩৬

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

একুশ পারা

একুশতম খন্ড

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ
اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ
یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ
اَحْسَنُ ۖۗ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْنَا
وَاُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾
وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ
یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰۤؤُلَآءِ مَنْ یُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَاۤ
اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾

তরজমা

(৪৫) (হে রসূল!) আপনার প্রতি যে কিতাব নাজিল করা হয়েছে তা পাঠ করুন এবং নামাজ কায়েম করুন; নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ পাকের স্মরণ অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ পাক তা জানেন।

(৪৬) আর তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করোনা। অবশ্য যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী তাদের সাথে যথোচিত কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পার; আর তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি সে গ্রন্থের প্রতি যা আমাদের নিকট নাজিল হয়েছে এবং যা তোমাদের নিকটও নাজিল হয়েছে, আর তোমাদের ও আমাদের

মা'বুদ একই, আর আমরাও তাঁরই অনুগত।

(৪৭) আর এভাবেই আমি (হে রসূল!) আপনার নিকট কিতাব নাজিল করেছি, তবে যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে; আর এ মক্কাবাসীদের কেউ কেউ তা মানে; আর একমাত্র কাফেররাই আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তওহীদের বিবরণ ছিল। আর একথাও উল্লেখ করা হয়েছিল যে নবী রসূলগণ যুগে যুগে মানুষকে তওহীদের আহবান জানিয়েছেন এবং শেরক থেকে বিরত রেখেছেন। কিন্তু যারা নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে আপনি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করুন, যাতে রয়েছে তওহীদের কথা এবং পূর্ব কালের জাতিগুলোর ইতিকথা। হয়তো পবিত্র কোরআনের আলো বিচ্ছুরিত হলে তাদের মনের অন্ধকার দূর হতে পারে এবং শ্রোতারা পবিত্র কোরআনের বরকত লাভে ধন্য হতে পারে।[১]

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা। এ মর্মে যে মক্কার কাফেরদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত থাকতেন, তাই আল্লাহ পাক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এ আয়াতে এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আপনি পবিত্র কোরআন পাঠ করুন, যা আপনার নিকট নাজিল হচ্ছে, যাতে করে আপনি জানতে পারেন যে ইতিপূর্বে নূহ (আঃ) সহ অন্যান্য নবী রসূলগণ কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে কী অক্লান্ত সাধনা করেছেন, আর কাফেররা কিভাবে নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে এবং তাঁদের প্রতি উৎপীড়ন-নির্যাতন করেছে।[২]

اُتْلُ مَا اُوْحِیَ

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলোঃ (হে রসূল!) যে ওহী আপনার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে তা আপনি পাঠ করুন, যাতে করে এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ হয়, তাঁর বিধি-নিষেধ সংরক্ষিত হয় এবং পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করা সহজ হয়। কেননা বারবার পাঠ করার মাধ্যমে আয়াত

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৩
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠাঃ ৭১

সমূহের নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার নির্দেশ রয়েছে, এরপর নামাজ কায়েম করার হুকুম করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে আমলের পূর্বে এলম হাসিল করা জরুরী। এলম ব্যতীত আমল অপূর্ণ।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে একদিকে পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ও মহিমা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের পথ-নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের দু'টি মাধ্যমের উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। একঃ পবিত্র কোরআন পাঠ, দুইঃ নামাজ কায়েম করা। পবিত্র কোরআন পাঠের মাধ্যমে মানব মনে আসে শান্তি এবং সান্ত্বনা, মানুষের নয়ন-মন লাভ করে পরিতৃপ্তি, অর্জিত হয় জ্ঞান এবং উপদেশ, বরকত এবং রহমত। এরপর আদেশ হয়েছেঃ

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ ط

অর্থাৎ যথা নিয়মে নামাজ কায়েম কর। নামাজের মাধ্যমে বন্দা আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে হাযির হয় এবং তাঁর নৈকট্য-ধন্য হয়। আর এ নৈকট্যই বন্দাকে আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় নাফরমানী থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط

"নিশ্চয় নামাজ মানুষকে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে"।

নামাজ মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে

নামাজে দন্ডায়মান হওয়ার কারণে মানব মনে আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের যে উপলব্ধি আসে তা অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে মানুষকে অবশ্যই বিরত রাখে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, নামাজের কারণে মানব মনে আল্লাহ্ পাকের ভয়ের উদ্রেক হয় আর তা মানুষকে পাপাচার থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী যুবক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে বিভিন্ন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হতো। তার এ অবস্থা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হয়। তখন তিনি এরশাদ করেন, তার নামাজ তাকে একদিন এসব গুনাহ্ থেকে বিরত করবে। কিছুদিন পর তাই হলো। সে তওবা করে ফেললো এবং

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮০৯

তার অবস্থা ঠিক হয়ে গেল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, নামাজের মধ্যে পাপাচার প্রতিরোধ করার শক্তি রয়েছে। এজন্যে যার নামাজ তাকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয়না এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেনা, তার নামাজ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে তার জন্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

তফসীরকার হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে তার নামাজ অশ্লীল, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে না, সে নামাজ তার জন্যে বিপদের কারণ হবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে صلوة শব্দটি কোরআন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ বাক্যে صلوة শব্দটি নামাজে কোরআন পাঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, নিশ্চয় কোরআন মানুষকে অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পবিত্র কোরআন যাবতীয় অন্যায় অনাচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়, তবে সাধারণতঃ পূর্বোক্ত অর্থই গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ নামাজই মানুষকে অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে বিরত রাখে।

আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বসন্ত-কলেরার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে যেভাবে টীকা বা ইনজেকশন দিয়ে থাকেন এবং তার দ্বারা উপকারও হয়, ঠিক তেমনি অন্যায়-অশ্লীলতা এক কথায় পাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নামাজ প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেভাবে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন, ইনজেকশন গ্রহণ রোগ নিরাময়ের জন্যে বা রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জরুরী মনে করা হয়, ঠিক তেমনি যথা নিয়মে নামাজ আদায়ের মাধ্যমেও মানব মন পাপাচার থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। নামাজে আন্তরিকতা, মনের একাগ্রতা, আল্লাহ পাকের ভয়, তাঁর রহমতের আশা, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি যত অধিক পরিমাণে হবে, নামাজ তত বেশী পাপাচার থেকে বিরত রাখতে সফল হবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নামাজের মাধ্যমে হাযির হয়, নিজের দীনতা-হীনতা স্বীকার করে এবং বিনয় প্রকাশ করে, জীবনের কৃত অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা প্রার্থী হয় এবং আল্লাহ পাকের আযাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, তার পক্ষে নামাজের পর পুনরায় পাপাচারে লিপ্ত হওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে! নামাজী ব্যক্তি যখন দরবারে এলাহীতে হাযির হয়, তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রকাশ করে, তার অন্তর সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ভয়ে কম্পমান থাকে, সে প্রথমে দন্ডায়মান অবস্থায়, পরে রুকু অবস্থায়, অবশেষে সেজদারত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে মিনতি প্রকাশ করে, এরপর তার পক্ষে অন্যায়-অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নামাজের রুকু, সেজদা, আরকান, আহকাম যথা নিয়মে হতে হবে, সবার উপরে নামাজের উদ্দেশ্য সফল হতে হবে, আর তা হলো আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বন্দা সেজদারত অবস্থায় আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য হয়, আর আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম হলো তাঁর স্মরণ, তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"আমার স্মরণেই নামাজ কায়েম কর"।

অতএব, যে নামাজে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফলত থাকে, সে নামাজ অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখেনা। নামাজ হতে হবে সঠিকভাবে, যথা নিয়মে, আল্লাহ পাকের স্মরণে বিভোর অবস্থায়, এমন নামাজই মানুষকে অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।[১]

এবনে জরীর, এবনে মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, নামাজের মধ্যে এমন একটি শক্তি রয়েছে যা মানুষকে অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।

আবদ এবনে হুমায়েদ আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, নামাজ মানুষকে অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে বিরত রাখে। কেননা নামাজের তিনটি বৈশিষ্ট রয়েছেঃ এখলাছ, আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর জিকর। যে নামাজে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকবে, তা প্রকৃত অবস্থায় নামাজই নয়। অতএব, এখলাছ তথা শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কাজ করা মানুষকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আর আল্লাহর ভয় মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। জিকরুল্লাহ হল পবিত্র কোরআন যা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে।

এবনে আবি হাতেম এবং এবনে মরদবিয়া হযরত এমরান এবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি এরশাদ করেনঃ যাকে তার নামাজ মন্দ কাজ থেকে বিরত না রাখে তা নামাজই নয়।

আর এবনে আবি হাতেম, তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তিকে তার নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত না রাখে সে নামাজ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে শুধু দূরত্বই সৃষ্টি করে।

হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৭৮-৭৯
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ১৫৮

আল্লাহর জিকর

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

"আর আল্লাহ পাকের জিকর হলো সর্বাপেক্ষা বড়"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের জিকরের মহিমা সর্বাধিক।

বস্তুতঃ সব কিছুরই একটি দেহ বা আকৃতি থাকে এবং একটি প্রাণও থাকে। আল্লাহর জিকর হলো সকল এবাদতের প্রাণ। আল্লাহ পাকের জিকর ব্যতীত বন্দেগী প্রাণহীন অসার দেহের ন্যায়। নামাজের আকারে তথা নামাজরত অবস্থায় যখন মানুষ আল্লাহর জিকরে মশগুল হয় তখন তার গুরুত্ব বেড়ে যায় অনেক বেশী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করেনা তারা যথাক্রমে জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এ বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

فَاذْكُرُوْنِیْٓ اَذْكُرْكُمْ (সূরা বাকারা)

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো"।

একটি প্রবাদ বাক্য আছেঃ

من احب شيئا اكثر ذكره

"যে কোন কিছুকে ভালবাসে সে অধিক পরিমাণে তাকে স্মরণ করে"।

অতএব, আল্লাহর জিকর আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর যে আল্লাহকে যত বেশী ভালবাসবে সে তাঁকে তত বেশী স্মরণ করবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছেঃ

كان يذكر الله فى كل احيانه

অর্থাৎ তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকর করতে থাকতেন।

এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে তিনি আল্লাহ পাককে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। আর আল্লাহ পাকের দরবারে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক প্রিয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের এরশাদ হলো, আমি আমার বন্দার সাথে তেমন ব্যবহারই করি যেমন সে আমার সম্পর্কে ধারণা করে। আর যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি, যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে সেভাবে স্মরণ করি, আর যদি সে আমাকে কোন মজলিসে স্মরণ করে আমি তার চেয়ে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি, যদি বন্দা আমার দিকে অগ্রসর হয় অর্ধহাত তাহলে আমি অগ্রসর হই পূর্ণ এক হাত, আর যদি সে অগ্রসর হয় পূর্ণ এক হাত, আমি তার দিকে

অগ্রসর হই দু' হাত, যদি সে আমার দিকে আসে পদব্রজে তবে আমি তার দিকে যাই দ্রুতবেগে। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিজী, নাসায়ী)

একবার একজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাকের হুকুম তো অনেকই রয়েছে, তবে আমাকে একটি বিষয় শিক্ষা দিন যাকে আমি সর্বক্ষণের কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। তখন তিনি এরশাদ করেনঃ সর্বদা তুমি আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকবে।

মূলতঃ এ কারণেই অন্য একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ বেহেশতে গমনের পর বেহেশতবাসীগণ দুনিয়ার কোন জিনিসের জন্যে আক্ষেপ করবে না, শুধু জীবনের সে মূহূর্তের জন্যে আক্ষেপ করবে যা আল্লাহ পাকের জিকর ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে।

হযরত সালমান (রাঃ) সহ একদল সাহাবায়ে কেরাম একবার মসজিদে নববীতে আল্লাহর জিকরে মশগুল ছিলেন, এমন সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের মধ্যে আগমন করলে তাঁরা নীরব হয়ে গেলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি করছিলে'? তাঁরা আরজ করলেন, 'আমরা আল্লাহর জিকরে মশগুল ছিলাম'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'আমি লক্ষ্য করছিলাম যে তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হচ্ছিল, তখন আমার ইচ্ছা হলো আমি যেন তোমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করি'।

এরপর তিনি আরও এরশাদ করেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন যাদের সঙ্গে উপবিষ্ট হওয়ার আদেশ আমার প্রতি হয়েছে'।

হযরত আবু দরদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলবো না? যা তোমাদের মালিকের নিকট সর্বোত্তম ও পবিত্র এবং সকল আমলের চেয়ে অধিকতর মর্তবার অধিকারী, আল্লাহর রাহে স্বর্ণ রৌপ্য দান করা থেকেও উত্তম, জেহাদের চেয়েও উত্তম যেখানে দুশমনের মোকাবেলা করা হয়, তাদের প্রাণ সংহার করতে হয় অথবা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'অবশ্যই বলুন'। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'আল্লাহর জিকর'।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন্ বন্দা সর্বোত্তম এবং আল্লাহ পাকের দরবারে উচ্চ মরতবা লাভকারী? তিনি এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী নারী পুরুষ'। তখন আরজ করা হয়, 'হে আল্লাহর রসূল! সে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে মুজাহেদের চেয়েও কি উত্তম'? তখন তিনি এরশাদ করেন, মুজাহেদ যদি কাফেরদেরকে এত আঘাত করে যে তার তলোয়ার ভেঙ্গে যায় এবং রক্তে রঙ্গিন হয়ে যায় তখনও আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী উত্তম'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে বশর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একজন গ্রামীন ব্যক্তি প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম'? তিনি এরশাদ করলেন, 'আনন্দ সে ব্যক্তির জন্যে যার বয়স হয় দীর্ঘ এবং আমল হয় উত্তম'। ঐ ব্যক্তি আরজ করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি এরশাদ করলেন, 'উত্তম হল তুমি এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ কর যে তোমার রসনা আল্লাহর জিকর দ্বারা সিক্ত থাকে'। (আহমদ, তিরমিজী)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার পথ দিয়ে গমন করছিলেন, তখন একটি পাহাড় অতিক্রম করছিলেন। পাহাড়টির নাম ছিল হামদান। তিনি এরশাদ করলেন, 'চল এটি হলো হামদান। আহলে তফরীদ এগিয়ে গেছে'। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'আহলে তফরীদ কারা'? তিনি এরশাদ করলেন, 'তারা হলো আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী নারী পুরুষ (মুসলিম শরীফ)'।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের কিছু ফেরেশতা জিকরুল্লায় মশগুল লোকদের অনুসন্ধান করে থাকে। যখন তারা কোন দলকে আল্লাহর জিকরে রত দেখতে পায় তখন তারা একে অন্যকে ডেকে বলে, আস এখানেই তোমাদের উদ্দেশ্য। এরপর ফেরেশতাগণ আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (যদিও তিনি সম্পূর্ণ অবগত), 'আমার বন্দারা কী বলছিল?' ফেরেশতাগণ আরজ করে, 'তারা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছিল, তোমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিল, তোমার প্রশংসায় রত ছিল (অর্থাৎ তারা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর বলছিল)। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'তারা কি আমাকে দেখেছে'? ফেরেশতাগণ আরজ করে, 'না, আল্লাহর শপথ! তারা তোমাকে দেখেনি'। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'যদি তারা আমাকে দেখতো তবে কি অবস্থা হতো'? ফেরেশতাগণ আরজ করে, 'যদি তারা তোমাকে দেখতো তবে তোমার এবাদতে এবং তোমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় অধিক পরিমাণে মশগুল থাকতো'। তখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা কি চায়'? ফেরেশতাগণ আরজ করে, 'তারা তোমার নিকট জান্নাত চায়'। তখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা কি জান্নাত দেখেছে'? ফেরেশতাগণ আরজ করে, 'আল্লাহর শপথ! তারা জান্নাত দেখেনি'। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'যদি তারা জান্নাত দেখতো তবে তাদের কি অবস্থা হতো'? ফেরেশতগণা আরজ করে, 'যদি তারা জান্নাত দেখতো তবে তাদের জান্নাতের আকাংক্ষা আরও বৃদ্ধি পেতো'। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা কোন্ জিনিস থেকে বাঁচতে চায়'? ফেরেশতাগণ আরজ করে, 'তারা দোযখ থেকে বাঁচতে চায়'। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা কি দোযখ দেখেছে'? ফেরেশতাগণ আরজ করে, 'না, আল্লাহর শপথ! তারা দোযখ দেখেনি'। তখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেন, 'যদি তারা দোযখ দেখতো তবে তাদের কি অবস্থা

হতো'? ফেরেশতাগণ আরজ করে, 'যদি তারা দোযখ দেখতো তবে তারা দোযখ থেকে আরো বেশী পলায়নের চেষ্টা করতো'। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, 'তোমরা স্বাক্ষী থাক, আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি'। তখন একজন ফেরেশতা আরজ করে, 'তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যে জিকরের উদ্দেশে এখানে আসেনি'। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, 'তারা এমন লোক যে তাদের সাথে উপবিষ্ট ব্যক্তিও বঞ্চিত হয় না (বোখারী শরীফ)'।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যারা আল্লাহ্ পাকের জিকরের উদ্দেশে বসে, ফেরেশতাগণ তাদের উপর ছড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং জিকরে মশগুল ব্যক্তিদের উপরও সান্ত্বনা বর্ষিত হয়।

আয়াতের মর্মবাণী

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

"আর আল্লাহর জিকর সর্বাপেক্ষা বড়"।

একথার তাৎপর্য হলো আল্লাহ্ পাকের জিকরের মহিমা সর্বাধিক। আল্লাহর জিকর করা হলে তার বরকতে সকল গুনাহ্ দূরীভূত হয়। এ ব্যাখ্যা করেছেন এবনে আতা (রঃ)। তিনি আরও বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'জিকরুল্লাহ্' শব্দ দ্বারা সে নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। বাক্যটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, যেহেতু নামাজে আল্লাহ্ পাকের জিকর হয়ে থাকে তাই নামাজ মানুষকে নেকীর দিকে তথা কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার থেকে বিরত রাখে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা করেছেন আর তা হলো আল্লাহ্ পাক যে তোমাদেরকে স্মরণ করেন তা তোমাদের এ স্মরণ থেকে অনেক বড় এবং মহিমাপূর্ণ যা তোমরা তাঁর স্মরণে কর।[১]

কেননা অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ

(সূরা বাকারা)

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো"।

আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাকে স্মরণ করবেন, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বন্দার জন্যে আর কিছুই হতে পারেনা। আর আল্লাহ্ পাকের স্মরণ যে শ্রেষ্ঠতর একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এবনে জরীর আবি মালেক (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো, বন্দা যখন নামাজে আল্লাহ্ পাকের জিকর করে তখন তা নামাজের চেয়েও বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর আবদ এবনে হোমায়েদ এবং এবনে জরীর তফসীরকার কাতাদা

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮২

(রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এর অর্থ হলোঃ

لا شئ اكبر من ذكر الله

অর্থাৎ আল্লাহর জিকরের চেয়ে বড় কোন জিনিসই নেই।

আর আহমদ, এবনুল মুনজের হযরত মাআজ এবনে জাবালের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ যত আমল করে তন্মধ্যে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষাকারী আমল আল্লাহর জিকরের চেয়ে অধিক উপকারী আর কোন আমলই নেই।

এবনে মুনজের, হাকেম, বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কোন্ আমল সর্বোত্তম'? তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর জিকর সর্বশ্রেষ্ঠ'।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কোন্ আমল সর্বোত্তম'? তিনি বলেন, 'তুমি কি পবিত্র কোরআন পাঠ কর না'? তাতে রয়েছেঃ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ এর অর্থ হলো لا شئ اكبر من ذكر الله অর্থাৎ আল্লাহ পাকের জিকরের চেয়ে উত্তম কোন কিছুই নেই।[১]

ذكر শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৫২ বার উল্লেখিত হয়েছে। শুধু 'স্মরণ' অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, ذكرশব্দটি দ্বারা স্থান বিশেষে পবিত্র কোরআনকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○ (সূরা হিজর)

"নিশ্চয় আমি কোরআন নাজিল করেছি এবং অবশ্যই আমিই তার হেফাজতকারী"।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○

"তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ পাক তা জানেন"।

অর্থাৎ কে আল্লাহ পাকের জিকর করে আর কে করেনা, আল্লাহ পাক তা ভাল ভাবেই জানেন। কেননা তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ তাঁর নখদর্পণে রয়েছে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। যে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে তার প্রাপ্য পুরস্কার দান করবেন। আর যে তাকে ভুলে থাকে সে অবশ্যই তার পরিণতি ভোগ করবে।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তথা তিনটি কর্মসূচী প্রদান করা হয়েছেঃ

(১) পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা,

(২) নামাজ কায়েম করা,

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ১৫৯

(৩) আল্লাহ পাকের জিকর করতে থাকা।

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! এ কাফেররা যে আপনার বিরোধিতা করছে আপনি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না; আপনি আপনার রেসালতের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন, এ উদ্দেশে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকুন, এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহ পাকের অধিকতর নৈকট্য লাভে সফল হবেন। কেননা পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। এর দ্বারা শুধু যে আপনি রূহানী শক্তি লাভ করবেন তাই নয়; বরং বারবার পবিত্র কোরআন পাঠ করার কারণে এর মর্মবাণী এবং বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্য আপনার নিকট প্রকাশিত হবে। এতদ্ব্যতীত, যেহেতু পবিত্র কোরআনে পূর্বকালের নবী রসূলগণের ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে, সে সম্পর্কে অবগত হলে আপনার মনে আসবে সান্ত্বনা। পবিত্র কোরআন পাঠ করে অন্যদেরকে শুনিয়ে দিন যাতে করে তাদের অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং তারা আল্লাহ পাকের পথের সন্ধান পায়। এতদ্ব্যতীত আপনি নামাজ কায়েম করুন। কেননা এটি উত্তম এবাদত। শারীরিক এবাদতগুলোর মধ্যে নামাজ হলো শীর্ষস্থানীয়। নামাজের মধ্যে তসবীহ-তাহ্‌লীল, তেলাওয়াতে কোরআন এবং এবাদতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। নামাজের প্রারম্ভে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ পাকের দরবারে হাত বেঁধে দণ্ডায়মান হতে হয় এবং এর পরিসমাপ্তিতে দরবারে এলাহীতে বিনীতভাবে বসতে হয় এবং আরজী পেশ করতে হয়। তাই যদি যথা নিয়মে নামাজ আদায় করা হয় তবে তা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের একটি কার্যকর পন্থায় পরিণত হয়। অবশেষে আল্লাহর জিকরের মাধ্যমে বন্দা আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় হয়।

আহলে কেতাবদের সঙ্গে আচরণের পদ্ধতি

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

"আর তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করোনা, অবশ্য তাদের মধ্যে যারা সীমা লংঘনকারী তাদের সাথে যথোচিত কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পার"।

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরেকদের সাথে আচরণের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে আহলে কেতাবদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হবে তার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে।

মূলতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা শরীফে এবং মদীনা শরীফে ইসলাম প্রচার করছিলেন তখন বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ইসলামের বিরোধিতা করে। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কাফের–মুশরেকরাই ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে মদীনা তাইয়্যেবায় আহ্‌লে কেতাবদের সঙ্গে মুসলমানদের মোকাবেলা করতে হয় অর্থাৎ ইহুদী-নাছারারা মদীনা তাইয়্যেবায় প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়ায়। এতদ্ব্যতীত যারা ঈমানের দাবীদার ছিল কিন্তু ঈমানদার ছিল না, সেই মুনাফেকরাও মুসলমানদের পথের কাঁটা হয়ে

দাঁড়ায়। আলোচ্য আয়াতে আহলে কেতাবদের সঙ্গে যে আচরণ করা সমীচিন হবে তারই পথ-নির্দেশ করা হয়েছে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আহলে কেতাবরা পথভ্রষ্ট হলেও তাদের ধর্মের মূলে ভুল ছিল না। তাদের নিকট আসমানী গ্রন্থ ছিল কিন্তু তারা তা বিকৃত করে ফেলে। পক্ষান্তরে মুশরেকদের ধর্মের কোন ভিত্তিই ছিল না। তাই প্রতিপক্ষ হলেও আহলে কেতাব এবং মুশরেকদের সঙ্গে একই সমান আচরণ করা চলে না। আহলে কেতাবদের সঙ্গে বিতর্ক হলেও ভদ্র, নম্র এবং সংযত ভাবে তা করতে হবে, যাতে করে তারা সত্যকে গ্রহণ করার অবস্থায় থাকে। যদি কথা-বার্তায় কোন লোককে উত্তেজিত করা হয়, মন্দ আচরণ দ্বারা বা কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে যদি কারো মন আহত করা হয় তবে সে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

"আর তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কেতাবদের সাথে বিতর্ক করোনা"।

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

لا تجادلوا هم بالسيف

অর্থাৎ আহলে কেতাবদের সাথে তলোয়ার দ্বারা মোকাবেলা করোনা।

اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সীমা লংঘন করে, চুক্তি ভঙ্গ করে বা জিযিয়া (অমুসলিম কর) আদায় করতে প্রস্তুত না হয় তাদের সঙ্গে লড়াই কর, যতক্ষণ না তারা প্রকৃত মুসলমান হয় অথবা জিযিয়া আদায় করতে প্রস্তুত হয়।

আলোচ্য আয়াত জেহাদের আদেশ হওয়ার পূর্বে নাজিল হয়। কেননা এ আয়াতখানি মক্কায় নাজিল হয়। আর জেহাদের আদেশ হয়েছে মদীনা তাইয়্যেবায়। তাই জেহাদের আয়াতের মাধ্যমে এ আয়াতের হুকুম মনসুখ হয়েছে।

তফসীরকার কাতাদা এবং মোকাতেল (রঃ) এ আয়াতকে জেহাদের আয়াত দ্বারা মনসুখ বলেছেন।[১]

এবনে জরীর মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হলো, যদি আহলে কেতাবরা তোমাদের সঙ্গে মন্দ কথা বলে তবু তোমরা তাদের সাথে ভাল কথা বল। কিন্তু তারা যদি জুলুম করে তবে তাদের থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ)-এর আরেকটি

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮২-৮৩

কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এ আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত তাদের সঙ্গে বিতর্ক করোনা। কিন্তু তারা যদি জুলুম করে তবে ভিন্ন কথা অর্থাৎ তারা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শুধু তখনই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তার পূর্বে নয়। এমনিভাবে, তারা যদি জিযিয়া বা অমুসলিম কর আদায়ে রাজী না হয় তখন তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে যারা জিযিয়া আদায় করবে তাদের সাথে অবশ্য ভাল ব্যবহার করবে।[১]

وَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ

"আর তোমরা বল, "আমরা ঈমান এনেছি সে গ্রন্থের প্রতি যা আমাদের নিকট নাজিল হয়েছে এবং যা তোমাদের নিকটও নাজিল হয়েছে"।

এ আয়াতাংশে আহলে কেতাবদের সঙ্গে উত্তম পন্থায় কথা বলার একটি নির্দেশনা রয়েছে। এর অর্থ হলো, যদি আহলে কিতাবরা সে সব কথা বলে যা তাদের গ্রন্থে রয়েছে তবে তোমরা তাদের সাথে ঝগড়া করোনা এবং তাদেরকে মিথ্যা-জ্ঞানও করোনা। তবে তাদের মধ্যে যারা অন্যায় কথা বলে, যা নিশ্চয় তাদের গ্রন্থে নেই এবং যা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, তবে তাদের কথার প্রতিবাদ করা কর্তব্য যেমন তারা যদি বলে, 'মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত চিরদিন থাকবে'। অথবা যদি বলে, 'ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করা হয়েছে'। অথবা যদি তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করে তবে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা এবং তাদের কথার প্রতিবাদ করা মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। অতএব হে মোমেনগণ! তোমরা তাদেরকে বল, 'আমাদের নিকট যে কিতাব নাজিল হয়েছে তা আমরা মানি আর যে কিতাব তোমাদের নিকট নাজিল হয়েছে তা-ও মানি। কিন্তু তোমরা যে সব ভিত্তিহীন কথা-বার্তা বল তা আমরা মানি না'।

وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ۝

"আর তোমাদের ও আমাদের মা'বুদ একই, আর আমরা তাঁরই অনুগত"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আহলে কেতাবরা, অর্থাৎ ইহুদীরা তৌরাত পাঠ করতো হিব্রু ভাষায় আর আরবী ভাষায় মুসলমানদের নিকট তার ব্যাখ্যা করতো। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা আহলে কেতাবদেরকে সত্য জ্ঞানও করোনা, মিথ্যা জ্ঞানও করোনা। তোমরা শুধু বল, 'আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট নাজিল হয়েছে এবং যা তোমাদের নিকট নাজিল হয়েছে'। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবু নামলা আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় জনৈক ইহুদী আসে আর

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ১৬০

তখনই একটি জানাযা অতিক্রম করলো। ইহুদী বললো, 'হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ মৃত ব্যক্তিটি কি বলে'? তিনি এরশাদ করলেন, 'আমি তা জানিনা, শুধু আল্লাহ্ পাকই তা জানেন'। ইহুদী বললো, 'সে কথা বলে'। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'আহলে কেতাবরা যদি তোমাদের নিকট কোন কথা বর্ণনা করে (আর তা তোমাদের দ্বীনের খেলাফ না হয়) তবে তোমরা তাদের কথাকে সত্য জ্ঞান করোনা এবং মিথ্যা জ্ঞানও করোনা। তোমরা শুধু বলো, 'আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁর সকল গ্রন্থের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারা যা বলে তা যদি সত্য হয় তবে এভাবে তোমরা সেকথা মিথ্যা জ্ঞান করোনি। এজন্যে অপরাধী হওয়ার কোন প্রশ্নই উত্থিত হয় না। আর যদি তাদের কথা ভুল হয় তবে তোমরা তাকে সত্য জ্ঞান করোনি, তাই তোমরা এ অবস্থায়ও অপরাধী হবে না'।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) লিখেছেন, আহলে কেতাবদের সাথে প্রথমে বিনম্র ভাবে সংযত ভাষায় কথা বলা উচিত। কিন্তু যখন তাদের শত্রুতা প্রকাশ পায় তখন কঠোর ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।[২]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আহলে কেতাবদের সঙ্গে আচরণ-বিধি ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের ধর্মকে আক্রমণ না করে তাদেরকে কথা বুঝিয়ে বল যে তোমাদের সাথে আমাদের কোন মৌলিক বিরোধ নেই। আমাদের নিকট যে কিতাব নাজিল হয়েছে তা যেমন আমরা সত্য বলে জানি, তেমনি তোমাদের নিকট যে আসমানী গ্রন্থ নাজিল হয়েছে তাকেও আমরা সত্য জানি। এতদ্ব্যতীত, আমাদের মা'বুদও একই। আমরা যেমন কোন দেব-দেবীকে মানি না, তোমরাও তা কর না। তবে পার্থক্য শুধু এখানে, তোমরা ধর্মের মূল ভিত্তি তওহীদকে বর্জন করেছ, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ওজায়ের (রাঃ)-কে খোদায়ী মর্যাদায় আসীন করেছ, তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করেছ (নাউজুবিল্লাহে মিন জালেক), এসবই হলো নিতান্ত ভিত্তিহীন অমূলক কথা। যেভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি তৌরাত এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে, ঠিক তেমনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে। আমরা পবিত্র কোরআনের প্রতি যেমন বিশ্বাস করি তেমনি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ সমূহেও বিশ্বাস করি। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুসারী হওয়া।

তাই আহলে কেতাবদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী-গুণী ছিলেন যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮৩
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা -৭৮৭

সালাম (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যদিও কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত জেহাদের আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ তফসীরকারগণের মতে, এ আয়াত মনসূখ হয়নি, এটি 'মুহ্‌কাম' আয়াত; এর আদেশ এখনও বিদ্যমান। যদি কোন ইহুদী নাসারা দ্বীন ইসলামকে বুঝতে চায় তবে তাকে ভদ্র এবং নম্র ভাবে পরিমার্জিত ভাষায় দ্বীন ইসলামকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত, হয়তো সে দ্বীন ইসলাম কবুল করবে, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ادْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (সূরা নহল)

"আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে হেকমত এবং উত্তম উপদেশ দ্বারা আহবান করুন"।

এমনিভাবে যখন হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-কে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করা হয় তখন আল্লাহ্ পাক এ ফরমান জারি করেছিলেনঃ

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى (সূরা তোয়াহা)

"তোমরা উভয়ে তার সঙ্গে বিনম্রভাবে কথা বল; হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে"।

ইমাম এবনে জরীর (রঃ) এ মতই পছন্দ করেন। হযরত এবনে যায়েদ (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন।[২]

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কেতাবদের সঙ্গে বিতর্ক করোনা। এ উত্তম পন্থা হলো কোরআন। অর্থাৎ এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত পন্থায় তাদের সঙ্গে আচরণ কর। তবে তাদের মধ্যে যারা জালেম তাদের সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার কর। যেমন নাজরানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোবাহেলার আহবান করেছিলেন। আর আমাদের এবং তোমাদের মা'বুদ একই, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং তাঁর কোন সন্তান-সন্ততিও নেই।

وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

"আর আমরা সকলে তাঁরই অনুগত"।

এবং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই আমরা তাঁর বন্দেগী করি এবং তাঁর তওহীদ বা একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি, শুধু তাঁরই নিকট মাথা নত করি এবং শুধু তাঁরই

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৬-৭৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৩

নিকট আশা করি।[১]

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ

আর এভাবেই আমি (হে রসূল!) আপনার নিকট কিতাব নাজিল করেছি, অর্থাৎ যেভাবে ইতিপূর্বে আমি অন্যান্য রসূলগণের নিকট আসমানী গ্রন্থ নাজিল করেছি ঠিক তেমনি (হে রসূল!) আপনার নিকটও আমি পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি। রসূল প্রেরণ, আসমানী গ্রন্থের অবতরণ নতুন কিছু নয়। এতদ্ব্যতীত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন অতীতে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়ন করে।

فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ

তবে যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম পূর্বে আহলে কেতাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সুসংবাদ পেয়ে তাঁর দরবারে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। বস্তুত আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ, যারা বিচার-বুদ্ধির অধিকারী তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে, পবিত্র কোরআনকে মানে। অথবা এ আয়াতাংশের অর্থ হলো, যাদেরকে আমি ইতিপূর্বে কিতাব দান করেছি, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আনতো।[২]

وَمِنْ هٰۤؤُلَاۤءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ

আর এদের মধ্যে অর্থাৎ মক্কাবাসীর মধ্যে, অথবা আরবদের মধ্যে, অথবা আহলে কিতাবের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগেও এমন লোক ছিল যারা তাঁর প্রতি এবং পবিত্র কোরআনের পতি ঈমান আনে।

ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ

فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

(অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা তার প্রতি ঈমান আনে।)

এর অর্থ হলো নবী রসূলগণ, কেননা কিতাব নবী রসূলগণকে দেয়া হয়েছে। যেমন কোরআনে করীমে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

(সূরা নেছা)

“আর আমি দাউদকে যবুর দান করেছি”।

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস (রাঃ)
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮৪

وَمِنْ هٰؤُلَاءِ শব্দ দ্বারা আহলে কিতাবকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ হবে যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তথা নবী রসূলগণ তাঁরা ঐ কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনে, আর এ আহলে কেতাবের মধ্যেও যারা ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান তারা এ গ্রন্থের উপর ঈমান আনে।[১]

পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শুধু কাফেররাই হিংসা-বিদ্বেষের কারণে তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ○

আর একমাত্র কাফেররাই আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে। তারা অস্বীকার করে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদকে এবং অস্বীকার করে তাঁর প্রেরিত আসমানী গ্রন্থ সমূহকে, কেননা যারা পবিত্র কোরআনকে মিথ্যা-জ্ঞান করে, তারা মূলত তওরাত-ইঞ্জিলকেও অস্বীকার করে। এজন্যে যে তওরাত-ইঞ্জিল পবিত্র কোরআনের সত্যায়ন করে, তওরাত, ইঞ্জিলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সুসংবাদ রয়েছে, তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করে অথচ তওরাতের প্রতি ঈমানের দাবীদার হয়, তার দাবি অমূলক, ভিত্তিহীন, অসত্য।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের يجحد শব্দটি جحود থেকে নিস্পন্ন। এর অর্থ হলো কোন কিছুর পরিচয় পাওয়ার পর তাকে অস্বীকার করা। এতে একথা প্রমাণিত হয়, যে সব আহলে কেতাব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানত না, তারা একথা জানত যে তিনি সত্য নবী। যে নবীর সুসংবাদ তওরাত-ইঞ্জিলে রয়েছে ইনি তিনিই, কিন্তু এতদসত্ত্বেও হিংসা-বিদ্বেষ এবং জেদের বশীভূত হয়ে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনত না। তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে শুধু কাফেররাই তাঁকে অস্বীকার করে।[২]

ইমাম এবনে জরীর (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো যারা তাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে অস্বীকার করে, যারা আমার দলিল-প্রমাণকে অমান্য করে, তারাই আমার তওহীদে বিশ্বাস করেনা, তারা সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই সত্যকে অস্বীকার করে। এবনে জরীর (রঃ) ইমাম কাতাদার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৭৬
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮৪
৩। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৪

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ
بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ
صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾
وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ
وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾
قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৪৮) আর (হে রসূল!) আপনি তো এই কিতাবের পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না; এমন হলে এই বাতিল-পন্থীরা কিঞ্চিত সন্দেহ পোষণ করতে পারতো।

(৪৯) বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এই কোরআন সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর শুধু সীমা লংঘনকারীরাই আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে।

(৫০) আর কাফেররা বলে, 'তার প্রতিপালকের তরফ থেকে তার নিকট কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি'? (হে রসূল! আপনি) বলুন, 'নিদর্শন সমূহ তো আল্লাহ পাকেরই হাতে, আর আমি শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র'।

(৫১) তাদের নিকট এটি কি যথেষ্ট নয় যে, (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়, নিশ্চয় এ কিতাবে রয়েছে অবশ্যই রহমত এবং উপদেশ মোমেন সম্প্রদায়ের জন্যে।

(৫২) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, 'আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর জানা। আর যারা অসত্যে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ পাককে অমান্য করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত'।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে

এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) নবুওয়্যত লাভের পূর্বে আপনি এ সমাজে সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেছেন। এর মধ্যে কখনও আপনি লেখাপড়া শেখেননি, কারো নিকট কোন কিতাব পড়েননি এবং স্বহস্তে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করেননি, আপনি যে উম্মী একথা সর্বজন-বিদিত ও স্বীকৃত। যদি আপনি ইতিপূর্বে লেখাপড়া করতেন, আর এ উদ্দেশে কারো নিকট হাযির হতেন তবে এ কাফেরদের পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কিঞ্চিৎ সুযোগ হতো যে হয়তো আপনি কারো নিকট পবিত্র কোরআনের বাণী শিখে এসে তাদের নিকট বলছেন। কিন্তু একথা সকলেরই জানা যে বিগত চল্লিশ বছরের মধ্যে আপনি কোন মানুষের নিকট কোন কিছু শেখেননি। অথচ আজ আপনার রসনা থেকে তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ কথা নিঃসৃত হচ্ছে। এতে একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে আপনার নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী নাজিল হচ্ছে। আর এটি আল্লাহ পাকের কালাম ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী-মনীষীরা একত্রিত হয়েও পবিত্র কোরআনের একটি ক্ষুদ্র সূরার ন্যায় সূরাও রচনা করতে সক্ষম হয় না, আর কখনো সক্ষম হবেও না। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে আপনি আল্লাহ পাকের সত্য রসূল এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আপনার নিকট পবিত্র কোরআন তথা আল্লাহর মহান বাণী নাজিল হয়।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে المبطلون শব্দটি দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর তফসীরকার মুকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটি দ্বারা আহলে কিতাবকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তাদের কিতাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি হবেন উম্মী। অথচ তাঁর মাধ্যমেই এমন সব জ্ঞানের কথা প্রকাশিত হবে যা দুনিয়ার কোন জ্ঞানী-গুণী বলতে পারবে না।[১]

এবনে আবি শায়বা, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আহলে কিতাবরা তাদের গ্রন্থে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ বৈশিষ্ট্য পাঠ করতো যে সর্বশেষ নবী কোন কিতাব পাঠ করতে পারবেন না এবং লিখতেও পারবেন না। তাই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।[২]

এ মর্মে যে (হে রসূল!) একথা সর্বজন-বিদিত যে আপনি উম্মী, আপনি কারো নিকট লেখা-পড়া শেখেননি। অতএব, আপনার নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী নাজিল হচ্ছে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রসূল। এজন্যে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ○ (সূরা নজম)

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮৪-৮৫
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠাঃ৪-৫
২। তফসীরে দ্দাদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৬০

"আর তিনি নিজের তরফ থেকে কোন কথা বলেন না; তাঁর কথা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

পবিত্র কোরআন সংরক্ষিত

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

"বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এই কোরআন সুস্পষ্ট নিদর্শন"।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে এমন সন্দেহ করার কোন সুযোগ নেই যে এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রচিত গ্রন্থ (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক)। বরং এটি আল্লাহ পাকের কালাম, যা তাঁর প্রিয় রসূলের নিকট অবতীর্ণ হয়। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সুস্পষ্ট নিদর্শন। যারা জ্ঞানী তাদের অন্তরে তা সংরক্ষিত থাকে। কেননা আল্লাহ পাক অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন এভাবেঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○ (সূরা হিজর)

"নিশ্চয় আমিই কোরআন নাজিল করেছি আর আমি অবশ্যই তার হেফাজতকারী"।

দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থ এভাবে কণ্ঠস্থ করে রাখা হয় না, এমনকি তৌরাত-ইঞ্জিলেরও কোন অংশের হাফেজ পাওয়া যায় না। এটি শুধু পবিত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে তাকে হেফজ করে রাখা হয়। এজন্যে এ উম্মতের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছেঃ

صُدُوْرُهُمْ اَنَاجِيْلُهُمْ

"তাদের বক্ষই হবে তাদের ইঞ্জিল"।

অর্থাৎ সর্বশেষ নবীর প্রতি যে আসমানী গ্রন্থ নাজিল হবে তা তাঁর উম্মতের অন্তরে সংরক্ষিত থাকবে। পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার চৌদ্দশ' বছর পরও পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআন রয়েছেন। পৃথিবীতে এমন কোন শহর বা এলাকা নেই যেখানে কোন হাফেজ নেই, যদি কোন কারণে পবিত্র কোরআনের কপি দুর্লভ হয়ে যায় তবে হাফেজে কোরআনের মাধ্যমে পুনরায় তা লিপিবদ্ধ করা যাবে। শুধু যে পবিত্র কোরআনের শব্দ সংরক্ষিত হচ্ছে তাই নয়; বরং এর অর্থও সংরক্ষিত রয়েছে। যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং আজও তা অব্যাহত রেখেছেন। যা কাগজে লিপিবদ্ধ আছে তাতে এ আশংকা থাকে যে এটি কোন কারণে বিনষ্টও হতে পারে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআনের বক্ষে যা সংরক্ষিত রয়েছে তা বিনষ্ট হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। আরও বিস্ময়কর বিষয় এই, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে এক্স-রে মেশিনের সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরীণ সবকিছু দেখা যায় কিন্তু হাফেজে কোরআনের বক্ষে পবিত্র কোরআন কিভাবে সংরক্ষিত রয়েছে- এক্স-রে মেশিন দ্বারা তার রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। যে ইহুদী-নাসারারা পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করে এবং এখনও তৌরাত ও ইঞ্জিল নিয়ে বসে আছে তারা চেষ্টা

করে দেখতে পারে তৌরাত ও ইঞ্জিলকে পবিত্র কোরআনের মত হেফজ করে রাখতে পারে কি-না। বাস্তব সত্য হলো এই, তাদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হবে না। কেননা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের হেফাজতের কথা ঘোষণা করেছেন, তৌরাত ও ইঞ্জিলের হেফাজতের কোন কথা বলেননি। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝

"আর শুধু জালেম বা সীমা লংঘনকারীরাই আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে"।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যারা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করে তারা নিঃসন্দেহে জালেম, তারা সীমা লংঘনকারী, তারা সত্য-বিমুখ, তাদের হিংসা-বিদ্বেষ এবং জেদ ও হঠকারিতার কারণেই তারা পবিত্র কোরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করে।

ইমাম তাবারী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের অন্য রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোন কোন ব্যাখ্যাকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় এ মত পোষণ করেছেনঃ هو সর্বনামটি দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আহলে কেতাবরা তৌরাত-ইঞ্জিলের মাধ্যমে অবগত হয়েছে। তিনি যে উম্মী হবেন সে কথা তারা জানতে পেরেছে। তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। আর তাঁর নিকট যে পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাজিল হয়েছে এ সম্পর্কেও তারা সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। এতদসত্ত্বেও তারা যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে তা শুধু তাদের হিংসা-বিদ্বেষ এবং জেদের বশীভূত হয়েই করে।

ইমাম তাবারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক তৌরাত ও ইঞ্জিলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। আহলে কেতাবের মধ্যে যারা আলেম তারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তারা একথাও জানে যে সর্বশেষ নবী পড়তেও পারবেন না লিখতেও পারবেন না। এতদসত্ত্বেও তারা জেদের বশীভূত হয়েই তাঁর বিরোধিতা করে।[১]

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝

অর্থাৎ শুধু জালেমরাই আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে।

জুলুমের তাৎপর্য হলো কোন জিনিসকে সঠিক স্থানের বদলে অন্যত্র রাখা। আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ এত সুস্পষ্ট মোজেযা যা দেখা মাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠাঃ-৫
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮৫

ওয়াসাল্লামের সত্যতায় বিশ্বাস করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু তারা জালেম তাই সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেনা। তারা কলহ-প্রিয়, বাতিল-পন্থী তাই তাদের অন্তরের বিদ্বেষ এবং জেদের বশীভূত হয়ে তারা সত্যকে অস্বীকার করে।

وَقَالُوا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

"আর কাফেররা বলে, "তাঁর প্রতিপালকের তরফ থেকে তাঁর নিকট কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি"?

কাফেররা নিজেদের মর্জি মোতাবেক নানা প্রকার নিদর্শনের ফরমায়েশ করতো, এ আয়াতে এমনি ফরমায়েশের কথা বলা হয়েছে। যেমন পূর্বকালে হযরত সালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী, হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট অবর্তীণ আসমানী খাবার প্রভৃতি।

কাফেররা তাদের বিদ্বেষ এবং জেদ প্রকাশ করেই এমনি মোজেযা প্রদর্শনের দাবী করেছে। আল্লাহ্ পাক তাদের এ অন্যায় আস্ফালনের জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, কোন প্রকার মোজেযা বা নিদর্শন পেশ করা আমার ইচ্ছাধীন নয়, এটি একমাত্র আল্লাহ্ পাকের হাতেই রয়েছে। এর সম্পর্ক আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের সঙ্গে, তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি প্রকাশ করেন, এ সম্পর্কে আমার কিছুই করণীয় নেই।

وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

"আর আমি তো শুধু সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী"।

অর্থাৎ আমার কাজ হলো আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ শুনিয়ে দেয়া এবং তাঁর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা, আর সে-সব মোজেযা প্রকাশ করা যা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আমাকে দান করা হয়েছে। আর আমি তো শুধু আল্লাহ্ পাকের আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী।

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ

"তাদের নিকট এটি কি যথেষ্ট নয়? (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট কিতাব নাজিল করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়"।

বস্তুতঃ নিদর্শন বা মোজেযা হিসেবে পবিত্র কোরআনের ন্যায় অলৌকিক গ্রন্থ কি যথেষ্ট নয়? যেখানে পবিত্র কোরআন রয়েছে সেখানে অন্য কোন নিদর্শনের প্রয়োজন আছে কি? কেননা এ মহান গ্রন্থে অতীতের বহু ঘটনার সত্য বিবরণ স্থান পেয়েছে, বর্তমানের অনেক সমস্যার সমাধান রয়েছে এবং ভবিষ্যতের অনেক কথা রয়েছে, মানব-জীবনের

সকল জিজ্ঞাসার জবাব এতে রয়েছে।

আল্লাহ পাক প্রত্যেক নবীকেই কিছু নিদর্শন দান করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অন্যান্য মোজেযার পাশাপাশি পবিত্র কোরআন দান করেছেন। এটি একটি স্থায়ী মোজেযা, কেয়ামত পর্যন্ত এটি স্থায়ী থাকবে, অন্যান্য নবীগণের এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মোজেযাও শেষ হয়েছে। এখন হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি বা হযরত সালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী দেখা যাবেনা কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পরও পবিত্র কোরআন তাঁর মোজেযা হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে, কেননা সমগ্র বিশ্ববাসী পবিত্র কোরআনের একটি ক্ষুদ্র সূরার ন্যায় সূরা রচনায় ব্যর্থ হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত ব্যর্থই থাকবে। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে, বিগত চৌদ্দশ' বছরে এর একটি যের যবরেও কোন পার্থক্য হয়নি, অথচ অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের এ বৈশিষ্ট্য নেই। তৃতীয়তঃ পবিত্র কোরআন যতই পাঠ করা হোক কখনো তা পুরাতন মনে হয় না, বরং সর্বদা চির নতুন থাকে।

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনের বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্য কখনো শেষ হয়না, সর্বদা নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান মেলে এবং যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যায়। অতএব, নিদর্শন হিসেবে পবিত্র কোরআনই যথেষ্ট।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

"নিশ্চয় এই কিতাবে রয়েছে রহমত এবং উপদেশ, সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা ঈমান রাখে"।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্যে এ মহান গ্রন্থে রয়েছে অশেষ রহমত ও অতি মূল্যবান উপদেশ। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্য হলো বিরোধিতা এবং হঠকারিতা তারা এ মহান গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয়না এবং তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়না।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, "আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর জানা"।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি কাফের-মুশরেকদেরকে জানিয়ে দিন, তোমরা আমাকে স্বীকার কর বা না-ই কর তাতে কিছুই যায় আসে না। আমার সত্যতার সাক্ষী হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, তিনিই আমাকে নবী ও রসূল মনোনীত করেছেন, তিনিই আমাকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তিনিই আমাকে নবী রসূলগণের দলপতি নির্বাচন করেছেন, তিনিই আমাকে পবিত্র কোরআনের ন্যায় মোজেযা

দান করেছেন, আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর নখদর্পণে, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। আল্লাহ পাকের ন্যায় প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী থাকতে তোমাদের স্বীকার করা বা অস্বীকার করায় কিছুই যায় আসে না। যেহেতু তিনি আসমান জমিনের সব কিছু জানেন তাই তোমাদের অন্যায়-অনাচার এবং নাফরমানী সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। আর এর জন্যে তোমাদের শাস্তিও অবধারিত। তিনি আমার সত্য-সংগ্রাম সম্পর্কে অবগত। তাই তিনি প্রতি পদক্ষেপে আমাকে সাহায্য করছেন এবং আমার দ্বারা অনেক মোজেযা প্রকাশ করছেন।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

"যারা বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ পাককে অস্বীকার করে তারাই হয় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত"।

যা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান, তাকে অস্বীকার করার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই। কিন্তু তবু মানুষের প্রকৃতি হলো এই যে সে মিথ্যাকে গ্রহণ করার জন্যে কোন দলিল-প্রমাণের অনুসন্ধান করেনা; বরং সহজেই তা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে দলিল-প্রমাণ এমনকি মোজেযার অনুসন্ধান করে। মানুষের এ সর্বনাশা নীতির কারণেই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা বাতিল বা মিথ্যায় বিশ্বাস করে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের একত্ববাদকে অস্বীকার করে তারাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা তারা হক্ব বা সত্যকে বর্জন করেছে এবং বাতিল বা মিথ্যাকে গ্রহণ করেছে। তারা জান্নাতের বদলে দোযখকে পছন্দ করেছে। আলোচ্য আয়াতের "বাতিল" শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এখানে "বাতিল" অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু। আর তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের "বাতিল" শব্দটির ব্যাখ্যা হলো শেরক অর্থাৎ যারা ঈমানের বদলে শেরক করেছে।

আর তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের "বাতিল" শব্দটি দ্বারা ইবলিস শয়তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা শয়তানের তাবেদারী করেছে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছে তারাই হবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যে ব্যবসায়ী তার সমুদয় পুঁজি বিনষ্ট করে সে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিক তেমনি যারা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি বিশ্বাস করে তারাও ঐ সর্বহারা ব্যবসায়ীর ন্যায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা তাদের জীবনের পুঁজি বাতিলের প্রতি বিশ্বাস করে বিনষ্ট করেছে, অতএব তাদের সমূহ ধ্বংস অনিবার্য।[২]

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠাঃ-৬
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠাঃ ৮
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠাঃ ৮১

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ
وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ
صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

তরজমা

(৫৩) আর (হে রসূল!) আপনার কাছে তারা আযাবের জন্যে তাড়াহুড়া করে, যদি একটি স্থির সিদ্ধান্ত না থাকত তবে তাদের উপর আযাব এসে পড়ত, নিশ্চয় তাদের উপর আযাব আসবে অতর্কিতভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে।

(৫৪) (হে রসূল!) তারা আপনাকে আযাব তরান্বিত করার কথা বলে, আর নিশ্চয় দোযখ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।

(৫৫) সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন আযাব তাদেরকে তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের তলা থেকে ঘিরে ফেলবে এবং আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে কোন ফেরেশতা বলবে, 'তোমরা যা কিছু করেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর'।

(৫৬) হে আমার মোমেন বন্দাগণ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত, অতএব তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর।

(৫৭) প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে, এরপর তোমরা আমারই নিকট ফিরে আসবে।

(৫৮) আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আমি তাদেরকে বেহেশতের মধ্যে বসবাসের জন্যে এমন সুউচ্চ প্রাসাদ দান করবো, যার পাদদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত

রয়েছে, তারা তাতে চিরদিন থাকবে। কত উত্তম প্রতিদান সেই নেককার লোকদের জন্যে!

(৫৯) যারা (দুনিয়ার জীবনে) সবর অবলম্বন করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করেছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে আখেরাতের জীবনে তারা হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, তারা হবে সর্বহারা। আর এ আয়াতে কাফেরদের একটি ধৃষ্টতার বর্ণনা রয়েছে। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফের-মুশরেকদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাবের কথা বলতেন তখন তারা আযাব তরান্বিত করার কথা বলে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতো, তারা বলতো আপনি যে আযাবের কথা বলছেন, যদি আপনি তাতে সত্যবাদী হন তবে সে আযাব এখনই নিয়ে আসুন, তাদের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ط

আর কাফেররা (হে রসূল!) আপনার নিকট আযাবের জন্যে তাড়াহুড়া করে, যদি আমরা অন্যায় পথে চলি তবে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসেনা কেন? তাদের একথার জবাবেই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْلَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ط

মূলতঃ সব কিছুর জন্যেই পূর্ব থেকে একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, সে সময় না আসা পর্যন্ত আযাব বিলম্বিত হয়, যদি এ সময় নির্ধারিত না থাকত তবে অবশ্যই তাদের উপর আযাব আপতিত হতো এবং তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

তাদের উপর যথা সময়ে অবশ্যই আযাব আসবে তবে তা আসবে অতর্কিতভাবে, পূর্বে তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।

শানে নজুল

মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নজর এবনে হারেস নামক এক কাফের বলেছিলো,

اللهم ان كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء

(হে আল্লাহ! যদি এই দ্বীন এবং এই কোরআন তোমার তরফ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর।) তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

أَجَلٌ مُسَمًّى

আলোচ্য আয়াতের এ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! যদি আমি আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি না দিতাম যে আপনার সম্প্রদায়কে আযাব দিয়ে নিশ্চিহ্ন করবো না এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি আযাবকে মূলতবী করবো, তবে এতদিনে তাদের প্রতি আযাব আপতিত হতো। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ (সূরা ক্বমর)

(বরং কেয়ামতের সময়ই তাদের আযাবের জন্যে নিদৃষ্ট হলো।)

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, اجل مسمى। শব্দটির অর্থ হলো তাদের দুনিয়ার জীবন। যখন তাদের মৃত্যু হবে তখন তাদের প্রতি আযাব হবে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, اجل مسمى। শব্দটির তাৎপর্য হলো বদরের যুদ্ধের দিন, অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের দিনই তাদের প্রতি আযাব হবে। এটি স্থির সিদ্ধান্ত হওয়ার কারণে তার পূর্বে তাদের প্রতি আযাব হয়নি।

بَغْتَةً

দুনিয়াতে হঠাৎ তাদের প্রতি আযাব আসবে যেমন বদরের যুদ্ধের দিন এসেছিল। অথবা আখেরাতে আযাব আসবে। অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্তে আর তা এত অতর্কিতে আসবে যে তারা পূর্বে এ সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারবে না।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে জরীর তফসীরকার কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কিছু লোক একথা বলেছিলোঃ যদি এ ধর্ম সত্য হয় তবে আমাদের প্রতি আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষিত হোক অথবা আমাদের প্রতি কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসুক।

এবনুল মুনজের এবনে জোরায়েযের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً এর দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ যখন কাফেররা আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলো তখন এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেন,

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮৭-৮৮
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৯
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ১৬১-৬২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠাঃ ৯
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠাঃ ৬

আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলেও তোমাদের প্রতি আযাব যথা সময়েই আসবে। তোমাদের তাড়াহুড়া করায় আযাবের সময়ের ব্যাপারে কোন পরিবর্তন হবেনা। কেননা আল্লাহ পাকের প্রতিটি সিদ্ধান্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। তাই তোমাদের আস্ফালনের কারণে যেমন আযাব আসবেনা, ঠিক তেমনি যখন তোমরা আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পানাহ চাইবে তখনও তোমাদেরকে পানাহ দেয়া হবেনা।[১]

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ط

(হে রসূল!) কাফেররা আপনাকে তাদের প্রতি আযাব আনয়নে তাড়াহুড়া করতে বলে, অথচ দুনিয়ার আযাব হলেই তারা রেহাই পাবেনা, দুনিয়াতে মক্কার কাফেররা বদরের যুদ্ধের দিন কঠিন আযাব ভোগ করেছে, তাদের অনেক লোক মুসলমানদের হাতে নিহত এবং বন্দী হয়েছে। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের শাস্তি হয়েছে কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়; বরং আখেরাতের কঠিন আযাব তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

আর নিশ্চয় দোযখ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, দোযখ তাদের অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। যেভাবে দুনিয়াতে কুফরী ও নাফরমানীর কাজ তাদেরকে ঘিরে রেখেছে, ঠিক তেমনি আখেরাতে দোযখের কঠিন আযাব তাদেরকে ঘিরে রাখবে। দোযখের আগুন তাদেরকে জড়িয়ে ধরে রাখবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। তাদের বর্তমান জীবনের কার্যকলাপই দোযখে বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুতে রূপান্তরিত হয়ে তাদেরকে দংশন করবে যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছেঃ যারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদের যাকাত দেয়নি; আখেরাতে তাদের এ ধন-সম্পদ বিষধর সর্পের আকার ধারণ করে তাদের গলায় জড়িয়ে ধরবে এবং বলবে, আমিই তোমার সেই প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আল্লাহ পাকের হুকুম থাকা সত্ত্বেও যা তুমি আল্লাহর রাহে দান করোনি। এরপর ঐ ব্যক্তিকে বিষধর সর্প দংশন করতে থাকবে।[২]

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ

"সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন আযাব তাদেরকে তাদের উপর থেকে এবং তাদের পদতল থেকে ঘিরে ফেলবে এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন ফেরেশতা বলবে, তোমরা যা কিছু করছিলে, তার স্বাদ ভোগ কর"।

একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে যে, দুনিয়াতে যেভাবে কুফরী ও নাফরমানীর উপকরণ সমূহ কাফের-মুশরেকদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে, ঠিক তেমনি আখেরাতে

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠাঃ ৮১
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৫২২

দোযখের আযাব উপর থেকে নীচ পর্যন্ত তথা মাথার উপর থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখবে। যারা ফেরেশতা ও নক্ষত্রপুঞ্জের পূজা করে থাকে, তাদেরকে উপর থেকে আযাব দেয়া হবে। আর যারা বৃক্ষ, পাথর বা নিজেদের হাতে বানানো কিছুর পূজা করতো, তাদের আযাব নীচ থেকে শুরু হবে। স্বয়ং আল্লাহ পাক অথবা তার পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কীর্তিকলাপের স্বাদ এখন ভোগ কর। দুনিয়াতে তোমরা আল্লাহর নাফরমানী করেছিলে কিন্তু তার স্বাদ ভোগ করোনি- এখন তা ভোগ কর এবং উপলব্ধি কর কুফর ও নাফরমানীর শাস্তি কত ভয়াবহ হয়! আর এটি সে আযাবই যার জন্যে তোমরা দুনিয়াতে তাড়াহুড়া করছিলে এবং যে আযাবের প্রতি তোমরা বিদ্রুপ করেছিলে- এখন সে আযাব ভোগ কর।[১]

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক من فوقهم বা তাদের উপর আযাব আসবে বলেছেন, من فوق رؤسهم অর্থাৎ তাদের মাথার উপর আযাব আসবে বলেননি। কেননা দোযখের আযাব হয়তোবা মাথার উপর দিয়ে আসবে অথবা মাথার অন্য কোন পার্শ্ব দিয়ে আসবে বা অন্য কোন স্থান দিয়ে আসবে। এজন্যে মাথার উপর কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। এমনিভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

"তোমরা তোমাদের কার্যকলাপের শাস্তি ভোগ কর"।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী বাক্যে দৈহিক আযাবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে কাফেরদের রুহের আযাবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কেননা কাফেরদের আমলই তাদের শাস্তির কারণ হবে। আর এ সত্য তারা দোযখে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করবে।[২]

يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ○

"হে আমার মোমেন বন্দাগণ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত অতএব, তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর"।

শানে নজুল

তফসীরকার মোকাতেল এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার দুর্বল মুসলমানদের ব্যাপারে যাঁরা হিজরত করতে পারেননি।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে সেই মুসলমানদের ব্যাপারে যাঁরা মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করেননি। তারা বলেছিলেন, 'যদি আমরা হিজরত করি তবে অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যুর ভয় রয়েছে। কারণ বিদেশে আমরা পানাহারের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৯
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠাঃ ৮২

কি ব্যবস্থা করবো'? তাদের একথার জবাবেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

অর্থাৎ হে আমার ঈমানদার বন্দাগণ! আমার পৃথিবী অতি প্রশস্ত। মক্কায় অবস্থান করে যদি তোমরা মোমেন হিসেবে জীবন যাপন করতে না পার, ঈমানের কথা প্রকাশ করতে না পার তবে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও যেখানে স্বাধীনতার সঙ্গে ঈমানের কথা প্রকাশ করতে পার। যেমন মদীনা মুনাওয়্যারা বা অন্য কোথাও। কারণ আমার পৃথিবী ক্ষুদ্র নয়, বরং অনেক বড়।

অতএব যেখানে আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করা সম্ভব, সেখানে চলে যাও। জিন্দেগীর উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ। মক্কায় যদি এ উদ্দেশ্য সফল না হয় তবে যেখানে সম্ভব সেখানে চলে যাও।

হিজরতের আদেশ

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো আমার পৃথিবী অতি প্রশস্ত। অতএব, তোমরা দেশ ত্যাগ করে যেখানে সম্ভব সেখানে চলে যাও এবং সেখানে পৌঁছে জালেম কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর।

তফসীরকার সাঈদ এবনে জোবায়ের (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন কোন এলাকায় সচরাচর গুনাহ হতে থাকে তখন সেখান থেকে বের হয়ে পড়, কেননা আমার পৃথিবী ক্ষুদ্র নয়, বিরাট এবং অনেক প্রশস্ত।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, যখন তোমার দেশে তোমাকে পাপাচারের হুকুম দেয়া হয় তখন তুমি সেখান থেকে পলায়ন কর। যদি কোন এলাকায় পাপাচার হতে থাকে আর তা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয় তবে সে স্থান ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে, যেখানে আল্লাহ্ পাকের এবাদত করা সম্ভব হয়। আর যারা বলেছেন, বিদেশে গমন করলে আমাদের পানাহারের কী ব্যবস্থা হবে তাদের কথার জবাব রয়েছে এ আয়াতে।

মাতরাফ এবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, জমিন প্রশস্ত হওয়ার তাৎপর্য হলো আমার রিয্ক অনন্ত অসীম। অতএব তোমরা দেশ ত্যাগ কর, আমি তোমাদেরকে রিয্ক দান করবো।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন নিয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্য দেশে পলায়ন করে, যদি সে অর্ধ হাত জায়গাও অতিক্রম করে থাকে তবু সে জান্নাতের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথী হবে (ছা'লাবী)।[১]

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও বলেছেন, হে আমার মোমেন

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮৮-৮৯
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠাঃ ৬

বন্দাগণ! কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়োনা। আমার পৃথিবী বিরাট এবং প্রশস্ত। এখানে যদি আল্লাহ্ পাকের এবাদত-বন্দেগী সম্ভব না হয় তবে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমরা শুধু এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে সুদৃঢ় ও অবিচল থাক।

তফসীরকারগণ বলেছেন, মক্কার কাফেররা যখন মুসলমানদের প্রতি উৎপীড়ন-নির্যাতন বৃদ্ধি করলো এবং মুসলমানদের পক্ষে ইসলামী বিধি-নিষেধ পালন করা অসম্ভব হয়ে উঠলো, তখন এ আদেশ জারি হয় যেন মুসলমানগণ মক্কা থেকে হিজরত করে এবং যেখানে ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করা সম্ভব সেখানে চলে যায়। কাফেরদের দেশে কাফেরদের সঙ্গে থাকা বৈধ নয়। তাই সাহাবায়ে কেরাম প্রথমে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেন, এরপর মদীনা মুনাওয়্যারায়।

যুজাজ (রঃ) বলেন, যে স্থানে আল্লাহ্ পাকের এবাদত তথা নামাজ রোজা সম্ভব নয়, যে স্থানে প্রকাশ্যে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী হতে থাকে আর ঐ অবস্থার পরিবর্তন করাও সম্ভব না হয় তবে সেখান থেকে হিজরত করা অবশ্য কর্তব্য। যদি এমন অবস্থা না হয় তবে মোস্তাহাব। আর যেহেতু দেশ ত্যাগ করা বা হিজরত করা আপনজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা, তাই আল্লাহ্ পাক মোহাজেরদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়োনা, এ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

"প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে"।

যদি আজকে হিজরত না কর তবে একদিন তো পৃথিবী থেকে অবশ্যই বিদায় গ্রহণ করতে হবে। যদি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তোমরা দেশ ত্যাগ কর এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হও তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। আর মনে রেখো, রিয্ক আল্লাহ্ পাকের দান, আর তা কোন বিশেষ স্থানের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তোমরা যেখানে যাও সেখানেই তোমাদের রিয্কের ব্যবস্থা থাকবে। পশু-পক্ষী থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর, তারা তাদের রিয্ক নিয়ে ঘোরে না; বরং তারা যেখানে যায় আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সেখানেই রিয্ক প্রদান করেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মক্কা শরীফ থেকে যখন সর্ব প্রথম সাহাবায়ে কেরামের একটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তখন বর্তমান আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সান্ত্বনা দেন এই বলে যে দুনিয়ার এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। যাদের জুলুম-অত্যাচারের কারণে তোমরা আজ জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছ, এমন একদিন আসবে যখন তোমাদেরকে এবং তাদেরকেও এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষের উপরই মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধান কার্যকর হবে, তখন তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে আখেরাতে যেতে হবে। ইহকাল থেকে পরকালে অবশ্যই যেতে হবে। আর সেই বিরাট হিজরতের তুলনায় মক্কা থেকে আবিসিনিয়ার হিজরত তো

কিছুই নয়। অতএব, এ হিজরতের জন্যে দুঃখিত হওয়ার কোন ন্যায্য কারণ নেই। হে মুসলমানগণ! দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্যে আখেরাতকে ভুলে যেয়ো না, বরং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যের জন্যে সাধনা কর।

ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"অতঃপর তোমাদের সকলকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে"।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) ان ارضى এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, اى ارض المدينة অর্থাৎ হে আমার বন্দাগণ! মদীনার জমিন প্রশস্ত। অতএব তোমরা যদি মক্কায় আল্লাহর বন্দেগী করতে না পার তবে মদীনায় হিজরত কর এবং শুধু আল্লাহর বন্দেগী কর, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সাধনা কর।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক এ আয়াতে বন্দাগণকে হিজরতের আদেশ দিয়েছেন। যেখানে দ্বীন ইসলাম কায়েম করা সম্ভব না হয় সেখান থেকে হিজরত করে এমন স্থানে চলে যাও যেখানে স্বাধীন ভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা সম্ভব হয়।

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সকল শহরই আল্লাহর শহর, আর সকল মানুষই আল্লাহর গোলাম। অতএব, যেখানে তুমি কল্যাণ লাভ কর সেখানেই অবস্থান কর। এরপরই সাহাবায়ে কেরামের একটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী তাদেরকে সকল প্রকার সহায়তা দান করেন। এরপর আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম মদীনা মুনাওয়্যারায় হিজরত করেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের নিকট আসবে।

ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"এরপর অবশ্যই তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে"।

যদি তোমরা অবাধ্য নাফরমান হয়ে আস তবে তোমাদের কী অবস্থা হবে?

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেন যে হিজরতের কথার সঙ্গে মৃত্যুর ঘোষণার তাৎপর্য হলো, অবশেষে অবশ্যই এ জীবনের অবসান ঘটবে এবং একদিন শুধু দেশ নয়, বরং এ পৃথিবী ছেড়েও চলে যেতে হবে, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দেশ ছেড়ে যেতে বাধা কোথায়?[৩]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৮৩
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃঃ ৩৩৭
৩। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮১১

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে আমি বেহেশতের মধ্যে এমন প্রাসাদে স্থান দান করবো, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত রয়েছে। তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। নেককারদের প্রতিদান কত উত্তম"!

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে,

ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

তোমাদের সকলকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে আর ফিরে যাওয়ার পর কি হবে তা ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

যারা ঈমান আনে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, আর সে ঈমানের দাবী মোতাবেক সৎ কাজ করে, তাদেরকে বেহেশতে এমন প্রাসাদে স্থান দেয়া হবে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ তাদের পরকালীন জিন্দেগী হবে পরম সুখ ও শান্তির, অতীব আরাম-আয়েশ ও আনন্দের। আর এ সুখ ও শান্তি দুনিয়ার জিন্দেগীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হবেনা, বরং তা হবে চিরস্থায়ী। কত উত্তম এ প্রতিদান! দুনিয়ার জিন্দেগীর মাত্র কয়েকটি দিন আল্লাহ পাকের অনুগত হওয়ার এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হওয়ার বরকতে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির কেন্দ্র বেহেশতের জীবন লাভ করা যাবে। এর চেয়ে উত্তম বিনিময় আর কি হতে পারে! তবে এর জন্যে দু'টি পূর্বশর্ত রয়েছে, একটি হলো সবর অবলম্বন করা, দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

"যারা সবর অবলম্বন করে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি ভরসা করে"।

আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের জন্যে সবর বা ধৈর্যের বড় প্রয়োজন, মন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের লাভ-লোভে আকৃষ্ট হয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে আখেরাতের লাভের জন্যে প্রস্তুত করতে হয়, যার সবর বা ধৈর্যের শক্তি যত বেশী, সে এক্ষেত্রে তত বেশী সাফল্য লাভ করে। জীবনের সকল সাফল্যের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ পাকেরই হাতে। তিনিই মহান দাতা, তিনি দান করতে ইচ্ছুক হলে কেউ বাধা দিতে পারেনা, আর তিনি দান না করলে কেউ দিতেও পারেনা, তাই জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ভরসা রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহ পাকের প্রতিই।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ
رِزْقَهَا ۖ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِنْ
سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ
سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ
مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

তরজমা

(৬০) এমন কত জীব-জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য-দ্রব্য মওজুদ রাখে না, আল্লাহ পাকই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিয্‌ক দান করে থাকেন, আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(৬১) আর (হে রসূল!) আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য এবং চন্দ্রকে কর্ম-নিরত রেখেছেন, জবাবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তবু তারা কোথায় ফিরে যায়?

(৬২) আল্লাহ পাকই তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার রিয্‌ক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিয্‌ক সীমিত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

(৬৩) আর (হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত জমিনকে সঞ্জীবিত করেন; তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। (হে রসূল!) আপনি বলুন, 'আলহামদুলিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে)! কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই সত্য অনুধাবন করেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে সবর অবলম্বনের এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ হে মানব জাতি! তোমরা জীব-জন্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, অনেক জীব-জন্তুই তাদের রিয্‌ক মানুষের ন্যায় মওজুদ রাখেনা; বরং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক যথা সময়ে তাদেরকে রিয্‌ক পৌঁছে দেন। পাখীরা সকাল

বেলা তাদের নীড় ছেড়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়, তাদের খাদ্যের অনুসন্ধান করে। আল্লাহ পাক তাদের রিয্ক দান করেন এবং সন্ধ্যা কালে উদর পূর্ণ করে নিজ নিজ নীড়ে ফিরে যায়। তারা কখনও তাদের রিয্ক সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদেরকে আল্লাহ পাক অভুক্ত রাখেন না। তাহলে মানুষ কেন তাদের রিয্কের জন্যে এত চিন্তিত হবে? অবস্থা এই যে মানুষের জীবিকার চিন্তা তাকে অনেক ক্ষেত্রেই বিব্রত করে রাখে, এমনকি সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ভুল পথে চলার কারণে মানুষ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে, তাই আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا

"কত জীব-জন্তু এমন রয়েছে যারা তাদের খাদ্য- দ্রব্য মওজুদ করে রাখে না"।

অতএব, মানুষকেও সবর অবলম্বন করতে হবে এবং এক আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখতে হবে। আর এজন্যেই তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ

"আল্লাহ পাকই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিয্ক দান করেন"।

অতএব, রিয্কের চাবিকাঠি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের হাতে, মানুষের হাতে নয়। এর সব কিছুই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন। এজন্যে দুনিয়াতে অনেক যোগ্যতা এবং ডিগ্রী লাভ করেও জীবিকার সংস্থান করা সম্ভব হয় না, অথচ যারা একেবারেই অক্ষম, অসহায় এমন প্রাণীও যথাসময়ে রিয্ক পেয়ে থাকে।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

"তিনি সব কিছু শ্রবণ করেন এবং সব কিছু জানেন"।

কার কী প্রয়োজন সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ অবগত। কে কোথায় আছে সে সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল। সুফিয়ান এবনে আলী এবনে আরকাম বলেছেন, মানুষ, ইঁদুর এবং পিপীলিকা ব্যতীত আর কোন সৃষ্টিই তাদের রিয্ক সংগ্রহ করে মওজুদ রাখে না। অথচ প্রাণী মাত্রেরই রিয্ক আল্লাহ পাকই দান করেন। আর রিয্কের ব্যাপারে সবই সমান। অর্থাৎ সকলকে আল্লাহ পাকই রিয্ক দান করেন আর কেউ নয়। মানুষ অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় রিয্ক ভক্ষণ করেই বেচে থাকে এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব, মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়্যারায় গমন করলে রিয্কের কি ব্যবস্থা হবে এ সম্পর্কে চিন্তা করা বৃথা।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

"তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত"।

তিনি তোমাদের কথা শ্রবণ করে থাকেন। এজন্যে তিনি তোমাদের একথাও শ্রবণ করেছেন যা তোমরা বলেছিলে, মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে চলে গেলে পানাহারের কি ব্যবস্থা হবে? আর এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে রিয্কের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা

দিয়েছেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত যে তোমাদের অন্তরে দুর্বল ঈমান রয়েছে।

শানে নজুল

আবদ এবনে হুমায়েদ, এবনে আবি হাতেম, বায়হাকী, এবনে আসাকের এবং আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের (রাঃ) একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আনসারদের একটি বাগানে গেলাম। তিনি সেখানে তাঁর পবিত্র হস্তে বেছে বেছে খেজুর খেতে লাগলেন এবং এরশাদ করলেন, 'এবনে ওমর! তুমিও খাও'। আমি আরজ করলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে না'। তিনি এরশাদ করলেন, 'আমার খাওয়ার ইচ্ছা আছে। এটা চতুর্থ রাত্রির পর সকাল। চারদিন হয়ে গেছে আমি কিছুই খাইনি আর কিছু পাওয়াও যায়নি'। আমি আরজ করলাম, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে সাহায্য প্রার্থী'। তিনি এরশাদ করলেন, 'এবনে ওমর! যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করতাম তবে তিনি আমাকে পারস্য রাজা কেস্‌রা এবং রোমের রাজা কায়ছারের রাজ্যের চেয়েও অধিক সম্পদ দান করতেন। কিন্তু আমি একদিন ক্ষুধার্ত থাকি এবং একদিন আহার করি। এবনে ওমর! যদি তুমি এ বয়সে উপনীত হও তখন তোমার কি অবস্থা হবে! তুমি তখন এমন সব লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে যারা সারা বছরের খাদ্য-দ্রব্য লুকিয়ে রাখবে এবং (রিয্‌ক দাতা হিসেবে আল্লাহ পাকের প্রতি) তাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়বে'।

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আল্লাহর শপথ! আমরা তখন সেখান থেকে সরে যাইনি এবং সরে যাওয়ার ইচ্ছাও করিনি তখনই আলোচ্য আয়াত وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ নাজিল হয়'।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় দিনের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করে রাখতেন না। (তিরমিজী)। হযরত ওমর এবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজেই শ্রবণ করেছি, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছিলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরষা রাখতে তবে তিনি তোমাদেরকে সেভাবেই রিয্‌ক প্রদান করতেন যেভাবে পাখীদেরকে প্রদান করে থাকেন। সকাল বেলায় পাখীরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় উদর পূর্ণ করে ফিরে আসে' (তিরমিজী, এবনে মাজা)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এমন কোন জিনিস রয়নি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং দোযখ থেকে দূরে রাখবে যা করার আদেশ আমি তোমাদেরকে দেইনি। আর এমন কোন জিনিস রয়নি যা তোমাদেরকে দোযখের নিকটবর্তী করবে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখবে যা করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি।

রুহুল কুদ্দুস (জিব্রাঈল (আঃ) আমার অন্তরে একথা ফুঁকে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যে পর্যন্ত না তার জন্যে নির্ধারিত রিয্ক পূর্ণ করবে সে পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না। অতএব, তোমরা সতর্ক হও এবং আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক, আর রিয্কের অন্বেষণে সৎ পথ অবলম্বন কর (তথা পবিত্র পন্থা অবলম্বন কর)। রিয্ক লাভে বিলম্ব হলে অন্যায় পথে আয়-রোজগারের জন্যে প্রস্তুত হওয়া তোমাদের উচিত নয়। কেননা আল্লাহ্ পাকের কাছে যা আছে তা আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয় (বগভী)।[১]

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে পবিত্র কোরআন শুধু পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর ব্যাপারেই কথা বলেনা; বরং মানুষের অর্থনৈতিক ব্যাপারেও রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি স্তরের জন্যেই রয়েছে এতে পথ-নির্দেশনা। বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান এটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেন যে আল্লাহ্ পাক প্রাণী মাত্রকেই রিয্ক দিয়ে থাকেন। তার একটি দৃষ্টান্ত হলো কাকের বাচ্চা যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন তাদের পাখা ও পশম সাদা থাকে। এরূপ দেখে কাক তাকে ঘৃণা করে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর যখন সে পশমগুলোর রং কালো হয়ে যায় তখন তার মা-বাপ ফিরে আসে এবং তাকে আদার খাওয়ায়। কিন্তু এই বাচ্চার প্রাথমিক দিনগুলোতে যখন তার মা-বাপ তার প্রতি ঘৃণার কারণে পালিয়ে যায় তখন আল্লাহ্ পাক তাদের কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশা পাঠিয়ে দেন এবং ঐ মশাগুলো তাদের খাদ্য হিসেবে গণ্য হয়।[২]

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

"আর (হে রসূল!) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, আর কে সূর্য চন্দ্রকে কর্ম-নিরত রেখেছেন; জবাবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ"।

আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন যে হে নবী! আপনি মক্কার কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্র-সূর্য কার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, দিন-রাতের পরিবর্তন কে করছেন? এ কাফেররা জবাবে একথাই বলবে যে এসব কিছু আল্লাহ্ পাকই করছেন। তারা এ মহা সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হবে। যখন তারা একথা মেনে নেয় যে সব কিছুর স্রষ্টা এক আল্লাহ্ পাকই এবং সমগ্র সৃষ্টি-জগত তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন তখন তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সম্মুখে কেন মাথা নত করে? তাই প্রশ্ন করা হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৯০-৯১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ১৬২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠাঃ ১১
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠাঃ ১১

فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

"তবু তারা কোথায় ফিরে যায়"?

অর্থাৎ যখন তোমরা আল্লাহ্ পাককে স্রষ্টা ও পালনকর্তা বলে বিশ্বাস কর তখন তাঁর তওহীদ বা একত্ববাদকে কেন অস্বীকার কর? কেন তাঁর সাথে শেরক কর? কেন আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যের কাছে আশা কর? কেন দেব-দেবীর নিকট মাথা নত কর? মক্কার মুশরেকরা স্বীকার করতো যে আল্লাহ্ পাকই সব কিছু করেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করতো। তাই এভাবে তাদেরকে তওহীদে বিশ্বাসের জন্যে আহবান করা হয়েছে।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"আল্লাহ্ পাকই তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিয্ক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক সীমিত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত"।

অর্থাৎ বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক বৃদ্ধি করেন, স্বচ্ছল জীবিকা দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত করেন। আল্লাহ্ পাক পূর্ববর্তী আয়াতে সৃষ্টির কথা বলেছেন, আর এ আয়াতে রিয্কের কথা এরশাদ করেছেন, কেননা জন্ম লাভের পরই প্রয়োজন হয় খাদ্যের, আর এ খাদ্য আল্লাহ্ পাকই দান করেন, অতএব যিনি সৃষ্টি করেন, যিনি লালন-পালন করেন, যিনি রিয্ক দান করেন, তাঁর এবাদত করাই মানুষের একান্ত কর্তব্য। যে দেব-দেবী মানুষকে কিছুই দিতে পারেনা, তাদের সম্মুখে মাথা নত করা অযৌক্তিক, অসুন্দর।

মক্কার পৌত্তলিকরা স্বীকার করতো যে আল্লাহ্ পাকই স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা, এরপরও আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতো না, কখনও তারা পাথরের পূজা করতো, আর কখনও তাদের স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পূজা করতো।

তাই পবিত্র কোরআনের আয়াতে তাদেরকে শেরক পরিহার করার এবং তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে সরল সঠিক পূণ্য পন্থা তথা ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে।

অতএব স্বচ্ছলতা এবং দারিদ্র্য আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতে হয়, তিনি যাকে ইচ্ছা ধনী করেন, যাকে ইচ্ছা দরিদ্র করে রাখেন। এটি তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার। এজন্যে দেখা যায় অনেক গুণী-জ্ঞানী লোকও দারিদ্র-প্রপীড়িত, অথচ অনেক অনেক অশিক্ষিত লোকও সম্পদশালী।

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। কার স্বচ্ছলতায় কল্যাণ রয়েছে আর কার দারিদ্র্যে রয়েছে কল্যাণ, এসব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফাল। কার

কী প্রয়োজন, আর কত প্রয়োজন এসব কিছু আল্লাহ পাক জানেন।

আলোচ্য আয়াতের তিনটি বাক্যে আল্লাহ পাকের তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা রয়েছে।

(১) আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

"তিনিই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন"।

(২) তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি সর্বত্র কার্যকর, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বচ্ছলতা দান করেন"।

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

(৩) "তিনি মহাজ্ঞানী, সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত"।

অতএব, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি সর্বত্র কার্যকর এবং তিনি সকলের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই সকল এবাদত হতে হবে এক আল্লাহ পাকের জন্য, শুধু তাঁরই সমীপে আশা করতে হবে এবং শুধু তাঁর প্রতিই ভরসা রাখতে হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে, এটি হলো 'হাদীসে কুদসী'। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "আমার কিছু সংখ্যক বন্দা আমার এবাদতে নিমগ্ন থাকার জন্যে দোয়া করে কিন্তু আমি তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখি যেন তাদের মধ্যে অহংকার না আসে, যা তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। আমার কিছু এমন বন্দা আছে ধন-সম্পদের কারণে তাদের ঈমান সঠিক থাকে। যদি আমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে দেই তবে অভাব-অনটন তাদের ঈমানকে বিনষ্ট করে ফেলে। আমার কিছু এমন বন্দাও রয়েছে যাদের ঈমান রক্ষা করার জন্যে দারিদ্র্য খুবই প্রয়োজনীয়। যদি আমি তাদেরকে সম্পদশালী করে দেই তবে তা তাদের ঈমান বিনষ্ট করে। আর আমার এমন কিছু বন্দাও রয়েছে, তাদের অটুট স্বাস্থ্য তাদের ঈমান রক্ষার কারণ হয়। যদি আমি তাদেরকে রুগ্ন করি ঐ রোগ তাদের ঈমান বিনষ্ট করে দেয়। আর আমার এমন কিছু বন্দা রয়েছে যাদের ঈমান সঠিক থাকে রোগের কারণে। যদি আমি তাদেরকে সুস্থ করে দেই তবে স্বাস্থ্যই তাদের ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। আমি আমার বন্দাদের মনের অবস্থা জানি। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার যে জ্ঞান রয়েছে তার আলোকেই আমি তার ব্যবস্থা করি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমি সব কিছু জানি, সব কিছুর খবর রাখি"।

এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত"।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

"আর (হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত জমিনকে সঞ্জীবিত করেন, তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'।

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আপনি মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, কে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত-শুষ্ক জমিনকে সঞ্জীবিত করেন। জবাবে তারা অবশ্যই বলবে, এক আল্লাহ পাকই তা করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয় এবং আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্যে এবং আল্লাহ পাকের শোকর যে তিনি আপনাকে মুশরেকদের গোমরাহী থেকে রক্ষা করেছেন। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের শোকর যে কাফেররা এ সম্পর্কে আপনার সত্যতা স্বীকার করে এবং আল্লাহ পাক আপনার দলিলকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

বরং তাদের অধিকাংশ লোকই সত্য অনুধাবন করেনা। আর একথাও বোঝে না যে তাদের আমল কত মন্দ! আর তারা এ সত্য উপলব্ধি করেনা যে তাদের কথায় কত স্ব-বিরোধিতা রয়েছে! একদিকে তারা আল্লাহ পাককে সব কিছুর স্রষ্টা মানে, অপর দিকে তারা অন্য সৃষ্টিকে তাঁর সাথে শরীক করে।[১]

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেন যে (হে রসূল!)) আপনি বলুন, "আলহামদুলিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ পাকের শোকর, সকলে একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত রিয্ক এবং তার আসবাবপত্র সবই আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। এমন অবস্থায় বুদ্ধির দাবী হলো, একথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়া যে আল্লাহ পাকই স্রষ্টা ও পালনকর্তা এবং তিনিই রিয্ক দাতা। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ মহা সত্যকে মেনে নেয় না। এমনকি দুনিয়ার ব্যাপারে যাদেরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে হয় আখেরাতের ব্যাপারে তারাই নির্বোধ প্রমাণিত হয়। কেননা তারা আখেরাত পরিত্যাগ করে এবং দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে, চিরস্থায়ী জীবনের লাভকে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৯২-৯৩

পরিত্যাগ করে এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের লোভে আকৃষ্ট থাকে। নিঃসন্দেহে এটি নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। তারা সর্বদা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাফল্য লাভে তথা অর্থ-সম্পদ আহরণে ব্যস্ত থাকে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের কথা বিস্মৃত হয়।[১]

ইমাম তাবারী (রঃ) আলোচ্য বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, বরং অধিকাংশ মুশরেকরা এ সত্য উপলব্ধি করেনা যে কিসে তাদের লাভ, কিসে তাদের ক্ষতি। তাদের মূর্খতার কারণে তারা এ ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাস করে যে তাদের দেব-দেবীরা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে তাদের সাহায্যকারী হবে। আর তারা একথা জানে না যে তাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং তারা চিরদিন দোযখে থাকবে।[২]

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا
اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ
يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۚ فَسَوْفَ
يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ
مِنْ حَوْلِهِمْ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا
جَآءَهُ ۗ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا
فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

তরজমা

(৬৪) আর দুনিয়ার এ জীবন তো শুধু খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিশ্চয় পরকালীন জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা তা জানতো!

(৬৫) যখন তারা তরীতে আরোহন করে তখন একান্ত ভাবে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁকে ডাকে। কিন্তু এরপর তিনি যখন তাদেরকে ডাঙ্গায় পৌঁছিয়ে রক্ষা করেন তখনই তারা শেরকে লিপ্ত হয়।

(৬৬) এভাবে তাদের প্রতি আমার দানকে তারা অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৮৩
২। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠাঃ ৬

মত্ত হয়ে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে তারা জানতে পারবে (এর পরিণাম কত ভয়াবহ)।

(৬৭) তারা কি দেখেনা যে নিশ্চয় আমি হরমকে নিরাপদ স্থান করে রেখেছি, অথচ এর চারিপার্শ্বে যে সব লোক রয়েছে তাদের প্রতি আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যাকে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৬৮) যারা আল্লাহ্ পাকের উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট থেকে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে? দোযখের মধ্যেই কি কাফেরদের আবাস নয়?

(৬৯) যারা আমার পথে সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক খাঁটি লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

বরং তাদের অধিকাংশ লোকই সত্য অনুধাবন করেনা; বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগায় না। এজন্যে তারা এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার লোভে-মোহে মত্ত থাকে, যদি তারা জ্ঞান-বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করতো, তবে এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সত্যিকার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারত, তাই আলোচ্য আয়াতে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে।[১]

অথবা কথাটিকে এভাবেও বলা যায়, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এরশাদ হয়েছে, কাফেররা একথা বিনা-দ্বিধায় স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ পাকই স্রষ্টা ও পালনকর্তা এবং তিনিই রিয্ক দাতা, অথচ এতদসত্বেও তারা এক আল্লাহ্ পাকের এবাদত করেনা; তাদের স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পূজা করে, আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা; পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের কথা স্মরণ করেনা, আর তা করেনা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া-মোহে মত্ত থাকার কারণে, তাই আলোচ্য আয়াতে এ পার্থিব জীবনের তাৎপর্য ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছেঃ[২]

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ

"আর দুনিয়ার এ জীবনতো শুধু খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিশ্চয় পরকালীন জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা তা জানত"!

দুনিয়ার জীবন, দুনিয়ার সুখ-শান্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে আখেরাতের জিন্দেগী হলো চিরস্থায়ী। দুনিয়ার সুখ শান্তি সবই অস্থায়ী, অনিত্য শুধু তাই নয়; বরং

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৮৫
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠাঃ ৯১

দুনিয়ার এ জীবন খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখানকার সব সত্য মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে মিথ্যায় পরিণত হয়। দু'দিনের এ জীবনকে স্থায়ী মনে করা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সব আনন্দ মাটি হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, আখেরাতের জীবন হলো চিরস্থায়ী তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ

অর্থাৎ আখেরাতের জীবন হলো প্রকৃত জীবন। সেখানকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী।

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

"হায়! যদি তারা জানতো"!

এর অর্থ হলো পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। অতএব, আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সম্বল সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করা পরিণামদর্শী মানুষের একান্ত কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা বাস্তববাদী এবং কল্যাণকামী তারা নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছেড়ে দিয়ে খেলা-ধূলায় মত্ত থাকতে পারেনা।

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ○

"যখন তারা তরীতে আরোহন করে তখন একান্তভাবে আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁকে ডাকে। কিন্তু এরপর তিনি যখন তাদেরকে ডাঙায় পৌঁছিয়ে রক্ষা করেন তখনই তারা শেরকে লিপ্ত হয়"।

এ আয়াতে মানুষের প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে। মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন কর্মরত থাকে তখন সে জীবনের মালিক আল্লাহকে ভুলে যায়। অথচ সে যখন বিপদগ্রস্ত হয় যেমন তরীতে যখন আরোহণ করে এবং সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তরী নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন সে অত্যন্ত কাতর হয়ে আল্লাহ্ পাককে ডাকতে থাকে, তখন আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কাউকে সে ডাকেনা, কারো কথা তার মনে আসে না। শুধু আল্লাহ্ পাকের কাছেই তার একমাত্র আশা যে তিনিই তাকে রক্ষা করবেন। কিন্তু যখন আল্লাহ্ পাক ঐ মহা বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করেন এবং তরী সমুদ্র তীরে পৌঁছে যায়, অবস্থার পরিবর্তন হয় তখন আত্মবিস্মৃত মানুষ আল্লাহকে পুনরায় ভুলে যায় শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে।

لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

"এভাবে তাদের প্রতি আমার দানকে অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে তারা জানতে পারবে (এর পরিণাম কত ভয়াবহ)"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত এভাবে তারা অস্বীকার করে এবং তাঁর অকৃতজ্ঞ হয় এবং দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়। ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ার এবং আল্লাহ্ পাককে ভুলে যাওয়ার এবং তাঁর নাফরমানীর শোচনীয় পরিণাম কত ভয়াবহ হয় তা অচিরেই তারা দেখতে পাবে।

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এবনে এছহাক বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন একরামা এবনে আবু জেহেল মক্কা থেকে পলায়ন করলো এবং আবিসিনিয়া যাওয়ার জন্যে তরীতে আরোহন করলো। কিন্তু সমুদ্র বক্ষে উত্তাল তরঙ্গের কারণে তরী নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হলো। তখন সকলেই বললো, 'এ মুহূর্তে আল্লাহকে না ডাকলে আর রক্ষা নেই'। অথচ তারা ছিল কাফের ও মুশরেক। একরামা এবনে আবু জেহেল বললো, 'যদি এ সামুদ্রিক বিপদ থেকে রক্ষাকারী আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ না থাকে তবে পৃথিবীর স্থল ভাগেও আল্লাহ্ ব্যতীত কোন রক্ষাকারী নেই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার সাথে অঙ্গীকার করছি, যদি আমাকে এ মহা বিপদ থেকে রক্ষা কর, যদি আমি বেচে থাকি তবে আমি সরাসরি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হবো এবং তাঁর হাতে হাত দিয়ে তোমার কালেমা পাঠ করবো। আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহর রসূল আমার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবেন, আমার প্রতি দয়া করবেন।[১]

তফসীরকার একরামা (রঃ) বর্ণনা করেন, বর্বরতার যুগে পৌত্তলিকরা সমুদ্র সফরে যেত কিন্তু যখন ঝড় শুরু হতো, সমুদ্রের তরঙ্গ বিপদের কারণ হতো তখন মূর্তিগুলোকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতো এবং হে রব! বলে আল্লাহ্ পাককে অত্যন্ত বিনীত ভাবে ডাকতো। মহা বিপদের সময় এভাবে এক আল্লাহ্ পাকের অনুগত হতো কিন্তু যখন ঐ বিপদ দূরীভূত হতো, তাদের তরী এসে তীরে ভীড়তো তখন পুনরায় শেরক করতো।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ পাকের সাথে এজন্যে শেরক করতো যেন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে যে নেয়ামত দান করেছেন, তারা তাকে অস্বীকার করে। অথবা এর অর্থ হলো তাদের শেরকের পরিণিত এই, তারা আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করলো এবং দুনিয়াতে কয়েকদিন তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হলো কিন্তু আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চির শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত হলো।

পক্ষান্তরে মোমেনদের অবস্থা এই, আল্লাহ্ পাক যখন তাদেরকে এমনি বিপদ থেকে রক্ষা করেন তখন তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি শোকর গুজার হয় এবং তাদের এ বিপদমুক্তি আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাদের অধিকতর আনুগত্যের কারণ হয়।

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠাঃ ১২

অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে তারা জানতে পারবে, তাদের এ অকৃতজ্ঞতা এবং নিমকহারামীর পরিণাম কত ভয়াবহ হয়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا

"তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয় আমি হরমকে নিরাপদ স্থান করে রেখেছি, অথচ এর চারিপার্শ্বে যে সব লোক রয়েছে তাদের প্রতি আক্রমণ করা হয়, তবে কি তারা মিথ্যাকে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করবে"?

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করার পরও তারা তা অস্বীকার করে এবং বাতিলের প্রতি তারা বিশ্বাস করে। "বাতিল" শব্দটি এ স্থলে মূর্তি অথবা শয়তান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের নেয়ামত ভোগ করে, আর বিশ্বাস করে মূর্তির প্রতি অথবা শয়তানের প্রতি।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের "বাতিল" শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে আল্লাহ পাক ব্যতীত সব কিছুই বাতিল। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন কিছুরই স্থায়িত্ব নেই, সব ভিত্তিহীন। সৃষ্টি মাত্রেরই ক্ষয় আছে, লয় আছে কিন্তু আল্লাহ পাকের লয় নেই।

الا كل شيء ماخلا الله باطل

"সতর্ক হও, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই বাতিল"।

وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ কাফেররা আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কিছুকে শরীক করে এবং তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

আল্লাহ পাকের নেয়ামত

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর নেয়ামত কথাটির তাৎপর্য হলো স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অথবা পবিত্র কোরআন।[১]

কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাঁর মহত্তম আদর্শ বিশ্ব মানবের কল্যাণের মূর্ত প্রতীক, এমনিভাবে পবিত্র কোরআনও সমগ্র মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত এবং বিশ্ব মানবের মুক্তির মহাসনদ, মানব জাতির হেদায়েতের মূল উৎস এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কবচ, এজন্যে কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (সূরা মায়েদা)

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৯৫

"নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে একটি নূর এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব"।

আলোচ্য আয়াতে "নূর" শব্দ দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কিতাব হলো পবিত্র কোরআন। আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَالنُّورِ الَّذِىٓ اَنزَلنَا (সূরা তাগাবুন)

"অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি এবং সে নূরের প্রতি যা আমি নাজিল করেছি (অর্থাৎ পবিত্র কোরআন)"।

এ আয়াতে "নূর" বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনকে এবং পূর্বোল্লেখিত আয়াতে "নূর" বলা হয়েছে প্রিয়নবী হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেমন আল্লাহ পাকের নূর, তেমনি পবিত্র কোরআনও আল্লাহ পাকের নূর। আর আলোচ্য আয়াতে নেয়ামত বলা হয়েছে এ দু'টি নূরকে, অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআনকে। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তব রূপায়ন হয়েছিল প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান জীবনে। তাই তিনি ছিলেন জীবন্ত কোরআন, বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে এবং পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে, আর এ দু'টি নেয়ামতের মাধ্যমেই দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে, তাই বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক দিনে আরফার ময়দানে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا (সূরা মায়েদা)

"আজকের দিনে আমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের জীবন বিধানকে এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে জীবন বিধান রূপে পছন্দ করেছি"।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর নেয়ামত বলতে আল্লাহ পাকের সমস্ত নেয়ামতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মানব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করতে হয়। সে সমস্ত নেয়ামতের প্রতিই এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হয়, কখনো তাঁর নাফরমানী না করে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ আল্লাহ পাক মক্কাবাসীকে বিশেষভাবে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মক্কা নগরীকে তিনি নিরাপদ নগরীতে পরিণত করেছেন। চতুর্দিকের অশান্ত পরিবেশের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র

১। তফসীরে মাজেদী, পৃঃ ৮১৩

করেছেন মক্কা নগরীকে, তাই মক্কাবাসী অত্যন্ত শান্তিতে এবং নিরাপদে জীবন যাপন করছে। মক্কাবাসী এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হচ্ছে, আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করছে এবং তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনকে অমান্য করছে। শান্তি এবং নিরাপত্তার যে নেয়ামত আল্লাহ পাক মক্কাবাসীকে দান করেছেন, তাকে মক্কাবাসী অস্বীকার করছে বলেই এরশাদ হয়েছেঃ

وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ

"তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করছে"।[১]

ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেনঃ মক্কা নগরীকে নিরাপদ নগরী করার মাধ্যমে মক্কাবাসীর প্রতি যে নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে তার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যাংশ দ্বারা।[২]

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ

"যারা আল্লাহ্ পাকের উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নিকট থেকে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? দোযখের মধ্যেই কি কাফেরদের আবাস নয়"?

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে আল্লাহ্ পাকের শান এবং মর্যাদা বিরোধী মন্তব্য করে এবং মিথ্যা রটনা করে অথবা যখন সত্য তাদের নিকট এসেছে তখন তারা তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে। আর সত্য হলো স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অথবা পবিত্র কোরআন। অথবা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন হয়েছে বা পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তখন তারা তাঁকে মিথ্যা-জ্ঞান করেছে। তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? আর এ দূরাত্মা জালেমদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

"দোযখের মধ্যেই কি কাফেরদের আবাস নয়"?

অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা রটনা করলো, সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করলো তথা আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূলকে অমান্য করলো এবং আল্লাহ্ পাকের মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করলো তখন তারা কি দোযখের শাস্তির উপযুক্ত হয়নি? অথবা এর অর্থ হলো তারা কি জানে না যে কাফেরদের ঠিকানা হলো দোযখ। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাকের নামে মিথ্যা রটনা করার ধৃষ্টতা দেখায় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু লাইহে ওয়াসাল্লাম ও পবিত্র কোরআনকে অমান্য করার দুঃসাহস দেখায়।

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আবাস, পৃষ্ঠা-৩৩৮
২। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১০

মূলতঃ যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালাতকে অস্বীকার করে অথবা পবিত্র কোরআনকে অমান্য করে, অবশ্যই তাদের শাস্তি হবে দোযখ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইমাম তাবারী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যদিও আলোচ্য আয়াতে প্রশ্নবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু মূলতঃ এর অর্থ হলো কাফেরদের উদ্দেশ্যে জোরালো ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করা এ মর্মে যে যারা সবচেয়ে বড় জালেম, অবশ্যই তাদের ঠিকানা হবে দোযখে, যেখানে তারা চিরদিন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যারা আল্লাহ্ পাকের উপর মিথ্যা রটনা করে অর্থাৎ তাঁর সন্তান আছে বলে মনে করে (নাউযুবিল্লাহে মিন জালেক) অথবা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা-জ্ঞান করে তাদের স্থায়ী ঠিকানা হবে দোযখ। এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে আবু জেহেল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে।[২]

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যারা আমার পথে সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি"।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত থাকে, যারা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করে তাদের সাধনা ব্যর্থ হবার নয়; বরং তাদেরকে আল্লাহ্ পাক সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করেন। তাদেরকে তিনি তাঁর মা'রেফাত হাসিল করার তওফিক দান করেন। তারা আল্লাহ্ পাকের পথে যত সাধনা করে ততই আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের পথ অতিক্রম করতে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয় পথে চলবার তওফিক দান করেন। অথবা এর অর্থ হলো যারা আল্লাহ্ পাকের পথে তথা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পথে চলে আল্লাহ্ পাক তাদের হেদায়েতের মরতবা আরও বৃদ্ধি করে দেন।

হযরত আবু দরদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের তফসীরে এরশাদ করেছেনঃ যারা তাদের জানা পথে চলতে চেষ্টা করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সে পথ বাতলে দেন যা তারা জানে না।

হযরত আতা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা আমার সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হয় আমি তাদেরকে সওয়াব লাভের পথ-প্রদর্শন করে থাকি।

হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রঃ) বলেছেন, যারা গুনাহ্ থেকে তওবা করার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে এখলাছের পথ প্রদর্শন করি।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, সর্বোত্তম জেহাদ হলো নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা অর্থাৎ যারা কুপ্রবৃত্তি প্রতিরোধের সাধনা করে আল্লাহ্ পাক তাদের

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১০
২। তানবীরুল মেকবাছমিন তাফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৩৮

সাধনাকে সার্থক করেন।

হযরত ফুজায়েল এবনে ইয়াজ বলেছেন, যারা দ্বীনি এলম অর্জনের সাধনা করে আমি তাদেরকে সে জ্ঞান মোতাবেক আমল করার তওফিক প্রদান করি।

হযরত সুহায়েল এবনে আবদুল্লাহ (রঃ) বলেছেন, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখিয়ে থাকি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের চেষ্টা করে আমি তাদেরকে সওয়াবের পথ দেখিয়ে থাকি।

হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে, যে ব্যক্তি যা জানে এবং তার উপর আমল করে আল্লাহ্ পাক তাকে তার অজানা বিষয়ের এলম দান করেন।

وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

"আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক খাঁটি লোকদের সঙ্গে রয়েছেন"।

অথাৎ যারা নেককার, পরহেযগার, যারা আল্লাহ্ পাকের খাঁটি বন্দা দুনিয়াতে তারাই আল্লাহ্ পাকের সাহায্য লাভ করে এবং আখেরাতে সওয়াব এবং মাগফেরাত তারাই লাভ করবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফী-সাধকগণ বলেছেন, যারা শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কাজ করে তারা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। তবে এ নৈকট্য-ধন্য হওয়ার বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়, তত্ত্বজ্ঞানীগণ তা শুধু উপলব্ধি করতে পারেন।[১]

এজন্যেই মরমী কবি বলেছেনঃ

محبت معنی والفاظ میں لائی نہیں جاتی

یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی

"মহব্বত এমনি একটি বিষয় যা কোন ভাষা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি এমনি একটি মহা সত্য যা বর্ণনাতীত"।

ইমাম তাবারী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে যে কাফেরদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা জেহাদ করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাঁর পথ-প্রদর্শন করেন অর্থাৎ তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল পথ-প্রদর্শন করেন।

ইমাম তাবারী (রঃ) তফসীরকার এবনে যায়েদ (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে তিনি আলোচ্য আয়াতের جَاهَدُوا فِيْنَا শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন, যারা আমার পথে জেহাদ করে, তাদেরকে আমি আমার পথ-প্রদর্শন করি।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৯৫-৯৬
২। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১১

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরা রুম

سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّونَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ
بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۛ لِلّٰهِ الْاَمْرُ
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾
بِنَصْرِ اللّٰهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

তরজমা

(১) আলিফ, লাম, মীম।

(২) রোমানরা পরাজিত হয়ে গেল।

(৩) নিকটবর্তী এলাকায়, এ পরাজয়ের পর পুনরায় তারা শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে।

(৪) কয়েক বছরের মধ্যেই, পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত এক আল্লাহ পাকেরই, আর সেদিন মোমেনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হবে।

(৫) আল্লাহ্ পাকের সাহায্য লাভ করে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করেন, আর তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব দয়াবান।

সূরায়ে রুম প্রসঙ্গে

সূরায়ে রুম মক্কায় অবতীর্ণ। ৬ রুকু বিশিষ্ট এ সূরায় ৬০খানি আয়াত রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফেই নাজিল হয়েছে।

স্বপ্নের তা'বীর

যদি কেউ সূরায়ে রুম স্বপ্নে পাঠ করতে দেখে তবে সে এলম ও আমল উভয় সম্পদ লাভ করবে এবং অর্থ-সম্পদও অধিক পরিমাণে পাবে।

শানে নজুল

মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান জানাচ্ছিলেন তখন রোমক সাম্রাজ্য নাসারাদের হাতে ছিল। আর পারস্য সাম্রাজ্য ছিল অগ্নিপূজকদের হাতে। পারস্য রাজা খসরু পারভেজ তখন রুমের উপর হামলা করে এবং সীমান্তের কয়েকটি শহরে বিজয় লাভ করে। যেহেতু পরাজিত রোমানরা আহলে কেতাব ছিল এবং বিজয়ী পারসিকরা মুশরেক ছিল, এজন্যে মক্কার মুশরেকরা পারস্যের বিজয়ে আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং মুসলমানদেরকে বলে, এভাবে আমরাও তোমাদেরকে পরাজিত করবো। যেভাবে ইঞ্জিলের অনুসারীরা পরাজিত হয়েছে পারস্যের পৌত্তলিকদের কাছে, ঠিক তেমনি তোমরাও আমাদের নিকট পরাজিত হবে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যখন রুমের এ ঘটনা ঘটে এবং মুশরেকদের আপত্তিকর মন্তব্য শ্রুত হয় তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) এ সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন। তিনি এরশাদ করেন, অদূর ভবিষ্যতে রোমানরা পারস্যবাসীদেরকে পরাজিত করবে, তখন সূরায়ে রুমের প্রথম কয়েকখানি আয়াত নাজিল হয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঐ কথা এবং এরপর পবিত্র কোরআনের এ আয়াত সমূহ শ্রবণের পর মুশরেকদেরকে বললেন, তোমরা পারস্যের এ বিজয়ে দম্ভ প্রকাশ করোনা। কেননা এ বিজয় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। অদূর ভবিষ্যতে আহলে কেতাব রুমীরা তোমাদের পৌত্তলিক ভাই পারস্যবাসীকে পরাজিত করবে, একথা বিশ্বাস কর। কেননা এটি শুধু আমার কথা নয়; বরং এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা। তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। একথা শ্রবণ করে উবাই এবনে খালফ দাঁড়িয়ে বললো, 'তুমি মিথ্যা কথা বল'। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যাবাদী'। তখন সে বললো, 'ঠিক আছে, যদি তিন বছরের মধ্যে রোমক সম্রাট বিজয়ী হয় তবে আমি তোমাকে দশটি উট দেব। আর যদি তা না হয় তবে তুমি আমাকে দশটি উট দেবে'। হযরত আবুবকর (রাঃ) এ শর্ত মেনে নিলেন এবং হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন।

১। তফসীরে আদ্দুররুল মনছুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৬২
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৬

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এবং আল্লামা সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, এ ঘটনা বাজী ধরা হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশের পূর্বের।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন, 'কোরআন করীমে এ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা হলো بِضْع এর অর্থ তিন থেকে নয়, অর্থাৎ রুমীরা তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে বিজয় লাভ করবে। অতএব, উবাই এবনে খালফের সঙ্গে তিন বছরের স্থলে নয় বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট কর'। হযরত আবু বকর (রাঃ) উবাই এর নিকট গমন করলেন। উবাই বললো, 'আগের কথায় কি আক্ষেপ হচ্ছে'? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'না, পূর্বের চেয়ে অধিকতর প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি। আস, সময় বাড়িয়ে নাও এবং সম্পদও বাড়িয়ে নাও। সময় তিন থেকে নয় বছর এবং উট দশটির স্থলে একশ'টি নির্দিষ্ট হলো'। এরপর এই ৯ বছরের ভেতরেই আহলে কেতাব রুমীরা পৌত্তলিক পারস্যবাসীকে পরাজিত করে। এভাবে পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়।

কিভাবে এ ঘটনা ঘটে তা অতি বিস্ময়কর, তফসীরকারগণ এর উল্লেখ করেছেনঃ

বিজয়ী পারস্য রাজার সেনাধক্ষ শাহ্‌রিরাজের ভ্রাতা ফরখান মদ্যপানরত অবস্থায় বলেছিল, 'আমার মনে হয় আমি পারস্য রাজার সিংহাসনে আরোহন করেছি এবং পারস্যের রাজা হয়েছি'। এ মন্তব্যের খবর পারস্য রাজার কাছে পৌঁছে যায়। পারস্য রাজা কেসরা শাহ্‌রিরাজকে এ মর্মে নির্দেশ দেয় যে পত্র পাওয়া মাত্র তোমার ভাই ফরখানকে হত্যা করে তার মাথা আমার নিকট প্রেরণ কর। শাহ্‌রিরাজ জবাবে লিখলো, 'হে বাদশাহ! ফরখানকে হত্যা করার ব্যাপারে এত তাড়াহুড়া করোনা, সে যদি তোমার দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে এত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করবে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না'।

বাদশাহ তার জবাবে লেখে, 'তার মত বহু বীর পুরুষ আমার নিকট আছে। তুমি চিন্তা করোনা। তার ব্যাপারে আমার আদেশ অবিলম্বে পালন কর'। শাহ্‌রিরাজ আবার তার জবাব লিখলো এবং বাদশাহ কেসরাকে বোঝালো। ফলে বাদশাহ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সে ঘোষণা করে দিল যে শাহ্‌রিরাজকে আমি নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করলাম এবং তার স্থলে তার ভাই ফরখানকে সেনাপতি নিযুক্ত করলাম। এ ঘোষণা সম্বলিত পত্র লিখে দূতের মাধ্যমে শাহ্‌রিরাজের কাছে পাঠিয়ে দিল। অর্থাৎ তুমি আজ থেকে পদচ্যুত এবং তোমার পদ ফরখানকে বুঝিয়ে দাও। এই সঙ্গে দূতকে আরেকটি গোপন পত্র দিল যে শাহ্‌রিরাজ যখন তার পদ থেকে সরে যাবে এবং ফরখান সে পদ গ্রহণ করবে তখন তুমি তাকে আমার এ ফরমানটি দিও। দূত যখন সেখানে পৌঁছলো তখন শাহ্‌রিরাজ পত্র পাঠ করেই বললো যে বাদশাহ্‌র হুকুম আমি মেনে নিলাম। আমি খুশী মনে আমার পদ ফরখানকে দিয়ে দিলাম। সুতরাং সে আসন থেকে নেমে আসলো এবং ফরখানকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল। ফরখান যখন সেনাপতির আসনে বসলো এবং সেনাবাহিনী তার নেতৃত্ব মেনে নিল তখন দ্বিতীয় পত্রটি দূত ফরখানের সম্মুখে পেশ করলো। সে পত্রে শাহ্‌রিরাজকে হত্যা

করা এবং তার মস্তক শাহী দরবারে প্রেরণ করার নির্দেশ ছিল। ফরখান পত্র পাঠ করে শাহ্‌রিরাজকে ডাকলো এবং তার শিরচ্ছেদ করার হুকুম দিল। শাহ্‌রিরাজ বললো, 'তাড়াহুড়া করোনা। আমাকে একটি ওছিয়ত লিখবার সময় দাও'। সে তার কথা মেনে নিল। তখন শাহ্‌রিরাজ তার নথিপত্র তলব করলো। তাতেই ছিল সে সব চিঠি-পত্র যা পারস্য রাজা ফরখানকে হত্যা করার জন্যে লিখেছিল। ঐ চিঠিগুলো ফরখানকে দেখিয়ে শাহ্‌রিরাজ তাকে বললো, 'দেখ, এসব কিছু তোমার সম্পর্কেই হয়েছে কিন্তু আমি বাদশাহ্‌র আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও তা পালন করিনি এবং তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিনি। আর তুমি আদেশ পেয়েই আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ'। চিঠিগুলো দেখার পর ফরখানের চোখ খুলে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে দিল এবং স্বীয় ভ্রাতা শাহ্‌রিরাজের হাতে সব কিছুর দায়িত্ব অর্পণ করলো। শাহ্‌রিরাজ ঐদিন সন্ধ্যায় রোমক সম্রাটকে একটি চিঠি লিখে যার মর্ম এই, তোমার সঙ্গে আমার একটি গোপন সাক্ষাতের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একটি জরুরী বিষয়ে পরামর্শ দরকার। আর বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমি কোন বাহকের মাধ্যমে তোমার নিকট পৌঁছাতে পারছি না এবং এ মর্মে কোন চিঠিও লিখতে পারছিনা; বরং আমি নিজেই তোমার নিকট বিষয়টি পেশ করবো। পঞ্চাশ জন লোক তোমার সঙ্গে নিয়ে আস। আমার সঙ্গেও পঞ্চাশ জনই থাকবে। রোমক সম্রাট এ পত্র পেয়েই শাহ্‌রিরাজের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে রওয়ানা হলো। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পাঁচ হাজার অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে নিল। আর গোয়েন্দা বিভাগের লোকদেরকে আগেই প্রেরণ করলো। তারা এসে যথাসময়ে সংবাদ দিল যে কোন চক্রান্ত নেই। শাহ্‌রিরাজ একাই এসেছে। তার সঙ্গে শুধু পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী রয়েছে। রোমক সম্রাট এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর তার সঙ্গের পাঁচ হাজার অশ্বারোহীকে ফেরত পাঠিয়ে দিল এবং সাক্ষাতের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল। উভয়ের সঙ্গী পঞ্চাশ জনকেও দূরে সরিয়ে দিল। শুধু তারা দু'জন রয়ে গেল। তাদের নিকট কোন হাতিয়ারও ছিল না। শুধু একটি করে ছোরা ছিল এবং উভয়ের পক্ষে একজন করে দোভাষী ছিল। শাহ্‌রিরাজ তখন রোমক সম্রাটকে বললো, 'হে সম্রাট! পূর্বে তোমাকে পরাজিত করার ব্যাপারে আমাদের দু' ভাইয়ের ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমরাই তোমার দেশের একাংশ দখল করে নিয়েছি। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পারস্য রাজা এখন আমাদেরকে হিংসা করে। আমাকে সে আদেশ দিয়েছে আমার ভাইকে হত্যা করার জন্যে, আর আমার ভাইকে আদেশ দিয়েছে আমাকে হত্যা করার জন্যে। এজন্যে আমরা উভয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা তোমার সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করবো এবং পারস্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো'।

রোমক সম্রাট আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাব গ্রহণ করলো। এরপর তারা ইঙ্গিতে কথা বললো। যার অর্থ ছিল এই যে উভয় দোভাষীকে হত্যা করা হোক। কেননা যদি এরা জীবিত থাকে তবে এ গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাই তারা উভয়ে এ ব্যাপারে একমত হলো এবং প্রত্যেকে তার নিজের দোভাষীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করলো।

আল্লাহ্ পাক এভাবে পারস্য রাজাকে ধ্বংস করলেন।

কারো কারো মতে, ৬ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার চুক্তির দিন এ সংবাদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে, ফলে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন।[১]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দলিল উল্লেখিত হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দলিল-প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াতও নাজিল হয়েছিল। অবশেষে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বিগত সূরার শেষে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আর এ সূরায়ও ঘোষণা করা হয়েছে যে দুনিয়ার এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে বিজয় দান করেন, এরপর সে বিজয়ীকে আবার পরাজিতও করেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কারো বিজয় তার সত্যতার দলিল নয়। এতদ্ব্যতীত, দুনিয়ার এ জীবনে সম্মান-মর্যাদা বা অপমান সবই আল্লাহ্ পাকের কতৃত্বাধীন, এ সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মক্কার কাফেররা কেন আযাবকে তরান্বিত করতে চায় এবং মুসলমানদের সাময়িক দারিদ্র্য দেখে কেন তাদেরকে হেয় মনে করে, কেননা মুসলমানগণ এখন একটি ক্রান্তি-লগ্ন অতিক্রম করছেন, অথচ অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের এ দারিদ্র-প্রপীড়িত সৈনিকগণ রোমক সম্রাট এবং পারস্য সম্রাটের ধন-সম্পদ মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় বসে বিতরণ করবেন।

তৃতীয়তঃ বিগত সূরার শেষে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে তথা ইসলামের জন্যে হিজরত করার আহবান জানানো হয়েছে। হিজরতের কারণে যে কষ্ট হবে তার উপর সবর অবলম্বনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, আর বর্তমান সূরায় একথা ঘোষণা করা হয়েছে, পৃথিবীতে যত পরিবর্তন হচ্ছে এবং পৃথিবীতে যত ক্ষমতার হাত-বদল হচ্ছে, এসব কিছুই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার।

তফসীরুল কোরআন

এবনে আবি হাতেম এবনে শিহাব জুহরীর সূত্রে এবং এবনে জরীর একরামা ও কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে মুশরেকরা মুসলমানদের সঙ্গে এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতো যে রোমানরা আহলে কেতাব

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-১৭

কিন্তু পৌত্তলিক পারস্যবাসী তাদেরকে পরাজিত করেছে। আর তোমাদের ধারণা হলো তোমাদের নবীর প্রতি আল্লাহ্ পাক কিতাব নাজিল করেছেন আর এই কিতাবের বরকতে তোমরা আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে। যদি তোমাদের এ ধারণা সত্য হতো তবে অগ্নি-পূজকরা আহলে কেতাব রুমীদের উপর কিভাবে বিজয় লাভ করলো? অতএব, যেভাবে পারস্যবাসী রুমীদের উপর বিজয় লাভ করেছে ঠিক তেমনি আমরাও তোমাদের উপর বিজয় লাভ করবো। তখন এ আয়াত সমূহ নাজিল হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ৬শ' খৃষ্টাব্দে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয় তখন রুম এবং পারস্যে দু'টি অত্যন্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৬০২ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দু' শক্তির মধ্যে লাগাতার যুদ্ধ চলছিল। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো রোমানরা আবার কখনো পারস্যবাসী বিজয় লাভ করেছে।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, যেহেতু পারস্যের অধিবাসীরা অগ্নি-পূজক ছিল তাই মক্কার মুশরেকরা তাদেরকে একান্ত আপন মনে করতো। পক্ষান্তরে, যেহেতু রোমানরা আহলে কেতাব ছিল তাই মুসলমানগণ তাদেরকে নিজেদের ঘনিষ্ঠ ভাবতো। যখন যুদ্ধে রোমানরা বিজয়ী হতো তখন স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানগণ এ মর্মেই খুশী হতেন যে আহলে কেতাবদের বিজয় হয়েছে। অপরপক্ষে যখন পারস্যবাসী বিজয় লাভ করতো তখন মক্কার মুশরেকরা অত্যন্ত আনন্দিত হতো। ঘটনাচক্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের পঞ্চম বছরে পারস্যবাসীর হাতে রোমানরা পরাজয় বরণ করে। তাদের পাদ্রী এবং ধর্ম-যাজকদের প্রাণহানি ঘটে। সিরিয়া, মিশর সহ আরও অনেক দেশ রোমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পারস্য রাজার সৈন্যদের অগ্রাভিযানের কারণে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে কনষ্টান্টিনোপলে আশ্রয় নিতে হয়। রোমান সৈন্যরা এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে মনে হয় তারা আর কোন দিন মাথা তুলতে পারবে না। ঐ মুহূর্তে মক্কার কাফেররা মুসলমানদেরকে এ সম্পর্কে পরিহাস করে এবং আপত্তিকর শ্লেষবাক্যে বিদ্ধ করতেও দ্বিধা বোধ করেনা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় আসন্ন বলেও মনে করে। চারদিকের এ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যখন নিরাশা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয় তখনই পবিত্র কোরআনের এ আয়াত সমূহ নিরাশার অমানিশা দূরীভূত করে ঘোষণা করেঃ

الٓمّٓ ○ غُلِبَتِ الرُّومُ ○ فِىٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ○ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ

আলিফ-লাম-মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে সত্য কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তারা বিজয় লাভ করবে, মাত্র নয় বছরের মধ্যে। রোমানরা পারস্যের বিরুদ্ধে শুধু যে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করবে তাই নয়; বরং বর্তমান পরাজয়ের প্রতিশোধও তারা গ্রহণ করবে।

পবিত্র কোরআনের এ সুস্পষ্ট ঘোষণার কারণেই হযরত আবুবকর (রাঃ) মুশরেকদের

সঙ্গে বাজী রেখে বলেছিলেন, 'যদি এ সময়ের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী না হয় তবে আমি একশত উট দান করবো'। যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

তিরমিজী এবং হাকেম এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কার মুশরেকদের একান্ত আকাংক্ষা ছিল যেন পারস্যবাসী রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। আর মুসলমানগণের আকাংক্ষা ছিল যেন রোমানরা বিজয় লাভ করে। এরপর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একশত উটের ঘটনাও উল্লেখ করেছেন।[১]

এদিকে রোমাক সম্রাট মানত করে, যদি পারস্যের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক তাকে বিজয় দান করেন তবে সে পদব্রজে বায়তুল মোকাদ্দাসে হাযির হবে। আল্লাহ পাকের কুদরতের লীলা-খেলা কে বুঝতে পারে? ঠিক নয় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হলো। রোমানদের হাতে পারস্যবাসীকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হলো। এটি ছিল সেদিনের ঘটনা যেদিন হিজরতের ঠিক এক বছর পর বদরের ঐতিহাসিক রণাঙ্গনে মক্কার মুশরেকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে এ ঘটনা ঘটেছে হোদায়বিয়ার চুক্তির দিন (ইতিপূর্বে তার উল্লেখ হয়েছে)। বাজী অনুসারে হযরত আবুবকর (রাঃ) মুশরেকদের নিকট থেকে একশত উট আদায় করেছিলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ-ক্রমে ঐ উটগুলো ছদকা করে দেয়া হয়।

أَدْنَى الْأَرْضِ

অর্থাৎ নিকটবর্তী এলাকায়। এ এলাকাটি সিরিয়ার সীমান্তে মক্কার নিকটে অবস্থিত। আর কেউ কেউ বলেছেন, বসরার নিকটবর্তী এলাকা। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো রুমের নিকটবর্তী প্যালেষ্টাইন এলাকা।

فِي بِضْعِ سِنِينَ

অর্থাৎ কয়েক বছরের মধ্যেই আর তা তিন থেকে নয় বছর পর্যন্ত।

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

অর্থাৎ শুরু এবং শেষ সবই আল্লাহ পাকের হাতে। জয় বা পরাজয় সব কিছুই আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। পূর্বে পারস্যবাসীকে আল্লাহ পাকই বিজয় দান করেছিলেন এবং পরে আল্লাহ পাকই রোমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। যেমন বদরের রণাঙ্গনে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন, কাফের-মুশরেকদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন, সব কিছুই আল্লাহ পাকের মর্জি এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৯৭

মোমেনগণ আনন্দিত হবে

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

আর সেদিন মোমেনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হবে, এটিও পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যা অক্ষরে অক্ষরে যথা সময়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, কেননা একই সময়ে একদিকে রোমানরা বিজয়ী হয়েছে, অন্যদিকে মক্কার মুশরেকদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেছেন, এ সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা, তাঁর মর্জি এবং রহমত।

بِنَصْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যা কিছু হয়েছে সবই এক আল্লাহ পাকের সাহায্যে এবং তাঁর রহমতে হয়েছে।

মুসলমানগণ কাফেরদেরকে যা বলেছিলেন তা সবই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর এ ঘটনা মুসলমানদের ঈমান দৃঢ়তর হওয়ার কারণ হয়েছে। সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এজন্যে খুশী হয়েছেন যে বদরের রণাঙ্গনে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আহলে কেতাবকে এমন লোকদের উপর বিজয় দান করেছেন যারা কিতাবী নয়।

জালালুদ্দীন মহল্লী (রঃ) বলেছেনঃ রুমীদের বিজয় বদরের যুদ্ধের দিনই হয়েছে। আর সেদিনই জিব্রাঈল (আঃ) এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন, এতে মুসলমানগন অত্যন্ত আনন্দিত হন।

يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

"আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করেন। তিনি পরাক্রমশালী, করুণাময়"।

তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে পরাজিত করেন আর যাকে ইচ্ছা বিজয়ীও করেন। প্রথমে পারসিকদেরকে বিজয়ী করা এবং পরে রোমানদের হাতে পারসিকদেরকে পরাজিত করা, এরপর পারসিক এবং রোমক উভয় সাম্রাজ্যকে মুসলমানদের করতলগত করা- সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন।

হযরত জুবাইর কেলাবী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি দেখেছি কিভাবে পারস্যবাসী রোমানদেরকে পরাজিত করেছে। পুনরায় রোমানরা পারসিকদেরকে পরাজিত করেছে। এরপর মুসলমানগণ উভয় জাতিকে পরাজিত করেছে। এসব কিছু মাত্র ১৫ বছরের মধ্যেই হয়েছে, যা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। এসব কিছুর মধ্যেই আল্লাহ পাকের কুদরত ও রহমতের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ

অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন জাতিকে শাস্তি দিতে পারেন। রোমানদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।

الرَّحِيْمُ

অর্থাৎ তিনি পরম করুণাময়। তিনি আপন বন্দাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে থাকেন।

আলোচ্য সূরার শুরুতে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেনঃ

وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ

অর্থাৎ রোমানরা অতি শীঘ্র বিজয় লাভ করবে।

এ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটি ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পবিত্র কোরআনে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী। তাই এর বাস্তবায়নে এতটুকু বিলম্বও হয়নি। বিশ্ববাসী দেখেছে কিভাবে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআনের সত্যতার এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পাশাপাশি আল্লাহ পাক আরেকটি সুসংবাদও দিয়েছেন, তা হলোঃ

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ

"আর সেদিন মোমেনগণ আনন্দিত হবে"।

অর্থাৎ যেদিন রোমানরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করবে সেদিন মুসলমানগণও আনন্দিত হবে। এ সুসংবাদও বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা বদরের ঐতিহাসিক রণাঙ্গনে মুসলমানগণ যখন আল্লাহ পাকের রহমতে বিজয় লাভ করেছিলেন এবং মক্কার জালেম মুশরেকরা পরাজিত হয়েছিল, তখনই রোমানদের পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ের খবর এসেছিল।

এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এটি ছিল তাঁর মোজেযা। যাঁর মোজেযা প্রকাশিত হয় তা তাঁর সত্যতার প্রমাণই বহন করে। আর একথারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে علام الغيوب আল্লাহ পাকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আর আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যেভাবে পরাজিত রোমানদেরকে পারস্যবাসীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন তেমনি দারিদ্র্য-প্রপ্রীড়িত, নিঃস্ব, বিপদগ্রস্ত, দুর্বল মুসলমানদেরকেও মুশরেকদের বিরুদ্ধে একদিন বিজয় দান করবেন। বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ পাক তাঁর এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। আর ঐ দিনই হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রোমানদের বিজয়ের খবর দিয়েছেন। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত করেন, বিজয় দান করেন। কেননা তিনি পরাক্রমশালী। আর এমনিভাবে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে পরাজিত ও অপমানিত করেন। এটি সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার।

যুজাজ (রঃ) বলেন, এ ঘটনা একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই নাজিল হয়েছে। কেননা পবিত্র কোরআন এমনি একটি সংবাদ

দিয়েছে যা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কারো জানা নেই। অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন যে রোমানদের বিজয়ের খবর বদরের যুদ্ধের দিন এসেছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সুফিয়ান সওরী (রঃ) এ মতই পোষণ করেন। তবে কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে এ সুসংবাদ ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার চুক্তির দিন এসেছিল, যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।[১]

জয় পরাজয় আল্লাহ্ পাকের হাতে

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ্ পাক যাকে বিজয়ী করতে চান সে-ই বিজয় লাভ করে। একথাটি শুধু সে যুগের জন্যেই সত্য নয়, বরং সর্বকালের জন্যে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়, তাতে প্রথম তিন বছর হিটলার লাগাতার বিজয় লাভ করতে থাকে, তার অহমিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে শুধু যে সে পরাজিত হয়েছে তাই নয়; বরং আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে সাবেক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানের উপর আক্রমণ করে। নিঃস্ব মুসলমানগণ মুজাহেদ বাহিনী গঠন করে পরাশক্তিটির বিরুদ্ধে জেহাদ আরম্ভ করেন। লক্ষ লক্ষ মোমেন এ জেহাদে শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু তারা যেহেতু আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করেছিলেন, তাই বিজয়-মালা শোভা পায় মুসলমানদের কণ্ঠে। দাম্ভিক আক্রমণকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু যে পরাজিত হয় তাই নয়; বরং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে পলায়নপর হয়। আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের মহিমা কে বুঝবে? ১৯৯১ সালে নাস্তিকদের প্রাণকেন্দ্র সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। মুরতাদ-নাস্তিকরা নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। এটি আলোচ্য আয়াতের ঘোষণার সত্যতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ

"আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করেন"।

অর্থাৎ তিনি কাফেরদের মোকাবেলায় অত্যন্ত পরাক্রমশালী, আর মুসলমানদের জন্যে তিনি অত্যন্ত দয়াবান, অতীব মেহেরবান। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন দুর্বল, নিরস্ত্র, নিঃস্ব মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। বদর, ওহোদ, খন্দকের ন্যায় আরও বহু রণাঙ্গনে এ সত্যেরই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলবী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯১
তফসীরে কুরতবী, খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৩০২
তফসীরে এবনে কাসীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৬

وَعْدَ اللّٰهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُوْنَ ۝٦ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ
الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ
اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ
وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا
فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ
كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا
عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ
اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠

তরজমা

(৬) এটি আল্লাহ পাকেরই প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ পাক কখনও তাঁর প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করেন না। তবে অনেক লোকই তা জানে না।

(৭) তারা পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য দিকটি সম্বন্ধেই অবগত, আর আখেরাত সম্পর্কে তারা খবরই রাখেনা।

(৮) তারা কি নিজের মনে ভেবে দেখেনা যে আল্লাহ পাক নভোমন্ডল এবং ভূমন্ডল ও তার মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবই সঠিকভাবে নির্ধারিত সময়ের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনেক লোকই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।

(৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা? (যদি তারা ভ্রমণ করতো) তবে দেখতো যে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কী হয়েছে! তারা তো এদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তারা জমি চাষ করতো, তারা তা আবাদ করতো এদের চেয়ে অনেক বেশী। তাদের নিকট এসেছিল রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। আল্লাহ পাক কারো প্রতি জুলুম করতে চাননি কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

(১০) এরপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম মন্দই হলো। কেননা তারা

আল্লাহ্ পাকের কথাকে মিথ্যা-জ্ঞান করতো এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করতো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ্ পাকের প্রতিশ্রুতি চির সত্য। কখনও কোথাও এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ হয় না। তাঁর কোন কাজের ইচ্ছা হলে যখন তিনি 'হও' বলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

"আল্লাহ্ পাকের ব্যবস্থাপনা এমনি, যখন তিনি কোন কাজের ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও' তখন তা হয়ে যায়"।

অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা কার্যকর হতে এতটুকু বিলম্ব হয়না। যদি কোন বাধা-বিপত্তি থাকেও তবে তা আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা হওয়ার পর আপনা-আপনিই দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য অনুধাবন করেনা। কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, অধিকাংশ লোক বলতে মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারা পবিত্র কোরআনে ঘোষিত এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বর্ণিত কথা মেনে নিতে রাজী ছিল না। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ও মর্জি যে সর্বত্র কার্যকর এ সত্য তারা উপলব্ধি করতো না। এজন্যেই মওলানা রুমী (রঃ) বলেছেনঃ

جمله قران ست در قطع سبب = عز درویش وهلاك بولهب

"কাফেরদের দৃষ্টি সর্বদা 'কারণ' এবং 'উপকরণে'র প্রতি কিন্তু যিনি কারণ সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক), তাঁর প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই"।

"আল্লাহ্ পাক যখন কোন কারণ-উপকরণ ব্যতীতই আল্লাহ্ ওয়ালাদেরকে সম্মানিত করতে সিদ্ধান্ত করেন এবং আবু লাহাবকে ধ্বংসে পরিণত করতে ইচ্ছা করেন তখন তাই সত্যে রূপান্তরিত হয়"।

এজন্যে পরবর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থার এ বিবরণ স্থান পেয়েছে।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۝

"তারা পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য দিকটি সম্বন্ধেই অবগত; আর আখেরাত সম্পর্কে তারা খবরই রাখে না"।

অর্থাৎ তাদের যাবতীয় বুদ্ধি-বিবেচনা, ধী-শক্তি এবং সর্ব প্রকার চেষ্টা-তদবীর শুধু এ পার্থিব জীবনের উন্নতি-অগ্রগতি অর্জনের মধ্যেই সীমিত। এরপর যে তাদের আরও একটি জীবন আছে তার খবরই তারা রাখেনা। এখানকার সুখ-সামগ্রী বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় তারা

ব্যস্ত। ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-উল্লাস, আরাম-আয়েশের চিন্তায় তারা মগ্ন। আখেরাত সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বে-খবর। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

আর তারা আখেরাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। তারা এ সত্য আদৌ উপলব্ধি করেনা যে এ জীবনই শেষ কথা নয়; বরং এ জীবনের পর আসবে আরেকটি জীবন, এ জীবনের কর্মের ফল পাওয়া যাবে পরজীবনে। এ জীবনের প্রত্যেকটি কর্মের পরিণতি দেখতে পাবে প্রত্যেকেই তার আখেরাতের জীবনে, আর তারা সে জীবন সম্পর্কে কোন প্রস্তুতিই নেয়না, এমনকি কোন চিন্তাও করেনা, তাদের অবস্থা চতুঃস্পদ জন্তুর ন্যায়, এখানকার পানাহারই যাদের জীবনের সব কিছু, এরপর আর কিছুই নেই অথচ মানুষের জীবন দায়িত্বহীন নয়; নির্লিপ্ত নয়, বরং প্রত্যেকের উপরে কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আর এ দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ববান, আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"।

এতদ্ব্যতীত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ

تحشرون كما تموتون وتموتون كما تحيون

"তোমাদের হাশর তেমনই হবে যেমন হবে তোমাদের মৃত্যু, আর তোমাদের মৃত্যু তেমনই হবে যেমন হবে তোমাদের জীবন"।

অতএব, এ জীবনেই পরজীবনের সাফল্য-অসাফল্যের সিদ্ধান্ত হয়। যদি কেউ এ জীবনের মালিক আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলে তবে পরকালে তার সাফল্য সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে জীবন যাপন করে, স্বাভাবিক কারণেই তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

"তারা কি নিজেদের মনে ভেবে দেখে না যে আল্লাহ পাক নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং তার মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবই সঠিকভাবে নির্ধারিত সময়ের জন্যে সৃষ্টি করেছেন"।

পূর্ববর্তী আয়াতে সে সব লোকের উল্লেখ ছিল যারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে বে-খবর থাকে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের উল্লেখ রয়েছে এবং মানব জাতিকে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের প্রতি লক্ষ্য করার এবং তাঁর একত্ববাদে

বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে। কেননা তওহীদে বিশ্বাস করা ব্যতীত আখেরাতের জীবনে সাফল্য লাভের কোন পথ নেই। এজন্যে আলোচ্য আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত এবং মানুষের প্রতি তাঁর অন্তহীন নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, যাতে করে বুদ্ধিমান মাত্রই নিখিল বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টি সমূহ দেখে তার স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনে। কেননা সৃষ্টি মাত্রই স্রষ্টার অস্তিত্বের ও তাঁর অসীম ক্ষমতার জীবন্ত সাক্ষী। এই নীলাভ আকাশ, এই বিশাল-বিস্তৃত জমীন, এই আকাশচুম্বী পাহাড়-পর্বত, এই সবুজ-সুন্দর বৃক্ষ, তরু-লতা, মহা সমুদ্র এবং তার ভয়াল রূপ, রকমারী জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ এসব কিছু কি তাদের স্রষ্টার অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ নয়? মানুষ কেন এসব বিষয়ে চিন্তা করেনা?

দ্বিতীয়তঃ নভোমন্ডল-ভূমন্ডলে যা কিছু আছে এর কোন কিছুকেই আল্লাহ পাক চিরস্থায়ী করে সৃষ্টি করেননি। কেননা এ বিশ্ব চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী। দিন-রাতের পরিবর্তন, শীত-গ্রীষ্মের পরিবর্তন, মানব জীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বৃদ্ধকালের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবর্তন একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে এ পৃথিবীর কোন কিছুই স্থায়ী নয়। এখানে সব কিছু অস্থায়ী, অনিত্য। তাই আলোচ্য আয়াতে واجل مسمى বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এখানকার সব কিছুই একটা নির্দিষ্ট কালের জন্যে হয়ে থাকে। ঐ নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি মাত্রেরই লয় হয়। আর এ লয় কখন হবে তা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না। এ নিয়মে প্রতিটি মানুষকে অবশেষে এই ছায়া-মায়া ঘেরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে, কথা এখানেই শেষ নয়; বরং এ জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। ঈমানের সঙ্গে ভাল কাজ হলে তার পুরস্কার ভোগ করার সুযোগ আসবে। আর যাদের নিকট ঈমানের সম্বল নেই, তাদেরকে চিরদিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এসব কথা অনেক লোকই জানে না, আর অনেকে জেনেও ভুলে থাকে। কর্ম জীবনের ব্যস্ততায় অথবা কাম্য বস্তুর লালসায় যে বিষয়ের প্রতি ঈমান থাকে সে ঈমানও ভুলে থাকে। কর্মের মাধ্যমে ঈমানের প্রমাণ পেশ করতে দেখা যায় না। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ○

"কিন্তু অনেক লোকই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ (অধিকাংশ লোক) কথা দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

بِلِقَائِ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার বিষয়কে তারা অস্বীকার

করে। এজন্যে তারা ঈমানও আনে না এবং নেক আমলও করে না।[১]

মূলতঃ এজন্যেই সুফিয়ায়ে কেরাম আখেরাতের জীবনের ব্যাপারে মোরাকাবা করার তা'লীম দেন। কেননা যখন মানুষ একথা চিন্তা করে যে, অবশেষে এমন একদিন আসবে যখন এ পৃথিবীতে আমি থাকবো না। আমার মৃত্যুর পর আমার আপনজনেরা আমাকে নির্জন কবরে রেখে আসবে। তখন আমার কী অবস্থা হবে? বিশেষতঃ যখন মুনকির নকীর সওয়াল-জওয়াবের জন্যে আসবে তখন আমার কী অবস্থা হবে? হাশরের ময়দানে যখন আমাকে হাযির করা হবে এবং হিসাব-নিকাশের জন্যে যখন আমাকে দাঁড় করানো হবে তখন আমার কী অবস্থা হবে? পুলছেরাত পার হওয়ার সময় আমার কী অবস্থা হবে! যারা সকাল-সন্ধ্যা এসব কথা চিন্তা করে তারা এসব বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তথা আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করে। পক্ষান্তরে, যারা আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করে এবং এর জন্যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা তারা চির বিপদগ্রস্ত হয়।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ....

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? (যদি তারা ভ্রমণ করতো) তবে দেখতো যে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কী হয়েছে, তারা তো এদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তারা জমি চাষ করতো, তা আবাদ করতো এদের চেয়ে অনেক বেশী"।

অর্থাৎ এই কাফেররা, বিশেষতঃ মক্কার কাফেররা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেনা? যদি তারা ভ্রমণ করতো তবে তাদের পূর্বেকার জাতিগুলোর পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। মক্কার কাফেররা ব্যবসায়িক কারণে প্রায়ই সিরিয়া এবং ইয়েমেন যাতায়াত করতো। তারা কি আদ এবং সামুদ জাতির শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করেনি? অথচ মক্কাবাসীর চেয়ে আদ ও সামুদ জাতি অধিকতর শক্তিশালী ছিল এবং তদানীন্তন কালে এ জাতিগুলো উন্নতি-অগ্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তারা কোপগ্রস্ত হয়েছিল। তাদের সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কত আরাম-আয়াশে তারা ছিল, তাদের কত আনন্দ-সামগ্রী ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই রয়নি। সবই অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এ কাফেররা যত উন্নতি করেছে, যত ভোগ-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছে, তাদের চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ-উল্লাস, আরাম-আয়েশ অতীতের জাতিগুলো করেছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হয়েছে কি? না, তা হয়নি। বর্তমান যুগের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ন্যায় পরাশক্তির সবকিছুই ছিল, একদিন তাদের প্রচন্ড দাপটে সারা পৃথিবী কাঁপতো। তাদের পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়ে সকলেই ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত, লৌহ যবনিকার অন্তরালে তারা সবকিছুই করেছিল, নিখিল বিশ্বকে ধ্বংস

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৩৫

করার শক্তি তারা অর্জন করেছিল কিন্তু বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছিল, তাই যথা সময়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তাদের এ পরিণতি বিশ্ববাসীর জন্যে এক শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে রয়েছে। যেভাবে ইতিপূর্বে ধ্বংস হয়েছে আদ ও সামুদ জাতি, ফেরাউন, নমরুদ, শাদ্দাদ, হিটলার, মুসোলিনি সহ আরও অনেকে। তাই পবিত্র কোরআন আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছে, বিশ্ববাসী! তোমরা বিশ্ব পরিভ্রমণ কর। ইতিপূর্বে যে সব লোক পৃথিবীতে ছিল, তারা এখন কোথায়? তা লক্ষ্য কর এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

আর তাদের নিকট এসেছিল রসূলগণ সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ এবং প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ নিয়ে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দূরাত্মা কাফেররা রসূলগণকে মিথ্যা-জ্ঞান করেছে এবং তাদের বিরোধিতা করেছে যার পরিণতিতে তারা ধ্বংস হয়েছে। তাদের এ ধ্বংসের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী, আর কেউ নয়। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

"আল্লাহ পাক কারো প্রতি জুলুম করতে ইচ্ছুক নন, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে"।

বস্তুতঃ কেউ একথা বলতে পারবেনা যে, আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি জুলুম করেছেন, কেননা আল্লাহ পাকের ব্যাপারে জুলুম সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়ে, নবী রসূলগণের বিরোধিতা করে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পূর্বেই নবী রসূলগণের মাধ্যমে সতর্ক করেছেন কিন্তু তবু তারা পথে আসেনি এবং নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমে তারা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوا السُّوْۤاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

"এরপর যারা মন্দ কাজ করেছিল, তাদের পরিণাম মন্দই হলো, কেননা তারা আল্লাহ পাকের কথাকে মিথ্যা-জ্ঞান করতো এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করতো"।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যুগে যুগে কেন কোপগ্রস্ত হয়েছে, তার দু'টি কারণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(এক) তারা আল্লাহ পাকের বিধান সমূহকে মিথ্যা-জ্ঞান করেছে এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছে।

(দুই) শুধু যে তারা আল্লাহর বিধানকে মিথ্যা-জ্ঞান করেছে তাই নয়; বরং এর প্রতি বিদ্রুপ করেছে।

মূলতঃ এ কারণেই তাদের প্রতি শাস্তি আরোপিত হয়েছে। কেননা যারা আল্লাহ পাকের কথাকে মিথ্যা-জ্ঞান করে, আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে, এমনকি উপহাস করে এবং আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণকে অমান্য করে, তাদের পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ হবে তা সহজেই অনুমেয়, আর তাই হয়েছে। দুনিয়ার জীবনের এ শাস্তি বা আযাবই যথেষ্ট নয়; বরং তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে কঠিন কঠোর শাস্তি। যে সব কারণে পূর্বকালের জাতিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়েছে, পরবর্তী কালেও যদি কোন জাতির মধ্যে সে সব অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করা যায় তবে তাদের শাস্তিও নিঃসন্দেহে অনিবার্য হয়ে পড়বে।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَيَوْمَ
تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ
مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿۱۳﴾
وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿۱۴﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿۱۵﴾

তরজমা

(১১) আল্লাহ পাকই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন, আবার তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

(১২) আর সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে।

(১৩) আর তাদের শরীকরা (দেব-দেবীরা) কেউ সুপারিশ করতে আসবে না, এতদ্ব্যতীত তারা তাদের শরীকদেরকে অস্বীকার করে বসবে।

(১৪) আর সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে। সেদিন লোকেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে।

(১৫) ফলে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা জান্নাতের বাগানে আনন্দিত হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা-জ্ঞান করে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে আখেরাতের প্রতি ইঙ্গিত ছিল এ মর্মে যে প্রত্যেককে অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ

"আল্লাহ পাকই প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন"।

আর যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন নয়।

এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

"অতঃপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন, আবার তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে"।

মূলতঃ এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তাদের উদ্দেশে যারা আখেরাত সম্পর্কে গাফেল, যারা পার্থিব জীবনকেই সব কিছু মনে করে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা, তাদেরকে এ আয়াতে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে এ সত্য ভুলে যেয়ো না যে আল্লাহ্ পাকই তোমাদেরকে সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন। তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা কর কিভাবে তোমরা অস্তিত্ব লাভ করেছ? কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? কে তোমাদেরকে জীবনের যথা সর্বস্ব দান করেছেন? মনে রেখো আল্লাহ্ পাকই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু-মুখে পতিত করবেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং কেয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে হাযির করবেন। তখন তোমরা তোমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবে। তোমাদের প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে। একথাটিকে আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○

"এই মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো, আর এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনবো"।

আর অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○ (সূরা বাকারা)

"আর ভয় কর সেদিনকে যেদিন তোমরা ফিরে আসবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে, এরপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা পূরোপুরি দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবেনা"।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ○

"আর সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে। সেদিন অপরাধীরা নিরাশ হয়ে পড়বে"।

কেননা তারা দেখতে পাবে যে তাদের জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড ছিল অমার্জনীয় অপরাধ।

আর এ অপরাধীরা সেদিন নিরাশ হয়ে পড়বে এ কারণে যে তাদের অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে পড়বে। অস্বীকার করার কোন উপায় থাকবে না। তাদের পক্ষে পেশ করবার মত কোন বক্তব্যও থাকবে না। আর যাদেরকে তারা আল্লাহ পাকের সাথে শরীক মনে করে পূজা-অর্চনা করেছিল এ আশায় যে তারা সাহায্যকারী হবে, সেদিন তারাও যে কোন কাজে আসবে না সেকথা ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعٰؤُا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كٰفِرِيْنَ ○

"কেয়ামতের দিন কাফেরদের কোন দেব-দেবী কাজে আসবে না, তারা কোন প্রকার সুপারিশ করবে না। এতদ্ব্যতীত তারা তাদের শরীকদেরকে অস্বীকার করে বসবে"।

এমনকি কাফেররাও শপথ করে বলবে যে আমরা শেরক করিনি।

আলোচ্য আয়াতের يُبْلِسُ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো নিরাশ হওয়া অর্থাৎ কাফেররা কেয়ামতের দিন সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়বে।

আর এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এর অর্থ হলো অপমানিত হওয়া অর্থাৎ কাফেররা সেদিন চরমভাবে অপমানিত হবে। আর ঐ অবস্থায় তারা তাদের উপাস্যদেরকে অস্বীকার করবে।[১]

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তারা বলবে, এই দেব-দেবীদের কারণেই তারা কাফের হয়েছিল।[২]

দুনিয়াতে ভাল-মন্দ, নেককার-বদকার একই সঙ্গে বাস করে কিন্তু কেয়ামতের দিন এ

১। তফসীরে আদদুররুল মনছুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৬৬
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২০৬

অবস্থার পরিবর্তন হবে, নেককার-বদকার একই সঙ্গে থাকবেনা।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ○

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হবে, “হে পাপীষ্ঠরা! তোমরা (নেককার বন্দাদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও”।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, হিসাব-নিকাশের পর মানুষ পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। ঈমানদার ও নেককারগণ জান্নাতের মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কাফেরদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, এরপর আর কখনও এ দু' দল একত্রিত হবেনা। পরবর্তী আয়াতে এর বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছেঃ

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ○

“অতঃপর যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তারা জান্নাতের উদ্যানে আনন্দিত হবে”।

فِي رَوْضَةٍ

অর্থাৎ জান্নাতের উদ্যান; যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত এবং যা ফুলে ফলে পল্লবিত, সেখানে নেককারগণ আনন্দিত হবে।

يُحْبَرُونَ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো জান্নাতে নেককারগণ সাদর সম্বর্ধনা লাভ করবে তথা তারা মহা সম্মানে ভূষিত হবে।

এ শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা সেখানে আনন্দিত হবে।

আবু ওবায়দা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা অত্যন্ত খুশী হবে।

একখানি হাদীসে রয়েছেঃ হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেছেন, যদি আমি জানতাম যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার কেরাআত শ্রবণ করছেন তবে আমি تحبير করতাম। অর্থাৎ আরও মধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতাম।

আওযায়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর কণ্ঠ অত্যন্ত মধুর। যখন তিনি তাঁর কণ্ঠে কোন কিছু আবৃত্তি করেন তখন তাঁর মধুর কণ্ঠের কারণে জান্নাতের বৃক্ষ মাত্রই সবুজ হয়ে যায়। ইমাম আওযায়ী (রঃ) একথাও বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে ইস্রাফীলের চেয়ে মধুর-কণ্ঠী আর কোন কিছু নেই। যখন তিনি কোন কিছু পাঠ করতে শুরু করেন তখন সাত আসমানের অধিবাসীদের নামাজ এবং তসবীহ বন্ধ হয়ে যায়।

কোন কোন হাদীসে রয়েছে, হুরগণ তাদের স্বামীদের সম্মুখে এমন মধুর কণ্ঠে গাইবে, যার ন্যায় কোন গান কখনও কেউ শ্রবণ করেনি, তাদের গানের কথাগুলো এই প্রকার হবে- "আমরা সকলের চেয়ে উচ্চ মর্তবা সম্পন্ন, আমরা সম্মানিত ব্যক্তিদের স্ত্রী, আমরা সর্বদা এখানে থাকবো, কখনও আমাদের মৃত্যু হবেনা, আমরা নিরাপদ থাকবো, আমাদের কোন বিষয়েই ভয় হবেনা, আমরা সর্বদা এখানে থাকবো, এখান থেকে কোথাও যাবনা"। তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে এর বর্ণনা দিয়েছেন।[১]

তেবরানী এবং বায়হাকী হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে বন্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে তার পায়ের কাছে এবং মাথার কাছে দু'জন করে হুর বসবে এবং তারা এমন মধুর কণ্ঠে গাইতে থাকবে যা কোন মানুষ বা জ্বীন কখনও শ্রবণ করেনি; তবে তা শয়তানী গান হবে না; বরং তা আল্লাহ পাকের হাম্‌দ এবং পবিত্রতার বর্ণনা হবে।

ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর "আয্ জোহদ" গ্রন্থে হযরত মালেক এবনে দীনার (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে বলবেন, অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে আমার প্রশংসা বর্ণনা কর। দাউদ (আঃ) এমন সুমিষ্ট কণ্ঠে সে কথাগুলো গাইবেন, যা জান্নাতের সমস্ত নেয়ামতের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

ইযবিহানী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক বেহেশতের বৃক্ষকে আদেশ দেবেন, আমার সে বন্দাদেরকে গান শোনাও, যারা আমার স্মরণের কারণে দুনিয়ার গান-বাজনাকে বর্জন করেছে, ঐ বৃক্ষ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা এমন সুমিষ্ট কণ্ঠে বর্ণনা করবে, যা কোন সৃষ্টি ইতিপূর্বে শ্রবণ করেনি।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) গান শুনেছে তাকে রুহানিয়াতের আওয়াজ শুনবার অনুমতি দেয়া হবেনা, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! রুহানিয়াত কি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, জান্নাতবাসীদের সম্মুখে পাঠকারীগণ।

মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেন, যারা নিজেদের আওয়াজকে এবং কর্ণকুহরকে গান-বাজনা থেকে পবিত্র রাখে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদেরকে কস্তুরির বাগানে অবস্থানের তওফিক দান করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেবেন, আমার বন্দাদেরকে আমার প্রশংসা শোনাও এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে ভবিষ্যতে আর কখনও তারা ভীত ও চিন্তিত হবেনা।

দায়লামী হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সূত্রেও এ বর্ণনা দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের يحبرون শব্দটি দ্বারা জান্নাতের অন্তহীন নেয়ামত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২০৭
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২০৭-২০৮

ইয়াহইয়া এবনে আবি কাসীর বর্ণনা করেন, এর দ্বারা জান্নাতে আল্লাহ পাকের তসবীহ-তাহলীল এবং হাম্‌দ শ্রবণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা শ্রবণ করে জান্নাতবাসীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেবেন, জান্নাতবাসীকে আমার প্রশংসা এবং পবিত্রতার গীত শ্রবণ করাও। তখন ফেরেশতাগণ এত মধুর কণ্ঠে আল্লাহ পাকের হাম্‌দ বর্ণনা করবে যে ইতিপূর্বে কেউ তা শ্রবণ করেনি। আর ফেরেশতাদেরকে এ হুকুমও দেয়া হবে যে আমার প্রশংসার গীত তাদেরকে শ্রবণ করাও, যারা দুনিয়াতে শয়তানী গান-বাজনা থেকে নিজেকে হেফাজত করেছে।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের روضة শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি হলো বেহেশতের একটি অতি সুন্দর বাগান, আর কেউ কেউ বলেছেন, এটি হলো বেহেশতের এমনি একটি স্থান যেখানে রয়েছে সবুজের মেলা। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এটি হলো বেহেশতের একটি উদ্যান, যার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তাতে নহর প্রবাহিত রয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ নেককার ঈমানদারগণ জান্নাতে সর্ব প্রকার আনন্দ-সামগ্রী লাভ করবেন, তারা সেখানে পরম সুখে কাল যাপন করবেন।

আলোচ্য আয়াতে ঈমানদার ও নেককারদের শুভ-পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াতে কাফেরদের শোচনীয় পরিণতির কথা ঘোষিত হয়েছে। নেককার মোমেনদের কথা কাফেরদের অবস্থার পূর্বে বর্ণনার কারণ হলো, কাফেরদের শাস্তি শুরু হওয়ার পূর্বেই মোমেনগণ জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করবেন, যাতে করে দূরাত্মা পাপীষ্ঠরা দেখতে পায় মোমেনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। যদি মোমেনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পূর্বে কাফেরদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হতো তবে তারা এ ভুল ধারণা করতো যে হয়তো সকলেই এমন আযাব ভোগ করছে। কিন্তু যেহেতু কাফেররা মোমেনগণের সুখ-সামগ্রী দেখতে পাবে, তাই তাদের আক্ষেপ শত গুণ বৃদ্ধি পাবে।[২]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো জান্নাতবাসীগণকে সর্বপ্রকার নেয়ামত দেয়া হবে এবং সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করা হবে।[৩]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে আল্লাহ পাকের হামদের গীত শ্রবণ করবেন, যা তাদের জন্যে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হবে। এর কারণ হলো, গান তখনই উপভোগ্য হয় যখন তার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকেঃ

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠ--১৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯৮
তফসীরে কুরতবী, খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১২
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা ১০২
৩। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৩৯

(এক) গানের কথায় প্রিয়তমের উল্লেখ থাকে,

(দুই) কথাগুলো ভাষার অলংকারে সমৃদ্ধ থাকে এবং তাতে ভাবের বৈশিষ্ট্য থাকে অক্ষুন্ন,

(তিন) আর ঐ কথাগুলো মধুর কণ্ঠে গাওয়া হয়।

যেহেতু জান্নাতবাসীগণের নিকট আল্লাহ পাকই সর্বাধিক প্রিয় এবং তাঁর সৌন্দর্য অদ্বিতীয় এবং মোমেনগণ জান্নাতে তাঁর দীদার লাভ করে ধন্য হবেন, আর তাঁর প্রশংসা বা হাম্‌দ সম্বলিত গীত শ্রুত হবে তাই জান্নাতবাসীগণের নিকট তা অত্যন্ত বেশী উপভোগ্য হবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ
تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

তরজমা

(১৬) আর যারা কাফের হয়েছে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা-জ্ঞান করেছে ও আখেরাতের মোলাকাতেও অবিশ্বাস করেছে, তারাই আযাবে ধৃত হয়ে আসবে।

(১৭) অতএব, তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর।

(১৮) আর আল্লাহ পাকেরই প্রশংসা আসমানে জমীনে, শেষ বেলায় এবং দুপুরে।

(১৯) আর আল্লাহ পাক বের করেন মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে এবং তিনিই জমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করেন। আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনগণের শুভ-পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কাফের-মুশরেকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে, যখনই মোমেনগণের জন্যে

জান্নাতের কথা বলা হয় তখনই এর পাশাপাশি কাফেরদের শাস্তি তথা দোযখের কথা ঘোষণা করা হয়।

মূলতঃ যারা সারা জীবন আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও আল্লাহ পাকের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয় এবং আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যা-জ্ঞান করে, শুধু তাই নয়; বরং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে, একথাও তারা অবিশ্বাস করে, এসব লোকই আল্লাহ্ পাকের আযাবে গ্রেফতার হয়ে আসবে।

আলোচ্য আয়াতের مُحْضَرُونَ শব্দটির অর্থ হলো, তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাবে তথা দোযখে প্রবেশ করানো হবে, অথবা আযাব থেকে তারা অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত লাভের জন্যে ঈমান ও নেক আমল যেমন পূর্বশর্ত, ঠিক তেমনি কুফর ও নাফরমানী এবং আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যা-জ্ঞান করার ভিত্তিতেই দোযখের সিদ্ধান্ত হবে।[১]

দ্বিতীয়তঃ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ অর্থাৎ তারা আযাবে সর্বদা ধৃত থাকবে, একথার তাৎপর্য হলো, কখনও আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে কাফেররা রেহাই পাবেনা; বরং তারা চিরদিন আযাব ভোগ করতে থাকবে, তাদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। আল্লামা আলুসী (রঃ) আলোচ্য বাক্যাংশের এ ব্যাখ্যা করার পর লিখেছেনঃ যারা মোমেন হওয়া সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তারা পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষিত মোমেনগণের অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা উক্ত আয়াতে ঈমানের পাশাপাশি নেক আমলের কথাও রয়েছে। যারা ঈমানদার এবং নেককার তারাই জান্নাতের অধিবাসী হবে।

পক্ষান্তরে, যারা ঈমানদার নয় এবং আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যা-জ্ঞান করে, তারা হবে দোযখবাসী। পাপাচারী মুসলমানগণ তাদেরও অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের সম্পর্কে অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে।

فَسُبْحَٰنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ○

"অতএব, তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর"।

পূর্ববর্তী দু'খানি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে দোযখের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব, দোযখের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করা এবং বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভের চেষ্টা করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। আর এ কর্তব্য পালনের পন্থাই বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَسُبْحَٰنَ اللَّهِ

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮১৭

অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো সকাল-সন্ধ্যায় মহান আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ্ পাঠ করা, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা। যেহেতু আল্লাহ্ পাকই সমগ্র বিশ্ব-জগতকে সৃষ্টি করেছেন, আর যেহেতু অবশেষে মানুষকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে তাঁরই দরবারে, তাই মানুষের কর্তব্য হলো মহান আল্লাহ্ পাকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করা। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে তাসবীহ্ দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ রাতের শেষে অতি প্রত্যুষে ফজরের নামাজ আদায় কর। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহ্মতে রাত শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে, এখন দিনের প্রারম্ভে উপজীবিকা অর্জনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করা এবং আয়-রোজগারের বরকতের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজী পেশ করা, এমনিভাবে দিনের শেষে মাগরিবের নামাজ আদায় করা এবং দিন শান্তিপূর্ণ ভাবে অতিবাহিত হয়েছে এজন্যে আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করা। যেহেতু চান্দ্র মাসের হিসেবে রাত আগে আসে, এজন্যে আগে সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে, পরে সকালের কথা বলা হয়েছে।

وَلَهُ الْحَمْدُ

আর এক আল্লাহ্ পাকের জন্যেই হলো হাম্‌দ আসমানে জমিনে শেষ বেলায় এবং দুপুরে।

অর্থাৎ পূর্বে ফজর ও মাগরিবের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে আছর, এশা ও জোহরের কথা বলা হয়েছে। এ সময়গুলোতে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত নাজিল হয়। তাই বন্দা মাত্রেরই কর্তব্য হলো এ সময় আল্লাহ্ পাকের জিকরে মশগুল থাকা। বন্দার কাজই হলো বন্দেগী করা, সকাল-সন্ধ্যায়, দিনে-রাতে, দুপুরে-বিকেলে। এক কথায় সর্বদা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের স্মরণে মুগ্ধ মত্ত থাকাই বন্দার কর্তব্য এবং বন্দার চোখে-মুখে-অন্তরে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থাকা উচিৎ। এজন্যে মরমী কবি বলেছেনঃ

ایک چشم زدن غافل ازان شاه نباشی باشد که نگاهے کند آگاه نباشی

"চোখের একটি পলকের সমান সময়ও আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল হয়োনা, হয়তো তিনি তোমার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন, আর তুমি তার খবরও পাবেনা"।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সমগ্র বিশ্ব জগতের সকল সৃষ্টি আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ বা প্রশংসায় সর্বক্ষণ মশগুল রয়েছে এবং তাঁরই এবাদত করছে। যেহেতু দিনের শেষ বা সন্ধ্যা কাল ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত হওয়ার সময়, তাই ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে তাই আসরের নামাজ তখন রাখা হয়েছে। দ্বিপ্রহরে যখন সূর্যের তাপ বৃদ্ধি হয়, আর তা দোযখের অগ্নির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এজন্যে তখন জোহরের নামাজের নির্দেশ রয়েছে। দিনের শেষে রাতের শুরুতে পৃথিবীতে যে পরিবর্তন আসে সে সময় মাগরিবের নামাজের নির্দেশ রয়েছে। এমনিভাবে রাতের শেষে দিনের শুরুতে ফজরের নামাজের নির্দেশ রয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, تمسون শব্দ দ্বারা মাগরিব এবং এশা উভয় নামাজের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেহেতু এ সময়গুলোতে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত প্রকাশিত হয়, তাই এ সময়গুলোকে নামাজের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে।

এবনে জরীর, তেবরানী এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াতে পাঁচটি নামাজেরই উল্লেখ রয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, নাফে এবনে আযরাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নামাজের পাঁচটি ওয়াক্তের কথা পবিত্র কোরআনে আছে কি? তখন তিনি আলোচ্য দু'খানি আয়াত পাঠ করেন এবং বলেন, এ দু'খানি আয়াতেই নামাজের পাঁচ ওয়াক্তের বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি سبحن الله থেকে كذلك تخرجون পর্যন্ত সকালে পাঠ করবে, তবে ঐদিন তার দ্বারা যদি কোন গুনাহ হয় তবে এ আয়াত পাঠ করার কারণে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে, এমনিভাবে এ আয়াত দু'খানি যে সন্ধ্যাবেলা পাঠ করবে, রাত্রিকালে তার দ্বারা যদি কোন গুনাহ হয় তবে তা দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাত দিনে একশত বার সোবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহী পাঠ করবে তার গুনাহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গের সমান হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার সোবহানাল্লাহে ওয়াবেহামদিহী পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন তার চেয়ে অধিক আমল নিয়ে আর কেউ আসবে না, তবে যে এই আমল নিয়ে আসবে বা তার চেয়ে বেশী পাঠ করবে। এই হাদীসও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-ই বর্ণনা করেছেন।

বোখারী শরীফে সংকলিত সর্বশেষ হাদীস, যা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দু'টি এমন বাক্য যা রসনায় উচ্চারণ করা অত্যন্ত হালকা কিন্তু কেয়ামতের দিন তার ওজন হবে অত্যন্ত ভারী। আর আল্লাহ পাকের দরবারে দু'টি বাক্যই অত্যন্ত প্রিয়। বাক্য দু'টি হলো সোবহানাল্লাহে ওয়াবেহামদিহী, সোবহানাল্লাহিল আজীম।

হযরত জোয়াইরিয়া বিনতুল হারেস যাঁর নাম বাররাহ তিনি মসজিদে ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন সকালে মসজিদ থেকে বের হলেন, দিনের একটা বিরাট অংশ তিনি মসজিদের বাইরে ছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন, হযরত জোয়াইরিয়া স্বস্থানেই রয়েছেন। তিনি এরশাদ করলেন, এখনও তুমি এখানেই রয়েছ? হযরত জোয়াইরিয়া বললেন, জ্বী-হ্যাঁ। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি তোমার নিকট থেকে বের হওয়ার পর চারটি বাক্য তিনবার পাঠ

করেছি, যদি তোমার ওজীফার সাথে এর মোকাবেলা করা যায় তবে ঐ চারটি বাক্যের সওয়াব অধিকতর হবে। সে চারটি বাক্য হলো,

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

(মুসলিম শরীফ)

হযরত সামুরা এবনে জুন্দব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সবচেয়ে মূল্যবান চারটি বাক্য রয়েছেঃ

سبحان الله والحمد لله لا الهٰ الا الله الله اكبر

আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটিঃ

سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر

(মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন্ কথাটি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী? তখন তিনি এরশাদ করেছেন, সে বাক্য যা আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জন্যে পছন্দ করেছেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যা পাঠ করে তা হলোঃ

سبحان الله وبحمده

(মুসলিম শরীফ)

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি سبحان الله العظيم وبحمده বললো তার জন্যে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হলো।[১]

এবনে মরদবিয়া, বায়হাকী হযরত মাআজ এবনে আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এই সংবাদ দেবনা যে কেন আল্লাহ পাক ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর বন্ধু ঘোষণা করেছেন? তিনি আলোচ্য আয়াত তথা সকাল ও সন্ধ্যায় এ দোয়া পাঠ করতেন,

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সোবহানাল্লাহে ওয়াবেহামদিহী এক হাজার বার পাঠ করে, সে যেন আল্লাহ পাকের নিকট থেকে নিজেকে ক্রয় করে নেয়

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২০৮-২১০

এবং তার জীবনের শেষ দিন সে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক চারটি বাক্য নির্বাচন করেছেনঃ তা হলো সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর।

যে ব্যক্তি সোবহানাল্লাহ পাঠ করে, তার জন্যে ২০টি নেকী লিপিবদ্ধ হয় এবং তার ২০টি গুনাহ দূরীভূত হয়। আর যে বললো আল্লাহু আকবর সেও অনুরূপ নেকী লাভ করে, এমনিভাবে যে বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে-ও অনুরূপ নেকী লাভ করে। আর যে বলে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, সে ত্রিশটি নেকী লাভ করে এবং তার ত্রিশটি গুনাহ দূরীভূত হয়।[১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'টি মত প্রকাশ করা হয়েছে।

(এক) এ আয়াতে সাধারণভাবে আল্লাহ্ পাকের নামের তছবীহ পাঠ করার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। বিশেষতঃ আয়াতে উল্লেখিত সময়ে আল্লাহ্ পাকের নামের তসবিহ পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। ইমাম রাজী (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। কেননা এর পূর্ববর্তী আয়াতে জান্নাতের নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। আর জান্নাতের নেয়ামত লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো তসবীহ-তাহলীল।

আল্লামা আলুসীও (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।[২]

(দুই) এ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ মত পোষণ করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)

অবশ্য দ্বিতীয় মত প্রথম মতের বিরোধী নয়, কেননা নামাজ আরম্ভ করা হয় তসবীহ তাহমীদের মধ্য দিয়ে তথা সুবহানাকা আল্লাহুম্মা পাঠ করে। আর সাধারণ তসবীহের মধ্যে নামাজের তসবীহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[৩]

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

আর আল্লাহ্ পাক বের করেন মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে। যেমন ডিম্ব থেকে মুরগী, আর মুরগী থেকে ডিম্ব বের করা। এমনিভাবে শুক্রবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি করা এবং মানুষ থেকে শুক্রবিন্দু সৃষ্টি করা। এসবই আল্লাহ্ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা।

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

গ্রীষ্মের তাপে ধরণী শুষ্ক এবং মৃত হওয়ার পর বারি বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকই

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৬৭-৬৮
২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২০
৩। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড -৫, পৃষ্ঠা-৪০০

তাকে পুনর্জীবন দান করেন। শুষ্ক জমিন আর শুষ্ক থাকেনা, বরং তাতে দেখা যায় সবুজের মেলা।

وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে। অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ পাক মৃত জমিনকে পুনর্জীবন দান করেন, ঠিক তেমনি তোমাদেরকেও তিনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করবেন, কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য হাযির করবেন। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

সৃষ্টির বুকে কেয়ামতের প্রমাণ

وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

"আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে"।

অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ পাক জীবিত থেকে মৃতকে এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন ঠিক তেমনি মানুষ যখন মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে যায়, এরপর কেয়ামতের দিন তিনি মানুষকে পুনর্জীবন দান করে কেয়ামতের ময়দানে পুনরুত্থান করবেন। মানুষ সারা রাত নিদ্রায় বিভোর থাকার পর ভোরে যেমন পুনর্জীবন লাভ করে। এজন্যে হাদীস শরীফে রয়েছেঃ

النوم اخ الموت

অর্থাৎ নিদ্রা হলো মৃত্যুর ভাই।

অতএব এশার নামাজের পর মানুষ যখন নিদ্রিত হয়, সে যেন কিছুক্ষণের জন্যে সাময়িকভাবে হলেও জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে চলে যায়. আর সকালে যখন জাগ্রত হয়ে জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সে যেন মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করে। ঠিক এভাবেই এ জীবনের পর মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাকে সমাধিস্থ করা হয়, এরপর কেয়ামতের দিন তাকে পুনর্জীবন দান করে হাশরের ময়দানে পুনরুত্থিত করা হবে এবং জীবন-সাধনার যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব তাকে দিতে হবে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে এ জীবন যেমন সত্য, এমনিভাবে মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে জীবনের অবসান হওয়া যেমন সত্য, ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিন পুনর্জীবনও সত্য এবং নিতান্ত স্বাভাবিক।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ
تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ (২০) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ
لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (২১)
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ
وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ (২২) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ
مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ (২৩) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ
خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (২৪)

তরজমা

(২০) আর আল্লাহ্ পাকের অন্যতম নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এরপর (হঠাৎ) তোমরা মানুষ হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ।

(২১) আর আল্লাহ্ পাকের অন্যতম নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জীবন-সঙ্গিনীদেরকে যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ কর। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন ভালবাসা ও দয়া। নিশ্চয় এতে রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে বহু নিদর্শন।

(২২) আর আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি হলো, আসমান ও জমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যে অনেক নিদর্শন।

(২৩) আর আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহের অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা শ্রবণ করে।

(২৪) আর এটিও আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন যে তিনি ভয় এবং আশা স্বরূপ

তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করে থাকেন এবং তিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন; তা দ্বারা তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা বোধশক্তি-সম্পন্ন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আখেরাতের উল্লেখ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে অবশেষে তোমরা সকলেই কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে পুনরুত্থিত হবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কাফের-মুশরেকরা প্রথমতঃ আখেরাতে বিশ্বাসই করতো না। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাসের অভাবে পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান যে সম্ভব এ সত্য তারা অনুধাবনও করতো না। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম বিষ্ময়কর কুদরত হেকমতের বিবরণ স্থান পেয়েছে, যা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[১]

এ পর্যায়ে ছয়টি দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ○

"আর আল্লাহ পাকের অন্যতম নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এরপর (হঠাৎ) তোমরা মানুষ হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ"।

মানব-সৃষ্টির ইতিকথা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষকে তার নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের যে কুদরত রয়েছে তা লক্ষ্য করবার জন্যে আহবান করেছেন। হে আত্ম-বিস্মৃত মানব জাতি! তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কেননা আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর তিনি তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলেন। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَفِىٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○ (সূরা যারিয়াত)

"এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে। তোমরা কেন তা দেখছো না"।

বস্তুতঃ সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার জীবন্ত নিদর্শন। অতএব, মানুষ মাত্রেরই ভেবে দেখা উচিত যে আমি কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছি; কিভাবে আজ পৃথিবীতে আমি মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। বিশ্ব-গ্রন্থ পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে অজানার অন্ধকার থেকে

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৭৯৫

জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে এসেছে এবং মানব সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ঘোষণা করেছেঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ (সূরা নহল)

"আর আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃ-গর্ভ থেকে বের করে আনেন, এমন অবস্থায় যে তখন তোমরা কিছুই জানতে না, এরপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে শ্রবণের জন্যে কর্ণ, দর্শনের জন্যে চক্ষু এবং উপলব্ধি করার জন্যে অন্তর দান করেছেন, হয়তো তোমরা তাঁর সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে"।

বস্তুতঃ এভাবেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের কৃপা ও দয়ায় শূণ্যের আঁধার থেকে অস্তিত্ব ও বাস্তবতার আলোর জগতে আগমন করে।

পবিত্র কোরআনে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ের বিবরণও স্থান পেয়েছে এবং মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার প্রতি শোকর গুজার হওয়ার আহবান জানিয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○ (সূরা মূলক)

"(হে রসূল!) ঘোষণা করুন, (নিখিল বিশ্বের যিনি স্রষ্টা) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে শ্রবণের জন্যে কর্ণ, দর্শনের জন্যে চক্ষু এবং উপলব্ধি করার জন্যে অন্তর দান করেছেন। তোমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ"।

এ দু' আয়াতে মানুষকে পরোক্ষভাবে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করার এবং তাঁর দান উপলব্ধি করার আহবান রয়েছে। আর কোথাও কোথাও আল্লাহ্ পাক সরাসরি মানুষকে তাঁর বিশেষ বিশেষ দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ○ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ○ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ○

(সূরা বালাদ)

"আমি কি মানুষের চক্ষুদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয় ও জিহ্বা সৃষ্টি করিনি? আর আমি কি তাকে ভাল ও মন্দ ডান ও বাম উভয় পথের পরিচয় দান করিনি"?

এভাবে মানুষ যদি আত্ম-বিশ্লেষণ করে এবং আত্ম-পরিচয় লাভ করে তবে তার নিকট এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে মানব জীবনের অস্তিত্ব, তার শৈশব,

কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্যের বিভিন্ন অবস্থা এবং মানুষের জ্ঞান, ধী-শক্তি এবং অভিজ্ঞতা এক কথায় সব কিছুই এক আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মানুষের প্রধানতম কর্তব্য

অতএব মানুষের প্রধানতম কর্তব্য হলো তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করা এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকা। আর যেহেতু মানুষের এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, এরপর যিনি দুনিয়াতে তার অস্তিত্ব থেকে শুরু করে সব কিছু দান করেছেন সেই মহান দাতার দরবারে পরকালীন জীবনে, হাশরের ময়দানে হাযির হতে হবে, তাই পরকালীন জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। মানুষ আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা যত বেশী উপলব্ধি করবে তত বেশী সে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। আর যত বেশী সে কৃতজ্ঞ হবে তত বেশী সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবে। আর এ পর্যায়ে যত বেশী উন্নতি হবে আখেরাতের সম্বল তত বেশী সংগৃহীত হবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

"আর আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি হলো এই, তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই তিনি তোমাদের জীবন-সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন"।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ আক্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক তাদের পরস্পরের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, অথচ অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, বিবাহের পূর্বে তাদের মধ্যে কোন পরিচয়ও থাকেনা, আল্লাহ পাকই তাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতি-বন্ধন সৃষ্টি করে দেন, আর দাম্পত্য জীবনের সাফল্যের জন্যে এ প্রীতি-ভালবাসা ও সহমর্মিতা একান্ত আবশ্যক।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○

"নিশ্চয় যারা চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের জন্যে এতে রয়েছে বহু নিদর্শন"।

অর্থাৎ মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার মধ্যে এবং তারই স্বগোত্র থেকে জীবন-সঙ্গিনী সৃষ্টি করার মধ্যে ও তাদের পরস্পরের প্রীতি-ভালবাসা সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের বহু নিদর্শন। অবশ্য এ নিদর্শন তারাই দেখতে পায় যারা এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। যারা চিন্তাশীল মানুষ তারা বিষয়টিকে এভাবেও চিন্তা করে যে, দু'জন অপরিচিত মানুষকে আল্লাহ পাকের নামে একত্রিত করা হয় এবং তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়, আর তাদেরকে দিয়েই গড়ে ওঠে একটি পরিবার, যা হয় মানব সভ্যতার প্রথম স্তর, যেভাবে দুনিয়াতে আল্লাহ পাক বিচ্ছিন্ন মানুষকে এক, অভিন্ন এবং একাত্ম করে দেন, ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিনও মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলোকে পুনর্জীবন দান করবেন,

আর হাশরের ময়দানে তাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াতের من انفسكم শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক তোমাদের স্ত্রীদেরকে তোমাদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন। কেননা হযরত হাওয়া (আঃ)-কে আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-এর বাঁ পাঁজর থেকে সৃষ্টি করেছেন।

দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি

مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ পাক প্রীতি-ভালবাসা এবং দয়া সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে দাম্পত্য জীবন সফল হয়, পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করা যায়, মানবতার উন্মেষ ঘটে, সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রতিটি মানুষ তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যদি মানুষের স্ত্রী তার স্বগোত্রীয় না হতো তবে বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে যে প্রীতি ও ভালবাসা হয়ে থাকে তা কখনও হতো না। স্বামী ভালবাসার কারণে স্ত্রীর সুখ-দুঃখে তার সাথে একাত্ম হয় অথবা স্ত্রীর প্রতি দয়ার কারণে তার প্রতি লক্ষ্য রাখে। কেননা এই স্ত্রীর মাধ্যমেই তার সন্তান-সন্ততি হয়েছে। সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন তাদের পিতা-মাতার পরস্পরের প্রীতি ও ভালবাসার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। আল্লাহ পাক এসব ব্যাপারে কত হেকমত রেখেছেন তা শুধু বুদ্ধিমান লোকেরাই অনুধাবন করতে পারে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একঃ পুরুষদেরকে বলা হয়েছে যে তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদেরই স্বগোত্রীয়। তাদের সৃজনে এবং জীবন যাপনে তারা তোমাদেরই অনুরূপ, আর চিন্তা-চেতনায়, আশা-আকাংক্ষায় তারা তোমাদেরই ন্যায়। অর্থাৎ যেভাবে তোমাদের মনের গহনে অনেক আশা-আকাংক্ষা, অনেক চাওয়া থাকে যা তোমরা তাদের নিকট থেকে পেতে চাও ঠিক তেমনি তারাও তোমাদের নিকট অনেক কিছু আশা করে, অনেক কিছু পেতে চায়। দুইঃ তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো যেন তারা তোমাদের শান্তি এবং সান্ত্বনার কারণ হয়, তাদের সঙ্গে তোমাদের মনের মিল হয়, তারা তোমাদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়। এটিই হলো لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا কথার তাৎপর্য। তিনঃ তোমাদের সম্পর্কের ভিত্তি হতে হবে পরস্পরের ভালবাসা, আকর্ষণ, আন্তরিকতা এবং সহমর্মিতা। এ ভিত্তি যত সুদৃঢ় হবে দাম্পত্য জীবন তত সার্থক হবে।

আর এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রী পুরুষের বাঁদী নয়, জীবন-সঙ্গিনী। ইতিহাস সাক্ষী। প্রাক-ইসলামী যুগে নারীর কোন অধিকার ছিল না।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২১১-১২

নারীকে শুধু ভোগ্য পণ্য হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। নারী ছিল তখন চরম অসহায়। আর কোন কোন ধর্মাবলম্বীরা নারীকে পাপের মূল উৎস এবং দূর্ভাগ্যের মূল কারণ মনে করতো। কিন্তু পবিত্র কোরআন নারী অধিকার সংরক্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা হলোঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (সূরা বাকারা)

"নারী হলো তোমাদের ভূষণ, আর তোমরা হলে তাদের ভূষণ"।

আর আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা তোমাদের ভালবাসা লাভ করার অধিকারী, আর তোমরা হবে তাদের প্রতি দয়াদ্র। আর এভাবে তোমরা লাভ করবে তাদের কাছে শান্তি। আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে হলে একথা বলতে হয় যে স্বামী স্ত্রীকে দেবে ভালবাসা এবং দয়া- এটি তার প্রাপ্য। আর স্ত্রী স্বামীকে দেবে সেবা, যত্ন এবং সান্ত্বনা। একজন আল্লাহ পাকের নেয়ামত সংগ্রহ করবে আরেকজন করবে সংরক্ষণ।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীদের প্রতি মনের আকর্ষণও আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নেয়ামত। কেননা এ স্থলে মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহেরই উল্লেখ রয়েছে। অতএব, কোন স্বামীর তার স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ তার কামালিয়তের বরখেলাফ নয়।[২]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

"আর আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি হলো আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যে অনেক নিদর্শন"।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ নীলাভ আকাশ এবং বিশাল-বিস্তৃত জমিনের সৃষ্টি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের এক বিষ্ময়কর নিদর্শন। আল্লাহ পাক খুঁটি ব্যতীত বিশাল আসমানকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা আসমানকে আলোকময় করে রেখেছেন। এমনিভাবে বিশাল-বিস্তৃত জমিন তৈরী করেছেন। তার মধ্যে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, সমুদ্র এবং বৃক্ষ-তরুলতা প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। এসবই তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের জীবন্ত নিদর্শন। শুধু তাই নয়; বরং তোমাদের বর্ণ এবং ভাষার যে বৈচিত্র তা-ও আল্লাহ পাকের বিশেষ নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাক একেক জাতিকে একেক ভাষা শিক্ষা

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮১৭
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৭৯৫

দিয়েছেন এবং তাদেরকে সে ভাষায় কথা বলার শক্তি দিয়েছেন এবং প্রত্যেককে তার দেহের বর্ণের মধ্যেও পার্থক্য করেছেন। কেউ সাদা, কেউ কালো। যদিও মানুষের মূল আকৃতিতে কোন পার্থক্য নেই। সকলেরই দু'টি চক্ষু, দু'টি কর্ণ, দু'টি হাত, দু'টি পা রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বর্ণ, ভাষা, আকৃতি-প্রকৃতি, প্রকাশ-ভঙ্গি এক কথায় সব কিছুতেই স্বাতন্ত্র্য এবং পার্থক্য রয়েছে। কোটি মানুষকে একত্রিত করলেও দু'জন মানুষকে এক প্রকার দেখা যায় না। এটি নিঃসন্দেহে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সমগ্র মানব জাতিকে একই পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সারা পৃথিবীতে তাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু একজনের ভাষা আরেকজন বোঝে না, একজনের বর্ণ এবং আকার-আকৃতি আরেকজনের সঙ্গে মেলে না। প্রত্যেকের প্রকাশ-ভঙ্গি ভিন্ন, প্রত্যেকের স্বর স্বতন্ত্র। এসব বৈচিত্র নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন। এ নিদর্শন সমূহ দেখে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। কিন্তু সত্যিকার আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত কেউ এ সত্য উপলব্ধি করেনা। যদিও আল্লাহ পাকের এসব নিদর্শন সমূহ ফেরেশতা ও জ্বীনদের নিকট গোপন নেই এবং জ্ঞানী মানুষের নিকটও গোপন নেই। কিন্তু যারা সত্যিকার জ্ঞানী নয়, যারা পরিণামদর্শী নয় তারা এসব সত্য দেখে চিন্তা করেনা।

বস্তুতঃ সমগ্র মানব জাতি একই পিতা-মাতা তথা আদম ও হাওয়ার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, কেউ আরবী, কেউ ফার্সী, কেউ উর্দু, কেউ ইংরেজী, কেউ বাংলা এমনিভাবে কারো দেহের বর্ণ সাদা আর কেউ সম্পূর্ণ কালো, আর কেউ লাল, এসব কিছু কোন মানুষের ইচ্ছায় হয় না; বরং স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা-মর্জিতেই হয়। বর্ণ ও ভাষার এ বৈচিত্র্য আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতেরই জীবন্ত নিদর্শন। যারা এসবের মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরত দেখেনা, তারাই মূর্খ, প্রকৃত জ্ঞানী সে সব লোকই যারা আল্লাহ পাকের কুদরতের এসব নমুনা দেখে তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর মা'রেফাত হাসিল করে। যেভাবে দুনিয়াতে মানুষের অবস্থা এবং গুণাবলী বিভিন্ন, ঠিক তেমনি আখেরাতেও মানুষের অবস্থা এবং মর্তবা বিভিন্ন হবে। যারা দুনিয়ার এ জীবনে আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলবে, তারা আখেরাতে আল্লাহ পাকের নেয়ামত ভোগ করবে। পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়ার এ জীবনে আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবে তারা ভোগ করবে কঠিন শাস্তি। যারা জ্ঞানী, শুধু তারাই এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন দেখতে পায়। একথাটি অন্যত্র এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَٰلِمُونَ ۝ (সূরা আনকাবুত)

"আর তা আলেমগণ ব্যতীত অন্যরা বুঝতে পারেনা"।

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ

"আর আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে রাত এবং দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহের অন্বেষণ, নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা শ্রবণ করে"।

আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিদ্রা এবং জাগরণ। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ বিশ্রাম করে, আর জাগ্রত অবস্থায় সে তার জীবিকার অন্বেষণ করে। যদিও দিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জীবিকার অন্বেষণের জন্যে, আর রাতকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের বিশ্রামের জন্যে কিন্তু অন্য কাজ করতেও কোন বাধা নেই। অর্থাৎ দিনেও মানুষ নিদ্রিত হয় এবং রাতেও মানুষ তার জীবিকার অন্বেষণ করে। নিদ্রার মাধ্যমে তথা বিশ্রামের মাধ্যমে মানব দেহ শক্তি সঞ্চয় করে, সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, আল্লাহ পাক তার বন্দার ক্লান্তি ঘুমের মাধ্যমেই দূর করে দেন, পরদিন সকালে সে নব-উদ্যমে নব-শক্তি নিয়ে জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের এ বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ শুধু বুদ্ধিমান লোকেরাই অনুধাবন করে, নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ শ্রবণ করেনা, তাই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ রাত ও দিনে তোমাদের নিদ্রাগমনে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণে নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা শ্রবণ করে।

অর্থাৎ যারা মনের কর্ণে শ্রবণ করে, কেননা প্রকাশ্য কর্ণে শ্রবণ করা হেদায়েত লাভের জন্যে ক্ষেত্র বিশেষে যথেষ্ট হয় না; বরং মনের কর্ণে শ্রবণ করা একান্ত জরুরী হয়। যেমন মওলানা রুমী (রঃ) বলেছেনঃ

این سخن را ازگوش دل باید شنود

گوش گل اینجا ندارد هیچ سود

"একথাটি মনের কর্ণে শুনতে হবে, মাটির কর্ণ এ স্থলে উপকারী হয় না, আবু জেহেল, আবু লাহাবরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা শ্রবণ করেনি এমন নয়; তবে তারা মনের কর্ণে শ্রবণ করেনি, শুধু মাটির কর্ণেই শ্রবণ করেছে, তাই তারা হেদায়েত লাভ করতে পারেনি"।

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে বিশ্রামের জন্যে নিদ্রিত হওয়া এবং জীবিকার অন্বেষণ করা আল্লাহর ওলীদের কামালিয়তের বরখেলাফ নয়, কেননা আল্লাহ পাকের রহমত এবং দানের বিবরণে এসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, অতএব আল্লাহ পাকের দান গ্রহণ কামালিয়তের বরখেলাফ হতে পারেনা।[১]

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৭৯৬

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে يسمعون শব্দটি يطيعون অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকেরবিধি-নিষেধ পালন করে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তারা এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রমাণ দেখতে পায়।

ইমাম তাবারী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ যারা আল্লাহ পাকের উপদেশ সমূহ শ্রবণ করে এবং গ্রহণ করে, তাদের জন্যে এতে রয়েছে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বহু নিদর্শন।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا

"আর এটিও আল্লাহ পাকের নিদর্শন যে তিনি ভয় ও আশা স্বরূপ তোমাদেরকে বিদ্যুত প্রদর্শন করে থাকেন এবং তিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, আর তা দ্বারা তিনি ভূমিকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করেন"।

অর্থাৎ বিদ্যুতের চমক দেখে মানুষ ভয় পায়। বিশেষতঃ পথিক-মুসাফির ভ্রমণকালে বিদ্যুতের চমক দেখে বজ্রপাতের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। আর যে তার বাড়ী-ঘরে অবস্থান করে সে বিদ্যুতের চমক দেখে বৃষ্টিপাতের আশা করে। লক্ষ্যনীয়, বিদ্যুতের চমক একটি বস্তু অথচ কেউ তা দেখে ভয় করে আর কেউ তা দেখে আশা করে। অতএব বিদ্যুতের চমকের মধ্যে আশা এবং ভয়ের যৌথ নিদর্শন রয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে তিনি যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা তা করেন এবং একই বস্তু দিয়ে কাউকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেন এবং কাউকে আশান্বিত করেন। আর এ অবস্থা একই সঙ্গে হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা মৃত শুষ্ক জমিনকে পুনর্জীবন দান করেন।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ○

নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা বুদ্ধিমান। যারা নির্বোধ তারা আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের কথা বুঝতে পারেনা।

লক্ষ্যনীয়, মেঘমালা হলো পানি এবং বাতাসের সমষ্টি। আর পানি হলো অগ্নির শত্রু। কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরত কত বিস্ময়কর যে তিনি পানি থেকে অথবা পানি ও বাতাস থেকে অগ্নি বের করছেন এবং তাঁর নির্দেশেই মেঘমালার পাশাপাশি বিদ্যুত চমকাচ্ছে, যা কারো মনে আশার সঞ্চার করছে আর কেউ কেউ ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছে। এসব কিছুই আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৩
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-২২

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً ۖۗ مِّنَ الْاَرْضِ ۖۗ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَهٗ مَنْ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى
فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾ ضَرَبَ لَكُمْ
مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ
شُرَكَآءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ
كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

তরজমা

(২৫) এবং আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি হলো, আসমান জমীন তাঁরই আদেশে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর যখন তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে বের হয়ে আসার আহবান জানাবেন তখন তোমরা বের হয়ে পড়বে।

(২৬) আর আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের। সকলেই তাঁর হুকুমের তাবেদার।

(২৭) এবং তিনিই সেই পবিত্র সত্ত্বা যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন, আবার তিনিই দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেন। আর তা তাঁর পক্ষে অতি সহজ। আর আসমান ও জমিনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

(২৮) তিনি তোমাদের নিজেদের থেকেই তোমাদের জন্যে একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন, তোমাদেরকে আমি যে রিযুক দান করেছি তোমাদের অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদীদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের অংশীদার রয়েছে? ফলে তোমরা কি এ ব্যাপারে তাদের সমান? তোমরা পরস্পরকে যেভাবে ভয় কর তাদেরকেও কি তেমনি ভয় কর? এভাবেই আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে আয়াত সমূহ বর্ণনা করে থাকি।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের নিদর্শন

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ.........

আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের একটি বিস্ময়কর নিদর্শন হলো, আসমান জমিন তাঁর আদেশেই দাঁড়িয়ে আছে। আসমানকে এভাবে রাখার জন্যে কোন খুঁটি বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আর জমিনও পানির উপর স্থবির রয়েছে। আসমানও যুগ যুগ ধরে এভাবে স্থির রয়েছে। প্রশ্ন হলো, কোন্ কৌশলে? অথবা কোন্ খুঁটির উপর ভর করে? এর একটিই জবাব আর তা হলো শুধু আল্লাহ পাকের হুকুম এবং মর্জিতেই আসমান জমিন বর্তমান অবস্থায় রয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন এবং তাঁর একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এজন্যে সূরা রা'দের শুরুতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

"আল্লাহ পাকই সেই পবিত্র সত্ত্বা, তিনি উর্দ্ধদেশে আসমান স্থাপন করেছেন কোন স্তম্ভ ব্যতীত; যা তোমরা দেখছো"।

যাঁর হুকুমে বিশাল-বিস্তৃত আসমান জমিন বর্তমান অবস্থায় দন্ডায়মান রয়েছে, যাঁর আদেশে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে, যাঁর ইচ্ছা ও মর্জিতে প্রতিটি মানুষ এ জীবন লাভ করেছে তাঁরই হুকুমে সে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করবে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○

"এরপর যখন তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে বের হয়ে আসার আহবান জানাবেন তখন তোমরা বের হয়ে পড়বে"।

এমনিভাবে সূরা জুমআয় আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর রয়েছ, অবশ্যই তার সাথে তোমাদের সাক্ষাত হবে; এরপর তোমরা সেই আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবে যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন"।

এবনে আসাকের লিখেছেন, যায়েদ এবনে জাবের এ প্রসঙ্গে একখানি আয়াতের উল্লেখ করেছেন তা হলোঃ

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ○ (সূরা ক্বাফ)

"শোন! যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহবান করবে"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) বায়তুল মোকাদ্দাসের ছাদে দন্ডায়মান হয়ে আহবান করবেন, "হে ধূলিতে মিশে যাওয়া হাড় সকল! হে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চামড়া সকল এবং হে চূর্ণ-বিচূর্ণ পশম সকল! আল্লাহ পাক তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে ফয়সালা এবং হিসাবের জন্যে হাযির হও"।

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। তাঁর হুকুমের সকলেই তাবেদার"।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেন, এ আয়াতে "সকলেই" বলতে শুধুমাত্র তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ পাকের আজ্ঞাবহ এবং অনুগত মোমেন। কাফের এবং গুনাহগার মোমেনকে বোঝানো হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরকার এ মত পোষণ করেছেন যে এতে সকলেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা সৃষ্টিগত ব্যাপারে আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করার ক্ষমতা কারো নেই। তবে শরীয়তের যে বিধান মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে সেখানে কাফের-মুশরেক, বে-দ্বীন এবং পাপীষ্ঠ লোকেরা আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখায়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি মানুষ তার জন্ম গ্রহণে, জীবন ধারণে, মৃত্যু বরণে এবং কেয়ামতের দিন পুনরুত্থানে আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। যদিও এবাদতের আদেশ পালনে কোন ব্যক্তি অবাধ্য হয়। এ অর্থেই এরশাদ হয়েছেঃ

كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ

(প্রত্যেকে তাঁর হুকুমের তাবেদার।)

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ

"এবং তিনিই সে পবিত্র সত্ত্বা যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন আবার তিনিই দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেন। আর তা তাঁর পক্ষে অতি সহজ"।

শানে নজুল

এবনে আবি হাতেম একরামার সূত্রে লিখেছেন, মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় জীবিত করে কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান করা হবে এ সম্পর্কে কাফেরদের সন্দেহ ছিল। তাই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের অনন্ত অসীম কুদরতের নিকট প্রথম এবং শেষ, পূর্ব এবং পর সব সৃষ্টি সম্পূর্ণ সমান। কিন্তু মানুষের ধারণা হলো,

প্রথম সৃষ্টি কষ্ট-সাধ্য হলেও পরের বার তা হবে অতি সহজ। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ

অর্থাৎ হে আত্ম-বিস্মৃত মানব জাতি! তোমাদের পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানকে বিস্ময়কর বা অসম্ভব মনে কর? অথচ এ সত্য অনুধাবন কর না যে প্রথম বার তো আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন, অতএব দ্বিতীয় বার তাঁর পক্ষে সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন হওয়ার কথা নয়। কেননা আল্লাহ পাকের পক্ষে কোন কাজই কঠিন নয়। উফী-র বর্ণনা মোতাবেক আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাই বলেছেন।

মুজাহেদ এবং একরামা (রঃ) বলেছেন যে আলোচ্য আয়াতের اهون শব্দটির ব্যবহার দৃষ্টান্ত মূলক। অর্থাৎ তোমরা জান যে প্রথমবার সৃষ্টি করা থেকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অতি সহজ হয়।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলোঃ তোমাদের দৃষ্টিতে কোন কিছুকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা প্রথম বারের চেয়ে সহজ। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, দ্বিতীয় বার সৃষ্টি হওয়া প্রথম বারের তুলনায় সহজ হওয়ার কারণ হলো, দ্বিতীয় বার হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর একটি ভয়ানক গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কবর থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ প্রথম বারের সৃষ্টি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কেননা প্রথমে রক্ত, এরপর শুক্র এবং এরপর জমাট রক্ত, এরপর গোশ্‌ত খন্ড এবং এরপর নারী পুরুষ এবং এরপর জন্ম গ্রহণ। এত সব স্তর পেরিয়ে একটি মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আর দ্বিতীয় বার সৃষ্টি তথা পুনরুত্থানের জন্যে আল্লাহ পাকের নির্দেশ—ক্রমে প্রদত্ত হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর একটি আহবানই যথেষ্ট।

যেমন আল্লাহ পাক সূরা ইয়াসীনে এরশাদ করেছেনঃ

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ○

"এটি হবে শুধু একটি মহা-নাদ, তখনই তাদের সকলকে আমার সম্মুখে হাযির করা হবে"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আসমান জমিনকে আল্লাহ পাক যেভাবে রেখে দিয়েছেন তা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের এক জীবন্ত নিদর্শন। কেননা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুমেই আসমান এভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। বুদ্ধিমান মাত্রই এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদারত হয়। খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) যখন কোন বিষয়ে শপথ করতেন তখন বলতেন, "সেই আল্লাহ পাকের শপথ, যাঁর হুকুমে আসমান জমিন দাঁড়িয়ে আছে"।

বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে আদম সন্তানেরা মিথ্যা-জ্ঞান করে যা তার জন্যে

উচিত নয়, আদম সন্তানেরা আমাকে মন্দ বলে তা-ও তার জন্যে অত্যন্ত অন্যায়। মিথ্যা-জ্ঞান করা হলো এই, সে বলে যে আল্লাহ্ পাক আমাকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ দ্বিতীয় বারের সৃষ্টি প্রথম বারের চেয়ে সহজ হয়। আর আমাকে মন্দ বলা হলো এই, সে বলে যে আল্লাহ্ পাকের সন্তান রয়েছে অথচ আমি এক, অদ্বিতীয়। যার কোন সন্তান-সন্ততি নেই, যার পিতা-মাতা নেই, যার সমকক্ষ কেউ নেই। এজন্যে এরশাদ হয়েছেঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

(সূরা আশ্ শুরা)

"তাঁর ন্যায় কোন কিছুই নেই"।

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আকাশে ভূবনে আল্লাহ পাকের শানই সর্বোচ্চে। আর তিনিই সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী, তিনিই মহাজ্ঞানী"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী, তাঁর বৈশিষ্ট্য সমূহ অতুলনীয়, তাঁর মহিমা অপার, তিনি শ্রেষ্ঠতম, উন্নততর মর্যাদা ও মহিমার অধিকারী, নিখিল বিশ্বের কোন কিছুই গুণে-জ্ঞানে, মানে-মর্যাদায় তাঁর ধারে কাছেও আসতে পারেনা। তাঁর কুদরত হেকমত অনন্ত অসীম, মানুষের জন্যে তা কল্পনাতীত। তিনিই স্রষ্টা, আর সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি, তিনিই ছিলেন, তিনিই আছেন, আর তিনিই থাকবেন, আর সমগ্র সৃষ্টি জগতের কিছুই ছিল না এবং কিছুই থাকবেনা কেননা সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আকাশে ভূবনে সর্বোচ্চ মর্যাদা আল্লাহ পাকের, তাঁর মহিমা অপার, একথার তাৎপর্য হলো তাঁর ন্যায় কেউ নেই।

আবদুর রাজ্জাক এবনে আবি হাতেমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে কাতাদা (রঃ) বলেছেন, তাঁর উচ্চতম শানের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদই হলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। নভোমন্ডল এবং ভূমন্ডলে যত কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় মুগ্ধ, যার কাছে যে গুণই আছে তা শুধু একমাত্র আল্লাহ পাকের গুণেরই বহিঃপ্রকাশ।

হযরত মোহাম্মদ এবনে মুনকাদের (রঃ) বলেছেনঃ তাঁর উচ্চতর শান হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সব কিছু তাঁর কতৃত্বাধীন, প্রথম সৃষ্টির ব্যাপারে এবং সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিতে তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর সম্মুখে সবই অসহায়।

الْحَكِيْمُ

তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর সিদ্ধান্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতের সাথেই সুসম্পন্ন হয়। তিনি ইচ্ছে করলে যে কোন সময় কেয়ামত কায়েম করতে পারেন এবং পৃথিবীর সব কিছু শেষ করে দিতে পারেন কিন্তু তাঁর হেকমত বা কৌশল মোতাবেক যখন পছন্দ করবেন তখনই তা করবেন।[১]

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ.....

"তিনি তোমাদের নিজেদের থেকেই একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তোমাদেরকে আমি যে রিয্‌ক দান করেছি তোমাদের অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদীদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের অংশীদার রয়েছে? ফলে তোমরা কি এ ব্যাপারে তাদের সমান? তোমরা পরস্পরকে যেভাবে ভয় কর তাদেরকেও কি তেমনি ভয় কর"?

শেরকের বাতুলতার একটি দৃষ্টান্ত

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মুশরেকদের মূর্খতা-পথভ্রষ্টতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে তাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে; যা দ্বারা শেরকের বাতুলতা এবং জঘন্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ পাক মুশরেকদের উদ্দেশ্য করে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে তোমাদের ধন-সম্পদ যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি তার মালিকানায় তোমাদের গোলাম-বাঁদীরাও কি তোমাদের শরীক রয়েছে? প্রকৃত অবস্থায় না হলেও তোমরা সাময়িকভাবে তাদের মালিক বা মুনীব। এমনি অবস্থায় তোমাদেরকে প্রদত্ত ধন-সম্পত্তিতে তারা কি তোমাদের অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সমান ভাগ দিতে প্রস্তুত? কোন যৌথ সম্পত্তিতে যারা সমান অংশের অধিকারী হয়, এমন অবস্থায় তোমরা একে অন্যকে মেনে চল এবং পরস্পর পরস্পরকে সমান মর্যাদার অধিকারী মনে কর। যদি তা না করা হয় তবে অংশীদাররা তোমাদের সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে যাবে বলে ভয় কর; তোমাদের গোলাম-বাদীদের ব্যাপারেও কি এমন ভয় কর? তা তো কখনও হতে পারেনা। এখন প্রশ্ন হলো সাময়িক মালিক যদি তার গোলাম-বাঁদীকে সম্পত্তিতে শরীক মনে না করে তবে যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি প্রকৃত মালিক, যিনি সকল সময়ের মালিক, সেই আল্লাহ পাকের সৃষ্টিকে তোমরা কোন্ যুক্তিতে তাঁর শরীক মনে কর? এখানে আরও লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, সমগ্র মানব জাতি একই আদম-হাওয়ার সন্তান, এক রক্ত-মাংসের মানুষ কিন্তু এতদসত্ত্বেও মালিক এবং গোলাম, মুনীব এবং চাকরকে তোমরা

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ২১৫
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮১৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠাঃ ২৯
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ১৬৮

সম মর্যাদা দিতে রাজি হওনা। তাহলে বিশ্ব জগতের যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, মালিক-মোখতার, তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাথে শরীক মনে করার ন্যায় জঘন্য অপরাধ আর কী হতে পারে![১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, মক্কার কোরায়েশরা মুশরেক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ঘরের হজ্জ ও ওমরাহ্ করতো এবং একথা বলতোঃ

لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে হাযির। তোমার কোন শরীক নেই; কিন্তু আমরা যাকে শরীক মনে করি তার মালিকও তুমি। আর ঐ শরীকের মালিকানায় যা কিছু আছে তার প্রকৃত মালিকও তুমি।

মুশরেকদের এ পথভ্রষ্টতার কারণেই আল্লাহ্ পাক শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করে এ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, হে লোক সকল! যে গোলাম-বাঁদীদেরকে তোমরা সৃষ্টি করোনি; বরং ক্রয় সূত্রে সাময়িকভাবে মালিক হয়েছ, আর এ ধন-সম্পদ যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি তাতে তোমরা তোমাদের গোলাম-বাঁদীকে শরীক করা পছন্দ কর না, তবে যাদেরকে আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা কিভাবে আল্লাহ্ পাকের শরীক মনে কর? এমন অযৌক্তিক, অসুন্দর এবং অন্যায় কথা তোমরা কিভাবে বল? আল্লাহ্ পাকের কোন সৃষ্টিই তাঁর শরীক হতে পারেনা।

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"যারা বুদ্ধি-জ্ঞান রাখে এবং যারা চিন্তা-ভাবনা করে আমি তাদের জন্যেই এভাবে দৃষ্টান্ত সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি"।

অতএব, যারা এ দৃষ্টান্ত সমূহের সত্যতা অনুধাবন করেনা তারা নির্বোধ, তাদের বুদ্ধি-জ্ঞান বলতে কিছুই নেই।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এর অর্থ হলোঃ তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত ধন-সম্পদে তোমাদের গোলাম-বাঁদীদেরকে শরীক করা পছন্দ কর না; এমন অবস্থায় এ প্রাণহীন প্রস্তর খন্ডগুলোকে অথবা তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোকে বিশ্ব-স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের শরীক মনে করতে তোমাদের বিবেকে এতটুকু বাধে না?[৩]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ৪০৬

২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ১৭২
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮১৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠাঃ ২৮-২৯

৩। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ২১৬

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِي
مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ
لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

তরজমা

(২৯) বরং এ পাপীষ্ঠরা অজ্ঞানতার কারণে তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে, অতএব, আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন কে তাকে হেদায়েত করতে পারে? আর তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারীও নেই।

(৩০) অতএব (হে সত্য-সন্ধানী!) আপনি একাগ্রচিত্তে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করুন। এটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত স্বভাব ধর্ম, যে স্বভাবের উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। আর এটি সরল সঠিক ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

(৩১) সকলে তাঁর প্রতি রুজু হয়ে তাঁকে ভয় কর আর নামাজ কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হয়োনা মুশরেকদের-

(৩২) যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বহু দলে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে মেতে রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে শেরক ও কুফরীর বাতুলতার কথা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এরপর বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো শেরক ও কুফর চিরতরে বর্জন করা। কেননা শেরক হলো জঘন্যতম অপরাধ, সবচেয়ে বড় জুলুম এবং অমার্জনীয় পাপ কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কার কাফেররা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তাঁর সদ্ব্যবহার করেনি এবং গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্নই রয়ে গেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

বরং এ পাপীষ্ঠরা না বুঝেই তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে, তাদের খেয়াল-খুশি মোতাবেকই তারা জীবন যাপন করেছে। তাদের প্রবৃত্তির নির্দেশ তারা মেনে নিয়েছে, বিচার-বুদ্ধিকে বিদায় দিয়েছে, তাদের কান্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে।

فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ

যারা প্রবৃত্তির তাবেদার হয়েছে, যারা বিচার-বুদ্ধিকে পরিহার করেছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ পাক তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন। আর যাদেরকে আল্লাহ পাক পথভ্রষ্ট করে দেন, তাদেরকে কে হেদায়েত করতে পারবে? মূলতঃ এমন লোককে হেদায়েত করার সাধ্য কারোরই থাকেনা।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, মানুষ এ পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব লাভ করে তথা জন্ম লাভ করে আল্লাহ পাকের এক হুকুমে, এ হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা কারো নেই, একটা নির্দিষ্ট কাল শেষ হলে মানুষকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করতে হয়। আল্লাহ পাকের আরেকটি হুকুমে তার উপর মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধান কার্যকর হয়। যত বড় শক্তিধরই হোক না কেন, এ হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা কারোই নেই। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে পৃথিবীর অবস্থান কাল-এ সময়ের জন্যে আল্লাহ পাকের অনেক বিধি-নিষেধ রয়েছে। এ বিধি-নিষেধ মানা না মানার স্বাধীনতা রয়েছে। যদিও পূর্বেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ যে মেনে চলবে, তার জীবন সার্থক-সুন্দর হবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের এ বিধি-নিষেধ অমান্য করবে তাদের জীবন শুধু যে ব্যর্থ হবে তাই নয়; বরং তারা চরম বিপদের সম্মুখীন হবে। ঈমান ও কুফরী তথা আলো এবং আঁধারের মধ্যে কেউ আলো অর্থাৎ হেদায়েতের পথ গ্রহণ করে আর কেউ কুফর শেরক তথা অন্ধকারের পথ গ্রহণ করে। যারা অন্ধকারের পথ গ্রহণ করে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তাই আলোচ্য আয়াতে ظلموا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা শেরক ও কুফরকে গ্রহণ করলো, তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করলো এবং এ জুলুমের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো দুনিয়াতে শেরক ও কুফরের ন্যায় জঘন্য মন্দ কাজে লিপ্ত থাকা আর আখেরাতে চিরদিন দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করা। এমন অবস্থায় তাদের হেদায়েত লাভের আর কোন সম্ভাবনা থাকেনা। আর তাদের কোন সাহায্যকারী থাকেনা। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ

"যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কে হেদায়েত করবে"?

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

"আর তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকেনা"।

অতএব, এমন লোকদের ব্যাপারে দুঃখিত হওয়ার বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই; বরং নিজের দ্বীন ও ঈমানকে সুদৃঢ় করা এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা করা ও নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ দূরাত্মা কাফেররা কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়েছে, অন্যায় পথ অবলম্বন করেছে, এমনি অবস্থায় তাদের জন্যে দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই; বরং নিজের দ্বীনের উপর অবিচলিত থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করাই কর্তব্য, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এবং এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) মক্কার এ কাফেরদেরকে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকতে দিন। আপনি একাগ্র চিত্তে দ্বীন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করুন।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে পাঠক মাত্রকে, প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সম্বোধন করার কারণে একবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত প্রকৃতির অনুসরণ কর যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, (আর মনে রেখ) আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।

স্বভাব-ধর্মের উপর স্থির থাক

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক মানুষকে এমন প্রকৃতি দান করেছেন তথা সৃষ্টিগতভাবে তার মধ্যে এমন স্বভাব এবং প্রকৃতি রেখে দিয়েছেন যে, যদি সে সত্যকে অনুধাবন করতে এবং গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় তবে তা অনায়াসে করতে পারে। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে তাঁর মা'রেফাতের এমন বীজ রেখেছেন যে, প্রত্যেকে তার স্বাধীন প্রকৃতি অনুযায়ী আল্লাহ্ পাককে চিনতে পারে, তাঁর পরিচয় লাভ করতে পারে এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করতে পারে। হাদীস শরীফে আছে, সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর সমগ্র মানব জাতির রুহকে তাঁর সম্মুখে সমবেত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ অর্থাৎ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই"?তখন সমগ্র মানব জাতি আল্লাহ পাকের রবুবিয়্যত স্বীকার করে বলেছিল, قَالُوْا بَلٰى

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৫২৮
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮১৯

অর্থাৎ হ্যা আপনিই আমাদের প্রতিপালক, সেদিন এ জবাব সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন অন্যান্য নবী রসূলগণ, ধারাবাহিকভাবে আওলিয়ায়ে কেরাম ও সমগ্র মানব জাতি। এটিই মানুষের স্বভাব ধর্ম যে সে তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁর অনুগত থাকবে। এজন্যে হাদীস শরীফে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

كل مولود يولد على الفطرة وابواه يوهودانه.........

"প্রত্যেকটি শিশুই স্বভাব-ধর্মের উপর জন্ম লাভ করে। আর তার পিতা-মাতা তাকে হয় ইহুদী বানায় অথবা অগ্নিপূজক"।

অর্থাৎ নবজাতক শিশুমাত্রই মুসলমান হিসেবে জন্ম লাভ করে কিন্তু তার পরিবেশ তথা তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-খ্রীষ্টান অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে।

হাদীসে কুদসীতে স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি আমার বন্দাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমার প্রতি একনিষ্ঠ এবং নির্ভরশীল করে কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে।

এতে একথাই প্রমাণিত হয়, মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার পরিবেশ, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ দূষিত পরিবেশে তথা কুফর, শেরক ও অন্যায়-অনাচারের পরিবেশে কারো শৈশব, কৈশোর অতিবাহিত হয় তবে তার জীবন সেভাবেই গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, যদি এমন দূষিত পরিবেশ থেকে মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ তার স্বাধীন প্রকৃতিতে তাকে ছেড়ে দেয়া যায় তবে সে স্বভাব-ধর্ম ইসলাম তথা সঠিক জীবন বিধান মেনে নিতে এতটুকু বিলম্ব করেনা। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, ফেরাউন এবং আবু জেহেলের মত জঘন্য লোকদের মধ্যেও জন্মগতভাবে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ছিল। আর এ কারণেই তাদের নিকট নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন কিন্তু তারা সে যোগ্যতাকে বিনষ্ট করেছে, নেতৃত্বের লোভে, জেদের বশীভূত হয়ে তারা সত্যের ডাকে সাড়া দেয়নি; যদি তারা জড় পদার্থের ন্যায় যোগ্যতা বঞ্চিত হতো, তবে তাদের নিকট নবী রসূল প্রেরিত হতেন না। এজন্যে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রতিটি মানুষকে তার স্বভাব-ধর্মের উপর কায়েম থাকার আহবান জানিয়েছেন। স্বভাব-ধর্ম হলো তওহীদে বিশ্বাস করা, যখন মানব মনে প্রশ্ন উত্থিত হয়, কে আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন? কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? তার একটিই মাত্র জবাব তা হলোঃ এক আল্লাহ পাক, এটি মানুষ মাত্রেরই মনের কথা অতএব, আলোচ্য আয়াতের "ফিতরাত" শব্দটির মর্মার্থ হলো, মানুষ মাত্রেরই মধ্যে লুপ্ত, সুপ্ত সে যোগ্যতা যা তাকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং ন্যায়- অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি যোগায়। এ শক্তিটি মানুষের স্বভাবগত, যদি সে দূষিত পরিবেশ থেকে মুক্ত থাকতে পারে তবে সত্য গ্রহণে আর কোন বাধা থাকেনা, সে স্বভাব ধর্মের উপর কায়েম থাকতে পারে তথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকে।

এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

"আল্লাহ পাকের সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই"।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই স্বভাবগত ভাবে এ যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। অতএব প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো এ যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করা, অন্যায়-অনাচার দ্বারা তা বিনষ্ট না করা।

"আল্লাহ পাকের সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই", কথাটির তাৎপর্য হলো, মানুষের মধ্যে সত্য গ্রহণের যে যোগ্যতা নিহিত রয়েছে তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। এমনকি ইহুদী-নাসারা হওয়ার পরও সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকে। এ যোগ্যতার সদ্ব্যবহার না করার কারণেই তারা হয় বিপদগ্রস্ত।

আলোচ্য বাক্যের আরেকটি অর্থ হলো, যারা কুফর ও শেরক করে তাদের কর্তব্য হলো স্বভাব ধর্মের পরিবর্তন না করা। যে স্বভাবের উপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা হেদায়েতের একটি বীজ, গাফলতের কারণে তা বিনষ্ট করোনা।

মুজাহেদ (রঃ) এবং ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক যে স্বভাবের উপর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাকে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধর আর তওহীদকে শেরক দ্বারা পরিবর্তন করোনা।

আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ শিশু মাত্রকে তার সৃষ্টিতে প্রদত্ত স্বভাবের উপরই রাখা হয়। আর তা শুধু আল্লাহ পাকই জানেন। সে ভাগ্যবান কি হতভাগা-এ বিষয়টি আল্লাহ পাকের এলমে রয়েছে। অবশেষে সে সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের দিকেই অগ্রসর হয় যার উপর আল্লাহ পাক তাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তার কর্মপন্থা তার স্বভাব মোতাবেকই হয়।

এ ব্যাখ্যার আলোকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে যাকে যে স্বভাবের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে তার পরিবর্তন হবেনা, ভাগ্যবান হতভাগা হবেনা, এমনিভাবে হতভাগাও ভাগ্যবান হবেনা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, মায়ের উদরে শিশু যখন গোশ্‌ত খণ্ডে পরিণত হয় তখন আল্লাহ পাক চারটি আদেশ দিয়ে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ঐ ফেরেশতা শিশুটির কর্ম, জীবনের মেয়াদ, রিযকের পরিমাণ, তার ভাগ্যবান বা হতভাগা হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ করেন। এরপর ঐ গোশ্‌ত খণ্ডের মধ্যে রুহ ফুঁকে দেয়া হয়। শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, মানুষ সারা জীবন জান্নাতবাসীদের কাজ করে, এমনকি তার মধ্যে আর জান্নাতের মধ্যে এক হাতের বেশী দূরত্ব থাকেনা, (তখন তার মায়ের উদরে থাকাকালীন) লেখা প্রভাব বিস্তার করে এবং সে দোযখীদের কাজ করা আরম্ভ করে, অবশেষে সে দোযখী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, কোন কোন লোক দোযখীদের কাজ করতে থাকে এমনকি, তার মধ্যে আর দোযখের মধ্যে এক হাতের বেশী তফাত থাকেনা কিন্তু

অবশেষে সেই লেখাটি প্রভাব বিস্তার করে এবং সে জান্নাতীদের কাজ করতে শুরু করে এবং অবশেষে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

হযরত আবু দরদা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলাম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি তোমরা একথা শ্রবণ কর যে একটি পাহাড় তার স্থান থেকে সরে গেছে, তবে তোমরা তা বিশ্বাস কর কিন্তু যদি কেউ একথা বলে যে কোন মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হয়ে গেছে, তবে তা বিশ্বাস করোনা। কেননা মানুষ অবশেষে সেদিকেই যায় যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে (আহমদ)।

এই হাদীসের আলোকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এই, আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষকে একটি স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন, যার পরিবর্তন হয়না।

অতএব, প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাক তার মধ্যে সত্য গ্রহণের যে যোগ্যতা দান করেছেন, তার সমাদর করা তথা তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা এবং তার যত্ন করা। আর এজন্যেই পূর্ববর্তী আয়াতে নির্দেশ রয়েছে,

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط

"অতএব, (হে রসূল!) কাফেরদেরকে গোমরাহীর অন্ধকারে পড়ে থাকতে দিন, আর আপনি একাগ্রচিত্তে স্বীয় দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করুন"।

আর পরবর্তী আয়াতে এই দ্বীনের প্রশংসা করে বলেছেনঃ

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

অর্থাৎ এটি হলো সরল সঠিক ধর্ম।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

অর্থাৎ ইসলাম যে পরিপূর্ণ, সরল ও সঠিক ধর্ম, পূর্ণ পরিণত, যুক্তিসঙ্গত জীবন বিধান, সর্বকালের জন্যে উপযোগী, সার্বজনীন জীবন বিধান এবং আল্লাহ পাকের দরবারে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন-ব্যবস্থা, এ সত্য অনেক লোকই জানেনা।

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

"তোমরা সকলে আল্লাহ পাকের প্রতি রুজু হয়ে তাঁকে ভয় কর এবং নামাজ কায়েম কর"।

আলোচ্য আয়াতের مُنِيْبِيْن শব্দটি اناب থেকে নিষ্পন্ন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা। আল্লাহ পাক ব্যতীত সব কিছুকে মন থেকে সরিয়ে দেয়া, কেননা তিনিই মনের মালিক, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিযকদাতা, অবশেষে মানুষ

মাত্রকে তাঁর দরবারেই হাযির হতে হবে, অতএব এক আল্লাহ্ পাককেই ভয় কর, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন কর যথাযথভাবে, আর যেহেতু আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজ, তাই আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেয়ার পর সর্বপ্রথম নির্দেশ হলো,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ নামাজ কায়েম কর সঠিকভাবে, যথা নিয়মে নামাজ কায়েম কর।

এখানে লক্ষ্যনীয়, প্রথম নির্দেশ হলো আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশ কর, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর সব কিছুকে মন থেকে সরিয়ে দাও, এরপর এরশাদ হয়েছে আল্লাহ্ পাককে ভয় কর, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর আর এ অবস্থার শুভ-পরিণতি হলো আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়া। আর আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার মাধ্যম হলো নামাজ। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বন্দা আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য হয় সেজদারত অবস্থায়।

وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"আর মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা"।

আল্লামা এবন কাসীর (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা মুশরেক হয়োনা তথা খাঁটি, প্রকৃত তওহীদপন্থী হও, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কারো কাছে কোন আশা করোনা।

নাজাত লাভের উপকরণ

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বলেছেনঃ এ আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, আর এ তিনটি বিষয়ই আখেরাতে নাজাত লাভের মৌল উপাদান।

(এক) এখলাস অর্থাৎ জীবন ও জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে হতে হবে। এটিই স্বভাব আর এ স্বভাবের উপরই আল্লাহ্ পাক সমগ্র মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।

(দুই) নামাজ, আর তাই হলো দ্বীনের ভিত্তি।

(তিন) 'এতাআত' অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা।

আর এটিই হলো মানুষের জন্যে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কবচ। হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ)-এর এ ব্যাখ্যা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২১, পৃষ্ঠা-৩১)

"আর মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা" একথার তাৎপর্য হলো, মুশরেকদের সাথে সহযোগিতা করা তোমাদের উচিত নয়। আর তাদের মত কাজ করাও সমীচিন নয়। তাদের থেকে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য।

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ط

অর্থাৎ যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়েছে, তোমরা এ মুশরেকদের অন্তভূক্ত হয়োনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ বাকটির ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের "আল মুশরেকুন" শব্দ দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা নিজ নিজ ভাবাবেগে তাদের উপাস্য তৈরী করেছে, স্বভাব ধর্ম ইসলামকে বর্জন করে ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা এবং পৃথক পৃথক রীতি-নীতি অবলম্বন করেছে। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

"প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদে মেতে রয়েছে"।

অর্থাৎ নিজের মতবাদকে সত্য এবং অন্যের মতবাদকে অসত্য মনে করে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়েছে, অধর্মকে ধর্ম মনে করেছে এবং যা সত্য মনে করেছে তা যে সত্য নয়, একথা চিন্তা করতেও রাজী হয়নি। প্রত্যেক দলের একজন নেতা হয়ে গেছে আর সকলেই সে ভ্রান্ত নেতার অনুসরণে লিপ্ত হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরো লিখেছেনঃ যারা দ্বীনে এভাবে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তারা হলো এ উম্মতের আহলে বেদআত অর্থাৎ তারা যা ধর্মীয় কাজ নয় তাকে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করেছে। এদেরকেই আহলে বেদআত বা বেদআতী বলা হয়, তাদেরকে মুশরেক এজন্যে বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের মনের আকাংক্ষাকে তাদের মা'বুদ বা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে, তাদের মন যা চায় তাই তারা করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে, শুধু এক ফেরকা ব্যতীত আর সকলেই দোযখে যাবে। আরজ করা হলো সে কোন্ ফেরকা? তখন তিনি এরশাদ করেন, যে পন্থার উপর আমি রয়েছি এবং আমার সাহাবাগণ রয়েছে, সে পন্থা অবলম্বনকারীরাই নাজাত পাবে। (তিরমিজী শরীফ)

যে সব মুশরেকরা ধর্মীয় মূল্যবোধে বিভেদ সৃষ্টি করেছে তারা হলো ইহুদী নাসারা।

ইমাম কাতাদা (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। কুরতবী রঃ)-ও একথাই বলেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত আবু উমামা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম এ মত পোষণ করতেন, যাদের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে তারা

এ উম্মতেরই আহ্‌লে বেদআত।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেনঃ তিরমিজী শরীফে সংকলিত পূর্বে উল্লেখিত যে দলের কথা বলা হয়েছে যে, তারাই নাজাত পাবে, তারা হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত, যারা আল্লাহর কিতাব কোরআনে করীম ও সুন্নতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন এবং এ যুগের অনেক মুসলমানও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এ দলই হক্বের উপর রয়েছে।[২]

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا
بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا
بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৩) মানুষের উপর যখন বিপদ আপতিত হয় তখন তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে একাগ্রচিত্তে, এরপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর রহমত আস্বাদন করতে দেন তখন তাদেরই একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শেরক করে।

(৩৪) আমার প্রদত্ত দান তারা অস্বীকার করতে চায় অতএব, ভোগ করে লও, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

(৩৫) আমি কি তাদের নিকট এমন কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আমার সাথে শেরক করতে বলে?

(৩৬) আমি যখন মানুষকে আমার রহমত ভোগ করতে দেই তখন তারা উল্লাসে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২১৯
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২১, পৃষ্ঠা-৩১
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮২০
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২১, পৃষ্ঠা-৩১

ফেটে পড়ে, আর যখন তাদের কৃতকর্মের পরিণামে তারা দুর্দশাগ্রস্ত হয় তখন হতাশ হয়ে পড়ে।

(৩৭) তারা কি লক্ষ্য করেনা যে আল্লাহ পাক যার জন্যে ইচ্ছা করেন, তার রিযক প্রশস্ত করে দেন আর যাকে ইচ্ছা পরিমিত পরিমাণে দান করেন, নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে তওহীদের দলিল-প্রমাণ এবং দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, তারা যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন একাগ্রচিত্তে একমাত্র আল্লাহ পাককে ডাকে যেন তিনি তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন। নিজেকে সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক আল্লাহ পাকের দিকেই তখন মনোনিবেশ করে। আল্লাহ পাক ব্যতীত সব কিছুকে তখন উপেক্ষা করে, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুকে তখন আর ডাকেনা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ

"মানুষের উপর যখন বিপদ আপতিত হয় তখন তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে একাগ্র চিত্তে"।

আর এই ডাক হয় তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। কিন্তু যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন এবং তারা নিজেদেরকে বিপদমুক্ত মনে করে তখনই আল্লাহ পাকের সাথে তারা শেরক করে, আল্লাহ পাককে তারা এভাবে ভুলে যায় যেন কখনো তিনি তাদের কোন উপকার করেননি, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ○

"এরপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর রহমত আস্বাদন করতে দেন তখন তাদেরই এক দল তাদের প্রতিপালকের সাথে শেরক করে"।

لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ

"আমার প্রদত্ত দান তারা অস্বীকার করতে চায়"।

অর্থাৎ মহা বিপদের সময় আল্লাহ পাক যে তাদেরকে রক্ষা করেছেন এবং তিনি যে তাদেরকে তাঁর বিশেষ দানে ধন্য করেছেন, একথা তারা ভুলে যায় এবং তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অকৃতজ্ঞ মানুষের এ নিমক হারামী ও অকৃতজ্ঞতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে পরবর্তী বাক্যাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

"কয়েকটি দিন ভোগ কর", অর্থাৎ পৃথিবীর এ জীবন তো নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, কয়েক দিনেরই ব্যাপার, এ কয়েক দিন ভোগ কর, অচিরেই এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে। কেননা মানুষ যত শক্তিধরই হোক না কেন, তাকে অবশেষে এ ছায়া মায়া ঘেরা পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে এবং জীবনের মালিক আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে হাযির হয়ে জীবনের হিসাব দিতে হবে, তখন প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা সম্পর্কে টের পাবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে। তিনি এরশাদ করেছেন, কোন আদম সন্তান হাশরের ময়দানে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পা নাড়াতে পারবেনা।

(এক) তোমার জীবন কিভাবে ব্যয় করেছ?

(দুই) তোমার যৌবন কি কাজে ব্যয় করেছ?

(তিন) অর্থ-সম্পদ কি কি পন্থায় উপার্জন করেছ?

(চার) উপার্জিত অর্থ-সম্পদ কি কি পন্থায় ব্যয় করেছ?

(পাঁচ) তুমি যে সব বিষয় জানতে পেরেছিলে তার উপর আমল করেছ কি?

স্বয়ং আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

"অতঃপর যে একটি শস্য পরিমাণও সৎকাজ করবে তার পুরস্কার সে লাভ করবে, (তেমনি) যে একটি শস্য পরিমাণ অন্যায় কাজ করবে তারও শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে"।

অতএব, অচিরেই অর্থাৎ আখেরাতে প্রত্যেকটি মানুষ তার কর্মফল ভোগ করবে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ, হেদায়েত এবং গোমরাহী একই সঙ্গে বিদ্যমান রয়েছে। বিপদের মুহূর্তে হেদায়েত প্রকাশিত হয় আর বিপদমুক্ত হলে গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা উপস্থিত হয়।[১]

আয়াতের মর্মবাণী

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতে الناس শব্দটি দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আয়াতের মর্মবাণী এই, যখন এ কাফেরদের উপর কোন বালা-মসিবত, অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ, রোগ-মহামারী দেখা দেয় তখন তারা আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে এবং একাগ্রচিত্তে বিনীত হয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুকে ডাকেনা। কিন্তু যখনই তারা আল্লাহ্ পাকের রহমতে বিপদমুক্ত হয় তখন আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করতে এবং তাঁর অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেনা। হযরত যায়েদ এবনে খালেদ

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৭৯৮

জোহানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হোদায়বিয়া নামক স্থানে রাতে বৃষ্টি হলো, সকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন, নামাজের পর তিনি আমাদের দিকে ফিরে এরশাদ করলেনঃ তোমরা কি জান তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই জানেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, সকালে আমার কোন বন্দা মোমেন রয়েছে আর কেউ কাফের হয়েছে (অর্থাৎ আমার নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে)। যে ব্যক্তি বলেছে আল্লাহ পাকের দান ও রহমতে আমাদের প্রতি বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান রাখে, আর যে বলেছে, তারকারাজি প্রকাশিত হওয়ার কারণে বৃষ্টি হয়েছে সে আমাকে অস্বীকার করেছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।[১] (বোখারী ও মুসলিম)

শেরক বিবেক বর্জিত

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا

"আমি কি তাদের নিকট কোন প্রমাণ নাজিল করেছি যা তাদেরকে শেরক করতে বলে"?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াতের سلطان শব্দটির তরজমা হলো দলিল-প্রমাণ। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আসমানী কিতাব।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ শব্দটি দ্বারা এমন ফেরেশতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার সঙ্গে কোন দলিল থাকে, অথবা এমন কোন পয়গম্বর যাকে মোজেযা দ্বারা সাহায্য করা হয়। যাহোক, আয়াতের অর্থ হলো যারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে তাদের নিকট এমন কোন দলিল-প্রমাণ এসেছে কি? যা তাদেরকে শেরকের স্বপক্ষে আহবান করে। অথবা তাদের নিকট কি কোন ফেরেশতা বা নবীর আগমন হয়েছে, যে তাদেরকে শেরকের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, অথচ মানুষের প্রকৃতি এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি কখনো শেরক গ্রহণ করেনা কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ মুশরেকরা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করার ধৃষ্টতা দেখায়।[২]

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا۟ بِهَا

"আমি যখন মানুষকে আমার রহমত ভোগ করার সুযোগ দান করি তখন তারা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে, আর যখন তাদের কৃতকর্মের পরিণতি স্বরূপ তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তখন তারা একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে"।

কাফেরদের বিচিত্র চরিত্র

এ আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের বিচিত্র চরিত্রের একটি নমুনা পেশ করেছেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২২০
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২২১

আল্লাহ পাকের অবিরাম নাফরমানী, অকৃতজ্ঞতা এবং অবাধ্যতা কাফেরদের চরিত্রকে বিচিত্র করে তোলে, যখন তাদের প্রতি আল্লাহ পাক দয়া করেন এবং তাদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন তখন তারা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে, এভাবে দম্ভ প্রকাশ করে যেন মাটিতে তাদের পা পড়েনা, পৃথিবীতে তারা বাড়াবাড়ি এবং অশান্তি সৃষ্টি করে, মনে হয় এ পৃথিবী তাদেরই, এসব কিছু যেন তাদের আয়ত্বাধীন, এক কথায় আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। পক্ষান্তরে তাদের অন্যায়-অনাচারের শোচনীয় পরিণতি স্বরূপ যখন তাদের উপর বালা-মসিবত যথা ঝড়-তুফান, বন্যা-ভূমিকম্প, প্লেগ-মহামারী প্রভৃতি আপতিত হয় তখন তারা একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে। কাফের-মুশরেকদের অবস্থা সত্যিই বিচিত্র।

মোমেনের অবস্থা বিস্ময়কর

পক্ষান্তরে, মোমেনদের অবস্থা এ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মোমেনগণ যখন আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করে তখন তারা আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কেননা তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে আমাদের জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব এক আল্লাহ পাকেরই দান কিন্তু কখনো যদি মোমেন বিপদগ্রস্ত হয় তখন সে সবর অবলম্বন করে, আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই তা করে, কেননা ঐ বিপদও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পরীক্ষা স্বরূপই হয়।

এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের অবস্থা বিস্ময়কর, তার জন্যে আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটি হুকুমই উত্তম, যখন সে আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করে তখন আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে, আর এ শোকরগুজারীও তার জন্যে হয় কল্যাণকর। আর যখন কোন মোমেন বিপদগ্রস্ত হয় তখন সে সবর অবলম্বন করে, আর এ সবরও তার জন্যে হয় কল্যাণকর।[১]

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط

"তারা কি লক্ষ্য করেনা যে আল্লাহ পাক যার জন্যে ইচ্ছা করেন তার রিয্ক প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে পরিমিত পরিমাণে দান করেন"।

সুঃখ-দুঃখ আল্লাহ পাকেরই নিয়ন্ত্রণে

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, যদি তাদেরকে সমৃদ্ধি দান করা হয় তবে তারা উল্লাসে ফেটে পড়ে, আর যদি তাদেরকে অভাবগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত করা হয় তবে তারা একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তাদের দেখা উচিত সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী মানুষ মাত্রকে। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, দুনিয়ার নেয়ামত, সুখ-সামগ্রী সব কিছু

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা ২১, পৃষ্ঠা-৩২

এক আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সমৃদ্ধি দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত করেন। এ কাফেররা এসব কি লক্ষ্য করেনা? তাদের জানা উচিত সুখ-দুঃখ একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সুখী করেন বা দুঃখী করেন।

অতএব, সুখী হলে দাম্ভিক হওয়ার কোন যুক্তি নেই; বরং ঐ সুখের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করাই একান্ত কর্তব্য। পক্ষান্তরে দুঃখী হলে নিরাশ হওয়ারও কোন কারণ নেই, কেননা আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে দুঃখকে সুখে পরিবর্তন করতে পারেন।

অতএব, নিরাশ হওয়া নয়; বরং কৃত অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করা কর্তব্য। বস্তুতঃ মোমেন বন্দাগণ সমৃদ্ধি লাভ করলে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজারী কর্তব্য মনে করে, আর যদি কোন দুঃখ আপতিত হয় তবে আল্লাহর রহমতের আশায় সবর অবলম্বন করে। মোমেন বন্দা কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়না, কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

(সূরা যুমার)

“(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে আমার সে সব বন্দাগণ! তোমরা যারা অন্যায়-অনাচারের কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা”।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَايْئَسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُونَ

(সূরা ইউসুফ)

“আর তোমরা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, কেননা কাফের ব্যতীত কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়না”।

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ○

“নিশ্চয় সমৃদ্ধি এবং দারিদ্রে মোমেনদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে”, কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের বহিঃপ্রকাশ হয়। এতদ্ব্যতীত, কাউকে সমৃদ্ধি দান করে পরীক্ষা করা হয়, সে কৃতজ্ঞ হয় কি অকৃতজ্ঞ, এমনিভাবে কাউকে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত করে পরীক্ষা করা হয় যে সে সবর অলম্বন করে নাকি নিরাশ হয়ে পড়ে। এমনিভাবে সমৃদ্ধি দানের মাধ্যমে এ পরীক্ষাও করা হয় যে, সুখ-সামগ্রী লাভ করে কে আল্লাহকে ভুলে যায়, আর কে শোকর গুজারীতে মশগুল হয়। বিশেষতঃ কাফেরদেরকে দুনিয়ার সম্পদ এজন্যে দেয়া হয় যেন তাদের অন্যায়ের ঘট পূর্ণ হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

(সূরা তোয়াহা)

"(হে রসূল!) কাফেরদেরকে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য দান করা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে রাখার জন্যেই তা দেয়া হয়েছে। আর আপনার প্রতিপালকের রিয্ক অতি উত্তম"।

এমনকি, আল্লাহ্ পাক যে সব কাফেরকে দুনিয়ার ক্ষমতা এবং সম্পদ দান করেন, তা-ও তাদের জন্যে রহমত নয়; বরং চির শাস্তিরই পূর্ব লক্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۗ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

(সূরা আলে-এমরান)

"(হে রসূল!) কাফেরদের অবাধ বিচরণ যেন আপনাকে প্রতারিত না করে, কেননা এটি সামান্য ভোগ মাত্র, এরপর তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হলো দোযখ, আর তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল"।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কয়েকটি বিষয় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

এক, দুনিয়ার সম্পদ ও সমৃদ্ধি এবং দারিদ্র তথা সুখ দুঃখ এক আল্লাহ পাকেরই নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনিই মানুষকে সুখী করেন অথবা দুঃখী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দুনিয়ার সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে দারিদ্রের মধ্যে ফেলে রাখেন।

অতএব, যা কিছু চাওয়ার তা তাঁর কাছেই চাইতে হবে, আর শুধু তাঁর কাছেই আশা করতে হবে।

দুই, এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, মা'বুদ বা উপাস্য একমাত্র তিনিই আর কেউ নয়।

তিন, সুখ-সামগ্রী সর্বক্ষেত্রে রহমত স্বরূপ হয়না; বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা পরীক্ষা। অতএব, সুখ-সামগ্রী লাভ করে দাম্ভিক হতে নেই; বরং কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আর দারিদ্র্যের কারণে নিরাশ হতে নেই; বরং আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করতে থাকা উচিত।

চার, কাফের-মুশরেক এবং মুরতাদদের সম্পদ দেখে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়; কেননা, ক্ষণভঙ্গুর এ জীবনেই তাদের এ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এরপর চিরস্থায়ী দোযখের শাস্তি তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ
الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ
اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠
فِيْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ
تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿۳۹﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ
خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ
شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ﴿۴۰﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۴۱﴾

তরজমা

(৩৮) অতএব, তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক্ব দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও পথিক মুসাফিরকেও, এটি উত্তম পন্থা তাদের জন্যে যারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি কামনা করে, আর তারাই হবে সফলকাম।

(৩৯) আর তোমরা যে সম্পদ সুদ হিসেবে প্রদান করবে যে তা মানুষের সম্পদে মিশে বর্ধিত হবে, তবে আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টিতে তা বর্ধিত হয়না। আর তোমরা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে যে যাকাত প্রদান করবে তাই বৃদ্ধি পায়। আর তারাই সমৃদ্ধশালী।

(৪০) তিনিই আল্লাহ্ পাক যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে রিয্ক দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, তোমাদের দেব-দেবীদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এ সমস্ত কাজের কোন একটিও করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে আল্লাহ্ পাক তা থেকে পবিত্র ও মহান।

(৪১) মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সামুদ্রিক ভাগে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, যাতে করে মানুষ ফিরে আসে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা স্বাদ ভোগ করাতে চান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে আল্লাহ পাকই যাকে ইচ্ছা তার রিযক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন। অর্থাৎ রিযক সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, অতএব মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রদত্ত রিযক তাঁর হুকুম মোতাবেক ব্যয় করা। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক্ব দিয়ে দাও, এমনিভাবে যারা সমাজে দারিদ্র-প্রপীড়িত, অনাথ-বিপদগ্রস্ত, নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব, যাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় মিসকীন বলা হয়, তাদেরকেও সাহায্য কর। আর যারা বিপদগ্রস্ত পথিক মুসাফির, যাদের হয়তো বাড়ী-ঘরে অর্থ-সম্পদ রয়েছে কিন্তু ভ্রমণরত অবস্থায় তারা আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, তাদেরকেও সাহায্য কর। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ

"অতএব, আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক্ব দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও পথিক মুসাফিরকেও"।

মূলতঃ আসমান জমীনের তথা নিখিল বিশ্বের মালিক খালেক একমাত্র আল্লাহ পাক, সমগ্র বিশ্বের সব কিছুই আল্লাহ পাকের দান, অতএব তাঁর দানের জন্যে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেমন মানুষের কর্তব্য, ঠিক তেমনি দানের সদ্ব্যবহার করা তথা আল্লাহ পাক প্রদত্ত দানের ব্যবহার-বিধি মেনে চলাও মানুষের কর্তব্য। এজন্যেই তিনি আত্মীয়-স্বজনকে, এতীম-মিসকীনকে এবং বিপদগ্রস্ত পথিক-মুসাফিরকে দান করার আদেশ দিয়েছেন।

ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

"এটি উত্তম পন্থা তাদের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তারাই অবশেষে হবে সফলকাম"।

শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশেই হতে হবে দান খয়রাত

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শুধু দীন-দরিদ্র মানুষকে দান করাই যথেষ্ট নয়; বরং এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দান করা পূর্বশর্ত। যারা দানের বিনিময়ে সুনাম-সুখ্যাতি কামনা করে, তাদের দান আল্লাহ পাকের মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انما الاعمال بالنيات

"আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে আমলকারীর নিয়তের উপর"।

অতএব, আল্লাহর রাহে দান করা যেমন জরুরী, তেমনি দানের পেছনে এক আল্লাহ

পাকের সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করাও একান্ত জরুরী।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সেলায়ে রেহমী করার এবং মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। মিসকীন সে ব্যক্তিকে বলা হয় যার কিছুই নেই, অথবা কিছু আছে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর সে সব লোকের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে প্রয়াসী এবং তাঁর দীদারের কাঙ্গাল। নিশ্চয় এটি তাদের জন্যে এক বিরাট নেয়ামত। দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে এমন লোকেরাই হবে সফলকাম। এজন্যে যারা প্রকৃত মোমেন, তারা আল্লাহর রাহে দান করতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করেনা। যারা ভাগ্যবান, তারাই আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরকে দান করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনা করে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই রিয্ক বাড়িয়ে দেন বা কমিয়ে দেন, তাই আল্লাহর রাহে দান করা থেকে বিরত থাকা অনুচিত। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর নেয়ামত বাড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলে তা কমবে না, আর যদি তিনি রিয্কহ্রাস করেন তবে দান করা থেকে বিরত থাকলেও তা বাড়বেনা।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেনঃ ঈমান দু'টি ভাগে বিভক্ত। এক, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেয়া, দুই, আল্লাহ পাকের সৃষ্টির প্রতি দয়া করা।

অতএব, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষকে সাহায্য করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ পর্যায়ে প্রথম হক্ব হলো আত্মীয়-স্বজনের, এরপর সমাজের দুর্বল অংশ মিসকীনদের এবং এরপর পথিক-মুসাফিরের।[২]

আলোচ্য আয়াতের তফসীরের আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ যদিও এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, তবু এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সকল মোমেনকে।

আর হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে প্রত্যেক পাঠক এবং শ্রোতাকে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) আরো বলেছেনঃ এ আয়াতে বিশেষভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং আত্মীয়-স্বজন বলতে বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মোত্তালিবকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত নাজিল হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে ফোদকের বাগানটি দান করেন।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯ পৃষ্ঠা-২২২
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২৫,পৃষ্ঠা-২২৪

"আর তোমরা যে সম্পদ সুদ হিসেবে প্রদান করবে, এ উদ্দেশে যে তা মানুষের সম্পদে মিশে বর্ধিত হবে, তবে (মনে রেখো) আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে তা বর্ধিত হয় না"।

তফসীরকারগণ এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ সাঈদ এবনে জুবায়ের (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), তাউস (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) সহ অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেনঃ এর অর্থ হলো কোন ব্যক্তি যদি অপেক্ষাকৃত অধিকতর বা উত্তম প্রতিদানের আশায় কাউকে কোন জিনিস দান করে বা উপহার দেয়, এমন দান-খয়রাত শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হলেও প্রশংসনীয় নয়। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন এর কোন সওয়াব পাওয়া যাবেনা, নেককারদের পক্ষে তা অশোভন, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে তা ছিল অবৈধ।

তফসীকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো কোন ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে এ উদ্দেশে অর্থ-সম্পদ বা অন্য কিছু উপহার স্বরূপ দেয় যে ঐ ব্যক্তি থেকে বাড়তি কিছু পাওয়া যাবে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সে দেয়না।

শা'বী (রঃ) বরেছেন, এর দ্বারা সে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে কোন লোকের সেবায় নিয়োজিত থাকে, সর্বদা তার সঙ্গে থাকে, আর ঐ ব্যক্তি তার ব্যবসায়ের লাভের কোন অংশ দান করে। এ দানের আখেরাতে কোন সওয়াব হবেনা। কেননা, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দেয়নি; দিয়েছে নিজের স্বার্থোদ্ধারের খাতিরে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের ربا শব্দটি সুদ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে অর্থ বৃদ্ধির লোভে যারা মানুষকে অর্থ-সম্পদ দেয় তথা যারা সুদের ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে, প্রকাশ্য দৃষ্টিতে তাদের লাভ দেখা গেলেও আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে তা লাভ নয়, চরম ক্ষতি কেননা মানবতার সমাধির উপরই সুদখোরদের সৌধ গড়ে উঠে, সুদের কারণে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও মনুষত্বকে বর্জন করতে হয়। তাই পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

(সূরা বাকারা)

وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ

আর সদকা-খয়রাতকে বাড়িয়ে দেন।

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ○

"আর তোমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে যে যাকাত প্রদান করবে, তা বৃদ্ধি পাবে, আর তারাই হবে সমৃদ্ধশালী'।

এখানে উল্লেখ্য, যাকাত আদায়ে দান-খয়রাতে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে অর্থ-সম্পদ কমে যায়

কিন্তু এর দ্বারা আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হয় এবং এর বরকতে অর্থ-সম্পদে বরকত হয়, দুর্গত মানবতার সেবা হয়, মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি হালাল পন্থায় অর্জিত একটি খেজুর সদকা দেয়, করুণাময় আল্লাহ পাক তাঁর ডান হাতে তা গ্রহণ করেন, আর সে দানকে তিনি এভাবে লালন-পালন করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়া বা উষ্ট্রের বাচ্চাকে লালন-পালন করে, এমনকি সে খেজুরটি ওহোদ পাহাড়ের সমান বড় হয়ে যায়।

লক্ষ্যণীয়, মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন নগ্ন থাকে, কোন জ্ঞান তার থাকেনা, শ্রবণ শক্তিও থাকেনা, সে দেখতেও পারেনা, এক কথায় তার কোন প্রকার শক্তিই থাকেনা, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আল্লাহ পাক তাকে সব কিছুই দান করেন।[১]

আয়াতের মর্মকথা

আয়াতের মর্মকথা এই, যদি কোন ব্যক্তি অন্য মানুষকে কিছু দান করে, আর এ দানের উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ হয়না; বরং যে ব্যক্তিকে দিয়েছে, তার কাছ থেকে বাড়তি কিছু আশা করে তবে এ দানের জন্যে কোন সওয়াব হবেনা। অথবা যদি কেউ নিজেকে দানবীর হিসেবে প্রকাশ করার উদ্দেশে তথা লোক দেখানোর উদ্দেশে দান করে তবে তাতেও সওয়াব হবেনা। সওয়াব হবে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দান করলে।

দ্বিতীয়তঃ যারা লাভের উদ্দেশে সুদের ব্যবসায়ে শরীক হয়, তাদের লাভ হওয়া তো দূরের কথা তারা চরম ক্ষতি এবং বিপদের সম্মুখীন হয়।

তৃতীয়তঃ সদকা-খয়রাতে, যাকাত আদায়ে অর্থ-সম্পদ কমেনা; বরং বৃদ্ধি পায়।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ

"তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে রিযক দান করেছেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, তোমাদের দেব-দেবীদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এ সমস্ত কাজের কোন একটিও করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ পাক তা থেকে পবিত্র ও মহান"।

তওহীদের প্রমাণ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি শুধু স্রষ্টাই নন; বরং রিযক দাতাও। আর এ জীবনই শেষ নয়; বরং এ জীবনের অবসানও ঘটাবেন তিনি মৃত্যুর মাধ্যমে, এরপর পুনর্জীবন দান করবেন। যারা মানবতার কলংক পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করে তাদের ভেবে দেখা দরকার, তারা যাদেরকে শরীক

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৩৩

মনে করে তারা কি উপরোল্লিখিত কাজগুলোর কোন একটিও করতে পারে? বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শেরক করার ন্যায় ঘৃণ্য অপরাধ আর কিছুই হতে পারেনা।

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

"তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ্ পাক তা থেকে পবিত্র ও মহান"।

পূর্ববর্তী আয়াতে সর্ব প্রথম স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনিই তোমাদের স্রষ্টা এবং তিনিই তোমাদের রিযক দাতা। এরপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তিনিই আবার পুনর্জীবন দান করবেন। জীবন ও মৃত্যুর সব কিছু এক আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে নিহিত, এখানেই তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা, এতে কেউ তাঁর শরীক নেই। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

"তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ্ পাক তা থেকে পবিত্র ও মহান"।

এ আয়াতে কাফের-মুশরেকদের উদ্দেশে অতি সহজ ও সরল ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে তোমরা নিজেদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য কর, এ জীবন কার দান? তোমাদেরকে কে রিয্ক দান করে? কার আদেশক্রমে তোমাদের মৃত্যু হয়? যাদেরকে তোমরা পূজনীয় মনে কর এসব কাজে তাদের কোন হাত আছে কি? বরং তোমাদের দেব-দেবীদের নির্মাণে তোমাদের হাত আছে। অতএব, আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক কর কোন্ যুক্তিতে? তিনি শেরক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি মহান, তিনি স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্ক দাতা, তিনিই ভাগ্য-নিয়ন্তা, তাঁর আদেশ সর্বত্র কার্যকর, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

এটিই তওহীদ আর এটিই মহাসত্য।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

"মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সামুদ্রিকভাগে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, যাতে করে মানুষ ফিরে আসে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা স্বাদ ভোগ করাতে চান"।

যেহেতু অনেক মানুষ স্বভাব-ধর্ম ইসলামকে মেনে নেয়নি এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পথ পরিহার করেছে, পরিণামে সমগ্র সৃষ্টি জগতে অশান্তি বিরাজ করছে। পৃথিবীর কোথাও কারো জান-মালের নিরাপত্তা নেই, অশান্তি-উচ্ছৃংখলতা এবং উৎপাতের দাবানলে সমগ্র বিশ্ব জগৎ জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র পৃথিবী অন্যায়-অনাচার,

জুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। তখন আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অশান্তি-অকল্যাণ দূরীভূত হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের بر শব্দটির অর্থ হলো মরুভূমি আর بحر দ্বারা সে সব শহর উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা নদীর তীরে অবস্থিত।

আতীয়্যা (রঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে যত শহর রয়েতেছ সবই بر এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির তাৎপর্য হলো আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে, আর সামুদ্রিক ভাগে অশান্তির তাৎপর্য হলো, হযরত মুসা (আঃ)-এর যুগে জালেম রাজা জলনদী মানুষের নৌকাগুলো ছিনিয়ে নিত, যেমন কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ○ (সূরা কাহফ)

“ঐ জালেম বাদশাহ প্রত্যেকটি নৌকা জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিত”।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির তাৎপর্য হলো পূর্বে সমগ্র বিশ্ব শস্য-শ্যামলিমায় ভরপুর ছিল, মানুষ কোন বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়ে গমন করলে তাকে ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ পেত, আর সমুদ্রের পানিও ছিল সুমিষ্ট এবং কোন বাঘ গাভী ও বকরীর উপর আক্রমণ করতো না। কিন্তু যখন কাবিল হাবিলকে হত্যা করলো তখন সমগ্র পৃথিবী শুষ্ক হয়ে গেল। বৃক্ষগুলোতে কাঁটা সৃষ্টি হলো এবং সমুদ্রের পানি লবনাক্ত হয়ে গেল। আর জন্তুগুলো একে অন্যকে আক্রমণ করতে লাগল।

بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

অর্থাৎ মানুষের এ সমস্ত অশান্তি অকল্যাণ তাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ মক্কাবাসী একবার দুর্ভিক্ষে জর্জরিত হয়েছিল, এমনকি মানুষ মানুষের গোশ্‌ত খেতে বাধ্য হয়েছিল, এর কারণ ছিল মানুষের পাপাচার।

لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

“যাতে করে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা স্বাদ তারা ভোগ করে”।

অর্থাৎ তারা অন্যায়-অনাচারের শাস্তি ভোগ করে এবং তওবা করে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র পৃথিবী গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, জুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল, মানুষ শুধু আকৃতিতেই মানুষ ছিল কিন্তু প্রকৃতিতে ছিল

অমানুষ, মানব-ইতিহাসের এমনি চরম দুর্দিনেই আগমন করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তিত হয়ে গেল। জগতের চেহারা বদলে গেল। মূর্খতা ও বর্বরতার অমানিশা কেটে গেল। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হয় আল্লাহর নাফরমানী তথা পাপাচারের মাধ্যমে। অতএব, পাপাচারীরাই হলো যাবতীয় অশান্তি-অকল্যাণের বাহক। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাকের এবাদত এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবু দাউদ শরীফে সংকলিত একখানি হাদীস শরীফে রয়েছে, পৃথিবীতে যদি কোন অপরাধের শরীয়ত নির্দেশিত শাস্তি কায়েম হয় তবে তা বিশ্ববাসীর জন্যে চল্লিশ দিন যাবত বৃষ্টিপাতের চেয়েও অধিকতর কল্যাণকর হয়। কেননা, শাস্তি কায়েম হলে মানুষ অপরাধ বা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। যখন গুনাহ হবে না তখন আসমান এবং জমীনের বরকত সমূহ অর্জিত হবে। তাই শেষ যমানায় যখন হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন এবং ইসলামী শরীয়ত সম্পূর্ণভাবে কায়েম হবে তখন জমীনের প্রতি আদেশ হবে যে তোমার বরকত সমূহ বের করে দাও, তখন একটি আনার একদল লোকের খাদ্য হিসেবে যথেষ্ট হবে, আর ঐ আনারটির খোসার ছায়ায় সে সমস্ত লোক আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর একটি উষ্ট্রীর দুধ একটি গোত্রের সমস্ত লোকের জন্যে যথেষ্ট হবে। এ সমস্ত বরকত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীয়ত বা আদর্শের বাস্তবায়নের কারণেই হবে। সুবিচার যত বৃদ্ধি পাবে, বরকত এবং কল্যাণ ততই বৃদ্ধি পাবে।

মসনদের আহমদে লিপিবদ্ধ আছে, যিয়াদের যুগে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল, তাতে কিছু গম ছিল, ঐ গমগুলো খেজুরের বড় দানার সমান ছিল, ঐ থলেতে লেখা ছিল, এমন বড় বড় গম তখনই উৎপন্ন হতো যখন পৃথিবীতে সুবিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلُ ۗ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ
الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ
يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

তরজমা

(৪২) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছে, তাদের অনেকেই ছিল মুশরেক।

(৪৩) অতএব, তুমি সরল সঠিক দ্বীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, এমন দিন আসার পূর্বে যেদিন আল্লাহর তরফ থেকে অপসারিত হবেনা, সেদিন সমস্ত মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। যে কাফের হয়েছে, তার কুফরের শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যারা নেক আমল করে, তারা নিজেদেরই জন্যে তৈরী করে সুখ-শয্যা।

(৪৪) কেননা যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে নিজ দানে ধন্য করতে চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে শেরক-কুফর ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এসব ঘৃণ্য পাপাচারের শাস্তি শুধু যে আখেরাতেই হবে তা নয়; বরং দুনিয়াতেও বন্যা, ভূমিকম্প, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বালা-মসিবতের মাধ্যমে এর শাস্তি হতে পারে। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ سِيرُوا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ط

(হে রসূল!) যদি কাফেররা সত্য মেনে নিতে রাজী না হয়, তবে আপনি তাদেরকে বলুন যে তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং চক্ষু খুলে দেখ, ইতিপূর্বে যারা মুশরেক ছিল, যারা পাপাচারী ছিল, যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ কর। পবিত্র কোরআনের সূরা ওয়াল ফাজরে আল্লাহ্ পাক কয়েকটি কোপগ্রস্ত জাতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ○ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ○ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ○ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ○ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ○ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ○ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ○ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ○ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ○

এ আয়াত সমূহে একথাই এরশাদ হয়েছে যে, আদ জাতি, সামুদ জাতি এবং মিশরের ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়- এরা সবাই অত্যন্ত শক্তিমান ছিল। এক কালে তারাই এ দুনিয়ায় রাজত্ব করেছে, তারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হয়েছে, তাই তিনি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। তাদের ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য সব কিছুই তারা ধরা-পৃষ্ঠে রেখে গেছে এবং অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে তারা হয়ে রয়েছে এক শিক্ষনীয় নির্দশন।

অতএব, (হে রসূল!) আপনি এ মুশরেকদেরকে বলুন, তারা যেন পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে এবং পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরেক। এর অর্থ হলো তাদের অন্যান্য গুনাহও ছিল কিন্তু শেরক তন্মধ্যে জঘন্যতম ছিল, এজন্যে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। অথবা এর অর্থ হলো, অনেক লোকের মধ্যেই শেরক ছিল, আর যাদের মধ্যে শেরক ছিলনা কিন্তু মুশরেকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল এবং তারা সত্যের নির্দেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করেনি, এজন্যে মুশরেকদের সঙ্গে তাদেরকেও ধ্বংস করা হয়েছে, এভাবে শেরকের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পাপাচারের শাস্তিও তারা ভোগ করেছে।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ

"অতএব, তুমি সরল সঠিক দ্বীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, এমন দিন আসার পূর্বে যেদিন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অপসারিত হবেনা"।

فَاَقِمْ

এ শব্দটি দ্বারা কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে দু'টি মত পোষণ করেন।

(এক) পবিত্র কোরআনের পাঠক-শ্রোতা মাত্রকেই এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেকেরই কর্তব্য হলো কেয়ামতের দিনের ঘোষণার পূর্বেই সরল সঠিক ধর্মে মনোনিবেশ করা তথা স্বভাব-ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যত্নবান হওয়া।

(দুই) এ শব্দটি দ্বারা স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ মর্মে যে হে নবী! কাফেররা যা কিছু করুক, আপনি তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন এবং সরল সঠিক দ্বীন তথা ইসলামের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করুন। মক্কার কাফেররা যদি দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত থাকে তবে তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে আপনি ইসলামের পূণ্য পন্থা প্রদর্শন করতে থাকুন। কেয়ামতের কঠিন দিন আসার পূর্বেই এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে থাকুন। কেয়ামতের দিন অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য, সেদিন অবশ্যই আসবে।

يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ○

সেদিন সকলেই পৃথক হয়ে যাবে, অর্থাৎ নেককার বদকার যেভাবে দুনিয়াতে এক সঙ্গে থাকে কেয়ামতের দিন তা হবেনা, বরং ঈমানদার ও নেককাররা বেহেশতে চলে যাবে, আর কাফের-মুশরেক, বে-দ্বীন-মুরতাদ তথা পাপীষ্ঠরা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। যারা কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে, পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার ও নেককার হয়, তারা নিজেদেরই উপকার করে। ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয় বেহেশতের মনোরম বাগানে।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ

কেননা যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে নিজ দানে ধন্য করতে চান।

কেয়ামতের দিন লোকেরা বিভিন্ন দলে এজন্যে বিভক্ত হবে যে আল্লাহ্ পাক ঈমানদার ও নেককার লোকদেরকে পুরস্কৃত করতে চান।

নাজাতের জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত

সর্বপ্রথম নাজাতের জন্যে যা একান্ত জরুরী তা হলো ঈমান, ঈমান ব্যতীত কোন আমলই আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। আর ঈমান হলো আল্লাহ্ পাকের তওহীদ বা একত্ববাদের প্রতি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি ও সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, এই ঈমান ব্যতীত নাজাতের কথা অকল্পনীয়। যদি কারো খাঁটি এবং পরিপূর্ণ ঈমান থাকে তবে তার নেক আমল গ্রহণযোগ্য হবে, আর এমন লোককে আল্লাহ্ পাক তাঁর দানে ধন্য করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে নেক আমল করে, তার নেক আমলের যা সওয়াব তার প্রাপ্য হয় আল্লাহ্ পাক তার চেয়ে অনেক বেশী তাকে দিতে চান।

مِنْ فَضْلِهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের দান এবং অনুগ্রহেই তিনি নেককারদেরকে ধন্য করতে চান। বস্তুত আমলের সওয়াব প্রদান করা আল্লাহ্ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। নেক আমলের মাধ্যমে সওয়াব লাভ হওয়া জরুরী নয়। ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর 'আয্ জোহদ' গ্রন্থে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন এ মর্মে যে আমার নেক বন্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর, তারা যেন অহংকার না করে এবং নিজেদের আমলের উপর ভরসা না করে, কেননা আমার বন্দাদের মধ্যে এমন কোন বন্দা হবেনা যাকে আমি হিসাব-নিকাশের জন্যে দাঁড় করাবো আর তার ব্যাপারে আমি ন্যায়-বিচার করবো, এমন অবস্থায় সে আমার আযাব থেকে বেঁচে যাবে, বরং যে নেককার বন্দাকেই আমি হিসাবের জন্যে দাঁড় করাবো এবং তার প্রতি আমি ন্যায়-বিচার করবো, তবে তাকে আমি অবশ্যই আযাব দেব।

আবু নাঈম হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক বণী ইসরাঈলের একজন নবীর নিকট এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে নিজের উম্মতের নেককার বন্দাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নেক আমলের উপর ভরসা না করে। কেননা কেয়ামতের দিন আমি যে বন্দাকে হিসাবের জন্যে দাঁড় করাবো, তাকে আমি আযাব দেয়ার ইচ্ছা করবো, তাকে আযাব দিয়ে

দেব (আর তা জুলুম হবেনা ন্যায় বিচার হবে)। আর নিজের উম্মতের গুনাহগারকে বলে দাও তারা যেন নিরাশ না হয়। আমি অনেক বড় বড় গুনাহকেও মাফ করে দেই।

তেবরানী হযরত ওয়াসেলা এবনে আসকারের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এমন এক বন্দাকে হাযির করবেন যার কোন গুনাহ থাকবেনা। আল্লাহ পাক তাকে বলবেন, দু'টি কথার মধ্যে তুমি কোন্‌টি পছন্দ কর? তুমি কি তোমার আমলের বদলা চাও অথবা তুমি কি আমার দান গ্রহণ করতে চাও? তখন বন্দা আরজ করবে, হে আল্লাহ! তুমি সম্পূর্ণ অবগত যে আমি কখনও তোমার নাফরমানী করিনি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমার বন্দার নেক আমল সমূহের হিসাব করে আমার একটি নেয়ামতের মোকাবেলা কর, যখন তা করা হবে তখন ঐ ব্যক্তির সারা জীবনের সমস্ত নেক আমল একটি নেয়ামতের মোকাবেলায় শেষ হয়ে যাবে। এরপর আর কোন নেক আমল অবশিষ্ট থাকবেনা, অবশেষে বন্দা আরজ করবে তোমার দয়া ও রহমতের আমি ভিখারী।

বাজ্জার হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে তিনটি নথি খোলা হবে, একটিতে সমস্ত নেক আমলের বিবরণ থাকবে, দ্বিতীয়টিতে সমস্ত গুনাহ লিপিবদ্ধ থাকবে, আর তৃতীয়টিতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের বিবরণ স্থান পাবে। আল্লাহ পাক সবচেয়ে ক্ষুদ্র একটি নেয়ামত নিয়ে এরশাদ করবেন, এ বন্দার সমস্ত নেক আমলের মোকাবেলা কর। ঐ ক্ষদ্র নেয়ামতটি সমস্ত জীবনের নেয়ামত সমূহকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে, নেয়ামত সমূহের নথি বলবে, তোমার সম্মানের কসম করে বলি, এখনও আমি সম্পূর্ণটি পরিবেষ্টন করিনি, অথচ সমস্ত নেক আমল শেষ হয়ে গেছে এবং গুনাহ অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু যখন আল্লাহ পাক কোন বন্দার প্রতি দয়া করতে চাইবেন তখন তিনি এরশাদ করবেন, হে বন্দা! আমি তোমার নেকী সমূহকে দ্বিগুণ ত্রিগুণ করে দিয়েছি এবং তোমার গুনাহ সমূহকে মাফ করে দিয়েছি। আর আমার নেয়ামত সমূহ তোমাকে দান করেছি।

মূলতঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের রহমত ও বিশেষ দান ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকবেনা। যে আল্লাহ পাকের ফজল বা দানে ধন্য হবে সে দোযখের শাস্তি থেকে নাজাত পাবে, এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে من فضله বাক্যটি সংযোজিত হয়েছে। তেবরাণী "আল আওসাতে" হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লো এবং পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে একথার অঙ্গীকার করলো, আল্লাহ পাকের নিকট তার জান্নাতে প্রবেশের একটি অঙ্গীকার হয়ে গেল, আর যে ব্যক্তি সোবহানাল্লাহ পাঠ করলো অর্থাৎ সে আল্লাহ পাককে সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি-খুঁত থেকে পবিত্র মনে করলো এবং একথার অঙ্গীকার করলো, তবে এ বাক্যটির কারণে তার আমলনামায় এক লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে। এক ব্যক্তি তখন আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ অবস্থায় আমরা কি করে ধ্বংস হতে পারি? (অর্থাৎ আমাদের প্রতি আযাব হতে পারেনা) তখন

তিনি এরশাদ করলেনঃ শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, কেয়ামতের দিন মানুষ পাহাড়ের চেয়েও ভারী নেক আমল নিয়ে হাযির হবে কিন্তু এসব কিছু বন্দার প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের মধ্যে যে কোন একটির মোকাবেলায় নিঃশেষ হয়ে যাবে। যা কিছু হবে তা শুধু আল্লাহ পাকের দয়া এবং মেহেরবানীতেই হবে, তিনি সেদিন স্বীয় রহমতে যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষা করবেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা সঠিক ভাবে চল, পরস্পর কাছাকাছি থাক এবং সন্তুষ্ট হও, মনে রেখ কোন লোককে তার আমল জান্নাতে নিয়ে যাবেনা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনিও (অর্থাৎ নিজের আমলের কারণে আপনিও জান্নাতে যাবেন না)? তিনি এরশাদ করলেনঃ আমিও না তবে আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর মাগফেরাত এবং রহমত দ্বারা ঢেকে রাখবেন।

মুসলিম শরীফে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে এবং হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (তোমাদের কর্মের ফলশ্রুতি স্বরূপ তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর) এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে মোমেনগণ তাদের আমলের কারণে জান্নাতে যাবে।

তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, আমলের পার্থক্যের কারণে জান্নাতের মর্তবায় পার্থক্য হবে। আর উচ্চ মর্তবা অর্জন আমলের কারণেই সম্ভব হবে কিন্তু প্রাথমিকভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং তাতে চিরদিন থাকা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের দান এবং রহমতেই সম্ভব হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ পাকের দরবার থেকে ক্ষমা লাভের কারণেই পুলসেরাত পার হবে। আর আল্লাহ পাকের রহমতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জান্নাতে বিভিন্ন মর্তবার বিতরণ আমল মোতাবেক হবে।

আবু নাঈম আওন এবনে আবদুল্লাহর সূত্রে একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বস্তুতঃ আখেরাতে নাজাত লাভ হবে শুধু আল্লাহ পাকের দানে। তিনি পরম করুণাময়, অনন্ত অসীম দয়ালু, তাঁর দয়া ও মেহেরবানীতেই হবে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চির শান্তি, চির মুক্তি।

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না"।

কেননা তারা সর্বদা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেছে, তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত দেখেছে কিন্তু তবু তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি এবং

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২২৭-২৮

তাঁর দানের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। তাই আখেরাতে কাফের-মুশরেকরা আল্লাহ পাকের রহমত ও অনুগ্রহের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং তাদের অপরাধের শাস্তি তারা ভোগ করবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ
اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ
الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَ
لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا
عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ
كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ
كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾

তরজমা

(৪৫) আর আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে তিনি সুসংবাদ বহনকারী বাতাস প্রবাহিত করেন এবং তিনি চান তোমরা যেন তাঁর রহমতের কিছু ভোগ কর; আর তাঁর আদেশে যেন জাহাজ চলে এবং তোমরা তাঁর দান অন্বেষণ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক।

(৪৬) আর (হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে রসূলগণকে প্রেরণ করেছি তাদের নিজ নিজ জাতির নিকট, তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল; এরপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম; আর মোমেনদেরকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।

(৪৭) আল্লাহ পাকই বায়ু মণ্ডলী পরিচালিত করেন; ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, এরপর তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা আসমানে ছড়িয়ে দেন। পরে তাকে স্তরের পর স্তর করে রাখেন, এরপর তুমি দেখতে পাও যে তা থেকে বারিধারা নির্গত হতে থাকে, আবার

যখন তিনি তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা তা পৌঁছে দেন তখন তারা আনন্দ করতে থাকে।

(৪৮) যদিও তারা ইতিপূর্বে তাদের প্রতি বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ্ পাক কাফের-মুশরেকদেরকে পছন্দ করেন না; কেননা তারা তাঁর কুদরত-হেকমতের বিস্ময়কর নিদর্শন দেখেও তাঁর প্রতি বিশ্বাস করেনা। আর ইতিপূর্বে একথাও ঘোষাণা করা হয়েছে যে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে শেরক ও কুফরীর কারণে। তাই এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের কুদরতের আরও কিছু বিস্ময়কর নিদর্শনের উল্লেখ করা হচ্ছে, যা মানুষকে আল্লাহ পাকের তওহীদ বা একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অনুপ্রাণিত করে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيٰحَ مُبَشِّرٰتٍ

"আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের এটিও একটি নিদর্শন যে তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন"।

এ বায়ুই প্রথমে বৃষ্টিপাতের সুসংবাদ দিয়ে যায়। আর যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন মৃত শুষ্ক জমিন জীবন্ত হয়ে ওঠে, এর পাশাপাশি আল্লাহ পাকের আদেশ-ক্রমে সমুদ্র-বক্ষে জাহাজ চলাচল করে, উত্তাল তরঙ্গের মোকাবেলা করেও জাহাজগুলো তাদের গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। এভাবে তোমরা আল্লাহ পাকের রহমত লাভ কর। আল্লাহ্ পাকের কুদরত এবং মর্জিতেই তোমাদের জাহাজগুলো চলতে থাকে এবং তোমরা সমুদ্রের এপার-ওপার ভ্রমণ করতে পার এবং আল্লাহ পাকের দানের অন্বেষণ করতে পার, আর তোমরা যেন এ সমস্ত নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারের শোকর গুজার থাক। আর দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তোমরা এ শোকর গুজারীর ফলশ্রুতি লাভ কর। ইতিপূর্বে মানুষের কুফর, শেরক ও নাফরমানীর কারণে পৃথিবীর সর্বত্র অশান্তি উপদ্রবের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে পৃথিবীর স্থলে ও সামুদ্রিক ভাগে মানুষ আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়ে কতভাবে উপকৃত হয় তা উপলব্ধি করার এবং মহান দাতা আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের দানের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, এ সত্য উপলব্ধি করা যে আল্লাহ পাকের দান অনন্ত অসীম, আল্লাহ পাকের নাফরমানী পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূলের হেদায়েত মেনে চলা, কেননা রসূলের অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের রহমত লাভ করা যায় এবং আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের শোকর গুজারীর মাধ্যমে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়, পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

(সূরা ইব্রাহীম)

"যদি তোমরা আমার শোকর গুজার হও, তবে আমি তোমাদের নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেব"।

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দান ভোগ করার পরও এবং তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমত দেখা সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা; তাঁর প্রেরিত রসূলকে মানেনা, তাঁর আহবানে সাড়া দেয়না, সরল সঠিক জীবন-বিধান ইসলামকে গ্রহণ করেনা, এমন অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মন ব্যথিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ

"আর (হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে বহু রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের নিজ নিজ জাতির নিকট তারা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এরপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম, আর মোমেনদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য"।

অর্থাৎ যদিও কাফেররা আপনাকে মিথ্যা-জ্ঞান করছে, অবিশ্বাস করছে এমনকি বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিচ্ছে কিন্তু আপনি এ অবস্থাকে নতুন কিছু মনে করবেন না, বরং ইতিপূর্বে যুগে যুগে পৃথিবীতে বহু রসূল প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁদের উম্মত-ভুক্তরা তাঁদেরকে চরম কষ্ট দিয়েছে, অথচ তাঁদের নিকট ছিল তাঁদের সত্যতার সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ। নবী রসূলগণ তাঁদের উম্মতদেরকে অনেক বিস্ময়কর মোজেযাও প্রদর্শন করেছেন কিন্তু তারা ঈমান আনয়নে প্রস্তুত হয়নি; বরং নবী রসূলগণের প্রতি জুলুম-অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে।

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ط

"এরপর আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি"।

অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং নেমে এসেছে তাদের উপর আসমানী গজব।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

"আর মোমেনদেরকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য"।

অর্থাৎ যারা নবী রসূলগণের উপর ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি সাহায্য করেছি, কেননা মোমেনদের সাহায্য করা পূর্বে কৃত অঙ্গীকার মোতাবেক আমার কর্তব্য ছিল। নেককার বন্দাদের সাহায্য করা এবং অবাধ্য কাফেরদের শাস্তি প্রদান করা আল্লাহ পাকের চির শাশ্বত নীতি।

একটি প্রশ্ন

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বরেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানীতে মোমেনদের বিজয় প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মোমেনদের মোকাবেলায় কাফেররা কখনও বিজয় লাভ করতে পারবেনা, অথচ সর্ব ক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে মোমেনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের বিজয়ও লক্ষ্য করা যায়।

জবাব

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে المؤمنين শব্দটি দ্বারা সে সব মোমেনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম বুলন্দ করার লক্ষ্যে এবং শুধু তাঁর সন্তুষ্টির লাভের উদ্দেশে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে, আল্লাহ পাক তাদের সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আর এমন অবস্থায় মোমেনদের বিজয় সুনিশ্চিত। তবে তাৎক্ষণিক ভাবে বিজয়ী হওয়া জরুরীও নয়। কখনও দেখা যায় প্রাথমিক ভাবে বিজয় হয় না কিন্তু অবশেষে বিজয় সূচিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ষষ্ঠ হিজরীতে হোদাবিয়ার চুক্তি হয় এবং চুক্তি মোতাবেক সে বছর মুসলমানদেরকে পবিত্র কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে উপস্থিত না হয়েই মদীনা মুনাওয়্যারায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়। অথচ এ চুক্তির ফলশ্রুতি স্বরূপ দু'বছর পরই মক্কা বিজয় হয়। আর ষষ্ঠ হিজরীর ঐ চুক্তিকেই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের সূরায়ে আল ফাতহে 'ফাতহে মুবীন' বা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবু দরদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে মুসলমান তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট হয় আল্লাহ পাকের হক্ব হয়ে যায় যে কেয়ামতের দিন দোযখের অগ্নিকে তার নিকট থেকে ফিরিয়ে দেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন। ইমাম তিরমিজী (রঃ) এই হাদীসকে 'হাসান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তেবরাণী এবং এছহাক এবনে রাহবিয়া এই হাদীসকে হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১]

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ

"তিনিই আল্লাহ পাক যিনি বায়ু মণ্ডলী পরিচালিত করেন, আর তা মেঘ বহন করে এবং তিনি যেমন ইচ্ছা তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন এবং স্তরের পর স্তর করে রাখেন,

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩০

ফলে তার মাঝ থেকে তুমি বৃষ্টিপাত হতে দেখ"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের এমন নিদর্শন সমূহের উল্লেখ ছিল যাতে তাঁর একত্ববাদের প্রমাণ রয়েছে। আর এ আয়াত থেকে এমন কয়েকটি নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে যা কেয়ামতের এবং বিশ্ব সৃষ্টির লয়ের ও মানুষের মৃত্যুর পর তার পুনরুত্থানের প্রমাণ বহন করে। এরপর কেয়ামতের কিছু বিবরণও স্থান পেয়েছে।

· আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর কুদরত হেকমতের কয়েকটি বিশেষ নিদর্শনের বিবরণ দিয়েছেন যে তিনি তাঁর বন্দাদের উপকারার্থে আকাশে বায়ু মণ্ডলী পরিচালিত করেন যা মেঘ বহন করে চলে। এরপর স্বীয় ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেক মেঘমালাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন। كيف يشاء অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যেমন ইচ্ছা তেমন ছড়িয়ে দেন। কোথাও বেশী, কোথাও কম, যাকে ইচ্ছা তাকে এর দ্বারা উপকৃত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে এর থেকে মাহরুম করেন।

আলোচ্য আয়াতে يرسل শব্দটি দ্বারা এ মর্ম উপলব্ধি করা যায় যে বৃষ্টির পূর্বে পূর্বাভাস স্বরূপ বাতাস প্রেরণ এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুধু একবারই হয় না, বরং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা মোতাবেক তা সর্বদা হতে থাকে।

فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

অর্থাৎ আর এ বৃষ্টি আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে পৌছে দেন, তখন তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ ....

"যদিও বৃষ্টি অবতরণের পূর্বে তারা এ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে বসেছিল"।

বস্তুতঃ মানুষের অবস্থা বিচিত্র। একটু আগে যারা নিরাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল তারা ক্ষণিকের মধ্যেই আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে। এখানে কয়েকটি বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য, যেভাবে বৃষ্টির পূর্বে বাতাস তার পূর্বাভাস নিয়ে আসে, ঠিক তেমনি সত্য-সাধকদের বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যেভাবে আল্লাহ্ পাক বায়ু মণ্ডলীকে আসমানে ছড়িয়ে দেন, ঠিক তেমনি তাঁর মনোনীত জীবন-বিধানকেও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবেন বলে আভাস রয়েছে। তৃতীয়তঃ বৃষ্টির আশায় মানুষ যেমন আশান্বিত থাকে এবং বৃষ্টিপাত হলে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে আনন্দিত হয়, ঠিক তেমনি দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় মোমেনগণ আনন্দিত হয়। চতুর্থতঃ যেভাবে মৃত শুষ্ক জমিনে রহমতের বৃষ্টি নাজিল হলে তা জীবন্ত এবং শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে মরণোন্মুখ মানবতাকে নব জীবন দান করেছেন। একথা সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত যে বিশ্ব মানবের চরম দুর্দিনে আগমন করেছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব

সাধিত হয়েছিল। এ বিপ্লবের মহানায়ক তিনিই, আর এ বিপ্লবের সংবিধান হলো পবিত্র কোরআন।[১]

বৃষ্টিপাতের মূল কারণ

এ পর্যায়ে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, বৃষ্টিপাতের মূল কারণ হলো আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জি। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয়, যদিও বৈজ্ঞানিকরা এ তত্ত্ব বর্ণনা করেন যে, সূর্যের তাপে সমুদ্র থেকে পানি উপরে উঠে যায় যা মেঘমালায় পরিণত হয়, বাতাস তাকে আকাশে এদিক সেদিক নিয়ে যায় এবং এরপর তা থেকে নির্দিষ্ট স্থানে বৃষ্টিপাত হয়। তবে এটি আদৌ বৃষ্টিপাতের কারণ নয়; বরং পন্থা। এসব কিছু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতেই হয়, এর কোন কিছুই বন্দার ইচ্ছাধীন নয়। সব কিছুতেই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির বহিঃপ্রকাশ হয়। অতএব, প্রকাশ্য কারণ ও উপকরণের প্রতি লক্ষ্য করে ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়; বরং অন্তর্নিহিত কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং সত্য অনুধাবন করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

প্রিয়নবী (দঃ)-এর একটি মোজেযা

হাদীস শরীফে বর্ণিত একটি ঘটনা এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে জুমআর খুতবা দানে রত ছিলেন, ঠিক ঐ সময়েই একজন গ্রামীন ব্যক্তি হাযির হলেন এবং মসজিদে নববীর একটি দরজায় দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! দুর্ভিক্ষের কারণে পরিবারবর্গ ক্ষুধার্ত রয়েছে, আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক রহমতের বৃষ্টি নাজিল করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখনই দু' হাত তুলে দোয়া করলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আল্লাহর শপথ! তখন আকাশে সূর্যের কিরণ ব্যতীত মেঘের কোন লক্ষণই ছিল না, একদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, আর অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ দেখা যেতে লাগল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তা আসমানে ছড়িয়ে পড়ল এবং অনতিবিলম্বে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেল। আমরা নামাজ শেষ করার পর বৃষ্টির মধ্যেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করলাম। এভাবে সুদীর্ঘ আট দিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অব্যাহত ছিল। এর পরবর্তী জুমআর দিন ঐ ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি খুতবার সময় দণ্ডায়মান হলো এবং আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! অধিক বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে এবং বাড়ী-ঘর বিনষ্ট হয়ে গেছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাত তুলে দোয়া করলেনঃ

اللهم حولينا ولا علينا

"হে আল্লাহ! আমাদের চারিপার্শ্বে পাহাড়-পর্বতের উপর বৃষ্টি হোক, আমাদের প্রতি না হোক"।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৫৩১

এই দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেল।

এতে একথাই প্রমাণিত হয়, আকাশে মেঘমালার গমনাগমন, বৃষ্টি বর্ষণ এবং এর জন্যে স্থান নির্বাচন এবং কী পরিমাণ বৃষ্টিপাত হবে তা নির্ধারণ শুধু আল্লাহ পাকের মর্জিতেই হয়। এসব আল্লাহ পাকের রহমত, তাঁর অনুগ্রহ এবং দয়া, আর এজন্যে প্রতিটি কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা উপলব্ধি করা এবং সর্বদা তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞ থাকা।[১]

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ
اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ
اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾ فَاِنَّكَ
لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاۗءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾
وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ
بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ
ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾

তরজমা

(৫০) অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের রহমতের নিদর্শন সমূহ লক্ষ্য করে দেখ, কিভাবে তিনি ধরণীর মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক এভাবে মৃতদেরকে জীবিত করবেন। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(৫১) আর আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যে কারণে তারা তাদের ফসলাদি পীতবর্ণ ধারণ করেছে দেখতে পায় তবে তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

(৫২) (হে রসূল!) আপনি তো মৃতকে শোনাতে পারবেন না, বধিরকেও ডাক শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে রাখে।

(৫৩) আর (হে রসূল!) আপনি অন্ধকেও তার গোমরাহী থেকে সঠিক পথে আনতে পারবেন না, আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারবেন যারা আমার আয়াত সমূহকে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআান, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১৬

বিশ্বাস করে, বস্তুতঃ তারাই প্রকৃত মুসলমান।

(৫৪) তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে, দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন, শক্তির পর তিনি পুনরায় দুর্বলতা ও বার্ধক্য প্রদান করেন, তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন, আর তিনি মহাজ্ঞানী, তিনিই সর্ব শক্তিমান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে একথা এরশাদ হয়েছে যে বৃষ্টিপাতের পূর্বে মানুষ এ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে থাকে কিন্তু যখন আল্লাহ পাকের রহমতের বৃষ্টি নাজিল হয় তখন বিশ্ব-সৃষ্টিতে এক নব জীবন পরিলক্ষিত হয়। মৃত শুষ্ক জমীন বৃষ্টির পানির স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রাণহীন জমিনে যে শক্তি লুপ্ত এবং সুপ্ত ছিল তার বহিঃপ্রকাশ হয় এবং জমীনে দেখা যায় সবুজের মেলা।

আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

فَانْظُرْ اِلٰى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ

হে সত্য-সন্ধানী! আল্লাহ পাকের রহমত এবং মেহেরবানীর জীবন্ত নিদর্শন লক্ষ্য করে দেখ, কিছুক্ষণ পূর্বেও যে জমীন ছিল শুস্ক, মৃত এবং প্রাণহীন কিন্তু বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে এই মৃত শুস্ক জমীনে প্রাণ ফিরে এসেছে, ঠিক এমনিভাবে আধ্যাত্মিক জগতেও যখন আল্লাহ পাকের রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয় তখনও মৃত-প্রায় প্রাণ নবজীবন লাভ করে। অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসে। প্রাক-ইসলামী যুগে পৃথিবী ছিল অশান্ত, বিপন্ন, গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দূরীভূত হলো, বিপন্ন বিপদগ্রস্ত মানবতা বেঁচে উঠল। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের গৌরবোজ্জ্বল যুগে বিশ্ববাসী এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেছিল। যেভাবে বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত সম্ভব নয়; ঠিক তেমনি নবী রসূলগণের হেদায়েত লাভের জন্যেও আল্লাহ পাকের তওফিক একান্ত জরুরী। আল্লাহ পাক যেভাবে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মৃত ধরণীকে জীবিত করেন, ঠিক তেমনি প্রত্যেকটি মৃত মানুষকে অবশ্যই কেয়ামতের দিন পুনর্জীবন দান করবেন এবং প্রত্যেককে তার জীবনের হিসাব দেয়ার জন্যে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করবেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى

অর্থাৎ নিশ্চয় যিনি মৃত জমীনকে জীবিত করেন, তিনিই মৃত লোকদেরকে অবশ্যই পুনর্জীবন দান করবেন। অতএব, পুনর্জীবন এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা শুধু নির্বুদ্ধিতাই নয়; বরং নিজের সর্বনাশ ডেকে আনাও।

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

এবং আল্লাহ পাক সব কিছু করতে পারেন, তাঁর জন্যে কঠিন বলতে কিছুই নেই, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। তাই যে মানুষটি মৃত্যুর পর পচে গলে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাকে পুনর্জীবন দান করে দরবারে হাযির করা আল্লাহ পাকের পক্ষে আদৌ কঠিন কাজ নয়।

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ○

"আর আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার কারণে তারা তাদের ফসলাদি পীতবর্ণ ধারণ করেছে দেখতে পায় তবে তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যদি কখনো কোন এলাকায় আগ্নেয় বায়ু প্রেরণ করেন এবং তাদের ফসলাদি এ কারণে বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের না-শোকরী করে।

এ আয়াতে মানুষের এমন একটি চারিত্রিক দুর্বলতার উল্লেখ রয়েছে যার সংশোধন একান্ত জরুরী। যখন মানুষ আল্লাহ পাকের রহমতে যথাসময়ে তার চাষযোগ্য জমিতে ফল ও ফসল পায় তখন তার আনন্দ-উল্লাসের কোন সীমা থাকেনা, পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ পাক আগ্নেয় বায়ু প্রেরণ করেন, যার কারণে মানুষের ফসল বিবর্ণ হয়ে যায় তখন সে শুধু যে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায় তাই নয়; বরং অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম হয়ে পড়ে। এটি মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা অথচ যখন মানুষ আল্লাহ পাকের রহমতে তাঁর নেয়ামত লাভ করে তখন তার প্রধানতম কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং নিঃশংক, নিশ্চিন্ত না হওয়া কেননা, আল্লাহ পাক যে কোন মুহূর্তে সাফল্যকে ব্যর্থতায় পরিণত করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে প্রদত্ত নেয়ামত কেড়েও নিতে পারেন। কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ○

(সূরা আলে-এমরান)

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই ক্ষমতার মালিক, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দান কর এবং যাকে ইচ্ছা তার নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে লও, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তুমি অপমানিত কর। মূলতঃ সার্বিক কল্যাণ শুধু তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান"।

অতএব, নেয়ামত লাভ করে আনন্দ-উল্লাসে আত্মহারা হয়ে পড়া উচিত নয়। ঠিক এমনিভাবে দুঃখ-বেদনা দেখা দিলেও আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া সঠিক নয়; বরং আল্লাহ পাকের দরবারে এস্তেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া এবং তাঁর রহমতের আশা করা ও সবর অবলম্বন করা উচিত।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩২

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝

"(হে রসূল!) আপনি তো মৃতকে শোনাতে পারবেন না, বধিরকেও ডাক শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে রাখে"।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ লক্ষ্য করে দেখ, আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমত কত বিস্ময়কর তা উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হও কিন্তু কাফেররা এসব কথায় কর্ণপাত করতো না এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনত না, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের ঈমানের জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল থাকতেন, অথচ কাফেররা অনবরত তাঁকে কষ্ট দিত, এজন্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের আচরণে মনক্ষুন্ন হবেন না, আর তারা যে আপনার ঈমান আনয়নের ডাকে সাড়া দেয়না তার জন্যে আপনি ব্যথিত হবেন না।

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

"কেননা আপনি তো মৃতকে শোনাতে পারবেন না"।

আলোচ্য আয়াতের الموتى শব্দটি কাফেরদের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা কাফেরদের অন্তরের অপমৃত্যু ঘটেছে, তাদের অন্তরগুলো সত্য গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই তাদেরকে মৃত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

(হে রসূল!) আপনি মৃতদেরকে কথা শোনাতে পারবেন না, যারা বধির তাদেরকেও আপনার ডাক শোনাতে পারবেন না, বিশেষ করে যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে রাখে।

বধির তো এমনিতেই কারো কথা শোনেনা তদুপরি যদি সে মুখ ফিরিয়ে রাখে তবে তাকে ইশারা-ইঙ্গিতেও কোন কথা বোঝানো যায় না। এমন অবস্থায় তারা আল্লাহর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ডাক শ্রবণ থেকে বঞ্চিত হবে— এটিই স্বাভাবিক, যেহেতু এ কাফেররা বাহ্যিক এবং আন্তরিকভাবে সত্য গ্রহণে অপ্রস্তুত, তাদের শ্রবণ শক্তি এবং উপলব্ধি শক্তিকে তারা অকেজো করে রেখেছে তাই তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে মৃত লোকদের ন্যায়। আর আপনি মৃতকে যেমন শোনাতে পারেন না তেমনি তাদেরকেও শোনাতে পারবেন না।

মূলতঃ আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন। তাঁর জন্যে কোন কিছুই কঠিন নয়, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে মৃতকে শোনাতে পারেন, অন্ধকে দেখাতে পারেন। কিন্তু হে নবী! অন্ধ বধিরকে শোনানো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এ কাফেরদেরকে সত্য কথা শোনাতে পারবেন না। আপনার কাজ হলো সত্যের দিকে মানুষকে আহবান করা, আর এ কাজ আপনি করছেন। সত্য কথা

শ্রবণ করা না করা তাদের কাজ, তাই আপনি এ ব্যাপারে মনক্ষুন্ন হবেন না।

وَمَا أَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ

"আর (হে রসূল!) আপনি অন্ধকে তার গোমরাহী থেকে সঠিক পথে আনতে পারবেন না, আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারবেন যারা আমার আয়াত সমূহকে বিশ্বাস করে, বস্তুতঃ তারাই প্রকৃত মুসলমান"।

মৃত ব্যক্তিরা কি কথা শুনতে পারে?

এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে নিহত কাফেরদের লাশ তিন দিন পর্যন্ত পড়ে থাকতে দিলেন। যখন লাশে পঁচন ধরে গেল তখন তিনি সেদিকে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে এভাবে ডাক দিয়ে বললেন, 'হে উমাইয়া এবনে খাল্‌ফ! হে আবু জেহেল এবনে হেশাম! তোমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা সঠিক পেয়েছ'? হযরত ওমর (রাঃ) তখন আরজ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! তিন দিন পরও আপনি তাদেরকে ডাক দিচ্ছেন? অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى

"আপনি তো মৃতকে শোনাতে পারবেন না"।

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, তোমরা তাদের চেয়ে অধিক পরিমাণে শ্রবণ করতে পার না কিন্তু তারা জবাব দিতে সক্ষম নয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকেও এমন বর্ণনা রয়েছে যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের কথা শ্রবণ করতে পারে, এমন অবস্থায় আলোচ্য আয়াত فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى এর অর্থ হবেঃ (হে রসূল!) আপনি নিজের ইচ্ছা এবং শক্তিতে মৃত ব্যক্তিদেরকে কথা শোনাতে পারেন না কিন্তু আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা করেন তখন মৃতদেরকে জীবিতদের কথা শুনিয়ে দেন। অথবা এর অর্থ হলোঃ (হে রসূল!) আপনি মৃতদেরকে এমন কথা শোনাতে পারবেন না যাতে তাদের উপকার হয়, কেননা হেদায়েতের উপর আমল করার সময় তাদের শেষ হয়ে গেছে।[১]

মোদ্দাকথা, প্রকাশ্যে মৃত ব্যক্তিকে কোন কথা শ্রবণ করানো সম্ভব নয় তবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে কোন কিছুই কঠিন নয়। আর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে কথা শুনিয়েছেন তখন তা আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত এবং মর্জিতেই শুনিয়েছেন। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে কোরআনে করীমে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩২
এ সম্পর্কে আরও জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২৫-২৬

ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে এক মুঠো বালু নিক্ষেপ করেছেন, এ কথাটিকে আল্লাহ পাক এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (সূরা আনফাল)

"(হে নবী!) আপনি মাটি নিক্ষেপ করেননি; মূলতঃ আল্লাহ পাকই তা নিক্ষেপ করেছেন"।

ঠিক এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কাফেরদের সঙ্গে কথা বলেছেন তখন আল্লাহ পাকই তা শুনিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিদেরকে কোন কথা শোনানো সম্ভব নয় তবে বধির এবং অন্ধকে শোনানো যেতে পারে। হয়তো এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন কোন কাফের তো একেবারেই মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। আর কিছু কিছু কাফের রয়েছে অন্ধ এবং বধিরের ন্যায়। যদি তাদের ব্যাপারে সাধনা করা যায় তবে হয়তো তারা সঠিক পথে আসতেও পারে। বিশেষতঃ যদি এ কাফেররা নিজেদের দৈহিক পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রতি লক্ষ্য করে তবে হয়তো আল্লাহ পাকের একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করতেও পারে। পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً

"তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল রূপে, দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি, শক্তির পর তিনি দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, মানুষ জন্ম-লগ্নে থাকে অত্যন্ত দুর্বল, আল্লাহ পাক তাকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি মানুষের দুর্বলতা দূরীভূত করে তাকে সবল করেছেন ধীরে ধীরে। শৈশবের পর এসেছে কৈশোর, এরপর যৌবন, আর যৌবনের পরই আসে বার্ধক্য। তখন মানুষ ধীরে ধীরে শক্তি হারাতে থাকে। অর্থাৎ দুর্বলতা হলো মানুষের ভিত্তি, সৃষ্টিগত ভাবেই তোমরা দুর্বল। আর এ দুর্বলতা থেকে তাকে সবল করার মধ্যেই রয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এবং প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল অবস্থায়।

এ দুর্বলতা এবং সবলতা, উত্থান এবং পতন তথা শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্যকাল এসব কিছু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয়ে থাকে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে তাঁর সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ○

"তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন, আর তিনি মহাজ্ঞানী, তিনিই সর্বশক্তিমান"।

অর্থাৎ মানব দেহে বিভিন্ন সময়ে যে পরিবর্তন হয় এবং কখনো চরম দুর্বল, আর কখনো সবল, এসব কিছু আপনা আপনিই হয় না; বরং এটি হয় আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতে। কেননা, তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সকলের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ এ বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, অর্থাৎ তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিজগতের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, মানুষ যদি ভাল কাজ করে তা-ও তিনি জানেন, আর যদি মন্দ কাজ করে তা-ও তিনি জানেন, যদি কেউ ভাল কাজ করে, তিনি তাকে সওয়াব দান করেন, আর যে মন্দ কাজ করে তার শাস্তি বিধান করেন। আর এ শাস্তি দুনিয়াতেও হয় এবং আখেরাতেও হবে। দ্বিতীয়তঃ সওয়াব এবং আযাবের ঘোষণার আগে আল্লাহ পাকের এলমের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর তিনি যে সর্বশক্তিমান একথার ঘোষণা রয়েছে।[১]

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ۙ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ
كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ
لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ
الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ
ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ
بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

তরজমা

(৫৫) যেদিন কেয়ামত ঘটবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে তারা (দুনিয়াতে অথবা মধ্যলোকে) মুহূর্তকালের অধিক অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা (পৃথিবীতে) সত্য-ভ্রষ্ট হতো।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৩৬

(৫৬) কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান এবং ঈমান প্রদান করা হয়েছে তারা বলবে, 'তোমরা তো আল্লাহ্ পাকের কিতাব অনুসারে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ; অতএব এটিই পুনরুত্থান দিবস; কিন্তু তোমরা তা জানতে না।

(৫৭) সেদিন পাপীষ্ঠদের মার্জনা-ভিক্ষা কোন উপকারে আসবে না; আর তাদেরকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের কোন সুযোগও দেয়া হবে না।

(৫৮) আর নিশ্চয় আমি মানুষের জন্যে এই কোরআনের মধ্যে সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত রেখেছি। (হে রসূল!) আপনি যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, "তোমরা তো মিথ্যা রচনাকারীই"।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববতী আয়াত সমূহে দুনিয়াতে কাফের-মুশরেকরা যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিত তার বিবরণ ছিল যে তারা কুফরী নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল, তারা নবী রসূলগণের আহবানে সাড়া দেয়নি, মানবতার কলংক পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করেছে। আর আলোচ্য আয়াতে কাফের-মুশরেকরা আখেরাতে যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে তারা দুনিয়াতে অথবা 'আলমে বরযখে' এক মূহূর্তের বেশী অবস্থান করেনি। মূলতঃ কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় কাফেররা দুনিয়ার এই সুদীর্ঘ জীবনকে অতি অল্প মনে করবে এবং শপথ করে বলবে যে, আমরা এক মুহূর্তের বেশী দুনিয়াতে বা আলমে বরজখে অবস্থান করিনি। কাফের-মুশরেকরা যেভাবে দুনিয়াতে মিথ্যা কথা বলতো ঠিক সেভাবে আখেরাতেও তারা মিথ্যা বলবে। আখেরাতের ভয়াবহ অবস্থা দেখার পর তাদের এ অবস্থা হবে।

আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতকে ساعة বলা হয়েছে। এর অর্থ ঘন্টা, মুহূর্ত, যেহেতু কেয়ামত দুনিয়ার শেষ মুহূর্তে হবে, তাই কেয়ামতকে ساعة বলা হয়েছে। ساعة শব্দটির আরো একটি অর্থ হলো হঠাৎ। যেহেতু কেয়ামত হঠাৎ হয়ে যাবে তাই কেয়ামতকে ساعة বলা হয়েছে। যেদিন কেয়ামত ঘটবে সেদিন এ পাপীষ্ঠরা অর্থাৎ কাফের-মুশরেকরা শপথ করে বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা মধ্যলোকে অতি সামান্য সময়ই ছিলাম, দুনিয়ার জীবন বা মধ্যলোকের জীবন যেন মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না, যদি আরো দু'টি দিন পৃথিবীতে থাকতে পারতাম তবে কেয়ামতের এ কঠিন দিনের জন্যে কিছু সম্বল সংগ্রহ করতে পারতাম এবং আজকের এ বিপদ থেকে নিস্কৃতি লাভের একটি ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু হায় আক্ষেপ! হঠাৎ বেজে উঠল কেয়ামতের বজ্র বাঁশী, ফলে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে কিছুই করা সম্ভব হলোনা।

كَذٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ

"এভাবেই তারা পৃথিবীতে সত্য-ভ্রষ্ট হতো"।

অর্থাৎ তারা সারা জীবন যেমন মন্দ বা উল্টো পথে চলেছে, কেয়ামতের কঠিন দিনেও অনুরূপভাবে উল্টো পথেই চলবে। সারা জীবন যেমন তারা মিথ্যা কথা বলেছে, কেয়ামতের দিনও তারা মিথ্যা কথাই বলবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এ কাফের-মুশরেকরা আখেরাতে এভাবে মূর্খতার পরিচয় দেবে যে তারা শপথ করে বলবে, আমরা দুনিয়াতে অতি সামান্য সময়ই ছিলাম। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হবে একথা বলা যে আমরা পৃথিবীতে এত অল্প সময় ছিলাম যে আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন করাই সম্ভব নয়।

وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيمَانَ

কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান প্রদান করা হয়েছে তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটিই তো কেয়ামতের দিন, কিন্তু তোমরা তা জানতে না; বরং অস্বীকার করতে। কিন্তু এখন আর অস্বীকার করা সম্ভব নয় কেননা এখন কেয়ামত তোমাদের সম্মুখে এসে পড়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের দিন কাফেররা বলবে, আমরা দুনিয়াতে বা মধ্যলোকে অতি অল্প সময়ই অবস্থান করেছি, তখন মোমেনগণ এবং ফেরেশতাগণ কাফেরদের এ মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করে বলবে, তোমরা মিথ্যা কথা বল কেননা আল্লাহ পাক জানেন তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। তোমরা কেয়ামতের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল পৃথিবীতে অবস্থান করেছ, কেয়ামতের দিনের কথা তখন অস্বীকার করেছ, আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের সময় কম ছিলনা, কিন্তু তোমরা সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করোনি এবং কেয়ামতের দিনের কথা শুনেও তা অবিশ্বাসই করেছ। তোমরা কেয়ামতের দিনকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছ আর সে মিথ্যাই আজ মহাসত্যে পরিণত হয়েছে।

وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيمَانَ

যাদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এল্‌ম এবং ঈমান প্রদান করা হয়েছে, তারা অর্থাৎ নবী রসূলগণ এবং মোমেনগণ বলবে, তোমরা আল্লাহর কিতাব মোতাবেক হাশর পর্যন্ত অবস্থান করেছ অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের অবস্থানের মেয়াদ আল্লাহ পাক যা লিখে দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী তোমরা পৃথিবীতে অবস্থান করেছ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর কিতাবে তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ ছিল, সে মোতাবেকই তোমরা দুনিয়াতে ছিলে।

অথবা আলোচ্য আয়াতে كِتٰبِ اللّٰهِ শব্দটির অর্থ লওহে মাহ্‌ফুজ, অথবা নবজাতক যখন মায়ের উদরে তার চার মাস হয়, তখন ফেরেশতা এসে এ নবজাতকের যে বয়স লিখে দিয়েছে তাকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অথবা এখানে كتب الله শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

অতএব, এটিই উত্থিত হবার দিন, কিন্তু তোমরা তা জানতেনা। অর্থাৎ এ দিনকে তোমরা দুনিয়াতে অস্বীকার করতে, আজ সে অস্বীকৃতির বাতুলতা প্রকাশিত হয়েছে, অতএব, সে অস্বীকৃতির পরিণতি ভোগ করতে প্রস্তুত হও।

তফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেরদের এ জবাব তারা দেবেন যারা দুনিয়াতে শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করেছিল।

এ আয়াত দ্বারা আরো একটি বিষয় বোঝা যায় তা হলো, কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার প্রতিক্রিয়া কাফের ও মুশরেকদের উপরই প্রকাশ পাবে। মোমেনগণ তথা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপনকারীগণ ইনশাআল্লাহ মহা বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ফেরেশতাগণ। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ আম্বিয়ায়ে কেরাম, আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ওলামায়ে উম্মত। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো দুনিয়ার সকল মোমেন।[২]

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

"সেদিন পাপীষ্ঠদের ক্ষমা প্রার্থনা কোন উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেয়া হবে না"।

অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন দিনে দূরাত্মা কাফের-মুশরেকদের কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা এমনকি, তাদেরকে একথাও বলা হবেনা যে তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট কর।

এ কথার তাৎপর্য হলো, সেদিন কাফেরদেরকে তওবা এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার সুযোগও দেয়া হবেনা। যেভাবে দুনিয়াতে তওবা এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় এবং দরবারে এলাহীতে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ রয়েছে, আখেরাতে কাফের মুশরেকদেরকে এ সুযোগ দেয়া হবে না।

অথবা এর অর্থ হলো কেয়ামতের দিন জালেমদের সন্তুষ্টি কারো কাম্য হবেনা, যেমন মোমেনদের সন্তুষ্টির ব্যবস্থা থাকবে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? জান্নাতবাসীগণ আরজ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩৪-৩৫
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮২৫

করবেন, আমরা কেন সন্তুষ্ট হবোনা যখন তুমি আমাদেরকে এমন নেয়ামত সমূহ দান করেছ যা অন্যদেরকে দান করোনি, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, আমি তোমাদেরকে তার চেয়েও উত্তম বস্তু দান করবো। জান্নাতবাসীগণ আরজ করবেনঃ জান্নাতের চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে? তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ আমি তোমাদের উদ্দেশে আমার সন্তুষ্টি চিরকালের জন্যে রেখে দিলাম। আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবোনা।[১] (সিহাহ্ সিত্তাহ্)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

"আর নিশ্চয় আমি মানুষের উপকারার্থে পবিত্র কোরআনে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি"।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, এ সূরা শুরু হয়েছে নবুওয়্যতের দলিল-প্রমাণ বর্ণনার মাধ্যমে, আর এর পরিসমাপ্তিতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের আরেকটি দলিল বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন এক বিস্ময়কর অভিনব মহাগ্রন্থ, এটি মুসলিম জাতির সংবিধান, এতে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের পথ-নির্দেশনা, আর এ মহান গ্রন্থই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এতে রয়েছে তৌহীদ এবং রেসালতের বিবরণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও দূরাত্মা কাফেররা পবিত্র কোরআনের কথার দিকে কর্ণপাতই করে না, তারা সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে না। তারা শুনেও শোনে না দেখেও দেখে না।

وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ○

"(হে রসূল!) যদি আপনি তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে তোমরা তো মিথ্যা রচনাকারী"।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি যদি কাফেরদের নিকট পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত নিয়ে আসেন, অথবা মূসা (আঃ)-এর লাঠির ন্যায় কোন নিদর্শন প্রদর্শন করেন তখনও তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণকে বলবে, তোমরাতো মিথ্যা রচনাকারী অর্থাৎ তারা কোন দলিল-প্রমাণই মেনে নিতে রাজী নয়।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩৫

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর তাৎপর্য হচ্ছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফেরদেরকে হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। তাঁর তরফ থেকে এ পর্যায়ে কোন ত্রুটিই হয়নি কিন্তু তাদের ভাগ্যে হেদায়েত নেই বলে তারা তাঁর আদর্শ গ্রহণে প্রস্তুত হয়নি। মূলতঃ এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে রয়েছে সান্ত্বনা এ মর্মে যে (হে রসূল!) আপনি রেসালতের হক্ব আদায় করেছেন, কিন্তু মক্কাবাসী আপনার আহ্বানে সাড়া দেয়নি, এজন্যে তারা দায়ী হবে। আপনি আপনার দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেছেন।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ
اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

তরজমা

(৫৯) যাদের জ্ঞান নেই, আল্লাহ পাক এভাবেই তাদের অন্তরকে মোহর করে দেন।

(৬০) অতএব (হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন, নিশ্চয় আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি সত্য, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, পবিত্র কোরআনে বহু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে যাতে করে কাফের মুশরেকেরা সত্য উপলব্ধি করতে পারে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে পারে এবং সত্য-অসত্য প্রকাশ পায়, যারা এ সম্পর্কে গাফেল তাদের গাফলত দূরীভূত হয়। কিন্তু দূরাত্মা কাফের মুশরেকেরা জেদের বশীভূত হয়ে এবং শত্রুতার কারণে সত্যকে গ্রহণ করেনি।

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ○

অর্থাৎ যাদের বিচার, বুদ্ধি নেই, যারা জ্ঞান-শূন্য, যাদের শত্রুতা, জেদ এবং হঠকারিতাই একমাত্র অবলম্বন, যারা শুনেও শোনে না, বুঝেও বোঝে না, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে মোহর করে দেন। পরিণামে সত্য গ্রহণের পথ তথা হেদায়াতের পথ তাদের অন্যায় আচরণের কারণেই চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতের لا يعلمون শব্দটির অর্থ হলো তারা জানেনা অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তৌহীদ সম্পর্কে তারা অবগত নয়। অথবা এর অর্থ হলো তাদের মধ্যে জ্ঞানের অন্বেষণই নেই, তারা তাদের বাতিল, ভিত্তিহীন বিশ্বাসের উপর অবিচল রয়েছে। সত্যকে জানার

কোন আগ্রহই তাদের মধ্যে নেই। এজন্যে আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করার এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনেরও কোন সদিচ্ছা তাদের নেই; বরং সত্য-বিরোধিতা তাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সবর অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

অতএব, (হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন, কাফেরদের নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করুন, দ্বীন ইসলামকে সুপতিষ্ঠিত করার এবং সত্য-সংগ্রামীদের বিজয়ী করার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাক আপনাকে দিয়েছেন, তা সত্য এবং অদূর ভবিষ্যতে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং আপনাকে সাহায্য করার যে ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই সত্য প্রমাণিত হবে এবং ইসলাম অবশ্যই একদিন বিজয় লাভ করবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

"যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখেনা তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে"।

অর্থাৎ এ কাফের মুশরেকরা আপনাকে মিথ্যা-জ্ঞান করে অথবা কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে যেন ধৈর্য হারা না করতে পারে। যারা বেঈমান, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর তৌহীদের প্রতি বিশ্বাসী নয়; তারা যেন (হে রসূল!) আপনাকে তাদের অন্যায় আচরণের মাধ্যমে বিচলিত করতে না পারে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বিভিন্ন দৃষ্টান্তে মাধ্যমে তৌহীদের সত্যতা ঘোষণা করেছেন। আর এ সত্য ঘোষণার পাশাপাশি তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অনেক মোজেযা দান করেছেন। কিন্তু যত সুস্পষ্ট নিদর্শনই আসুক না কেন, তারা কখনো ঈমান আনবেনা। তারা বলবে, এসব হলো যাদু, বাতিল, মিথ্যা। আবু জেহেলের কথায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চন্দ্রকে তাঁর আঙ্গুল মোবারকের ঈশারায় দ্বিখন্ডিত করেছিলেন কিন্তু এরপরও তারা ঈমান আনেনি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা থেকেও বিরত রয়নি।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ যদিও আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কিন্তু এতে শিক্ষা রয়েছে সমস্ত উম্মতের জন্যে। ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং প্রতিষ্ঠায় যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, ধৈর্যের পাহাড় হয়ে তার মোকাবেলা করাই হল কর্তব্য। এ পর্যায়ে সংকল্পের দৃঢ়তা তথা আদর্শের উপর অটল অবিচল থাকা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করাই

কর্তব্য। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ তেরটি বছর কাফেদের অকথ্য নির্যাতন-উৎপীড়ন সহ্য করেও

স্বীয় আদর্শের উপর অটল অবিচল ছিলেন। এমনকি, অবশেষে তাঁকে ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে প্রিয় মাতৃ-ভূমি মক্কায়ে মোয়াজ্জমা ছেড়ে মদীনা তৈয়্যেবায় হিজরত করতে হয়। এর ঠিক এক বছর পরই বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে ঐতিহাসিক বিজয় দান করেছিলেন। আর বিজয়ের এ ধারা অব্যাহত ছিল ততদিন পর্যন্ত, যতদিন মুসলমানগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন থেকে মুসলিম জাতি ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে তখন থেকেই মুসলিম জাতির অবনতি শুরু হয়।

মুসলিম জাতির শক্তির উৎস হলো ঈমান, আর সৎকাজ হলো তার বৈশিষ্ট্য।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২৫শে অক্টোবর (১৯৯৪) মোতাবেক ২০ জমাদিউল আউয়াল রোজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টায় সূরায়ে রুমের তফসীর শেষ হল। হে আল্লাহ! তোমার বিশেষ রহমতে কবূল কর এবং এ মহান তফসীর গ্রন্থকে সুসম্পন্ন করার তওফিক দান কর, আমীন।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সূরা লোকমান

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾
وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ
اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى
فِى الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ
وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ

তরজমা

(১) আলিফ-লাম-মীম।

(২) এ আয়াত সমূহ জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থের।

(৩) হেদায়েত ও রহমত নেককারদের জন্যে,

(৪) যারা নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আর আখেরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

(৫) তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

(৬) মানুষের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা অজ্ঞতার কারণে মানুষকে আল্লাহ্ পাকের পথ থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে খেলা-ধূলার বিষয় ক্রয় করে লয়। আর আল্লাহ্ পাকের প্রদর্শিত পথ সম্পর্কে বিদ্রুপ করে; তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি।

(৭) আর যখন তার নিকট আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন সে দম্ভ ভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে, যেন সে তা শ্রবণ করতে পারেনি, তার কর্ণ দু'টি যেন বধির; অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

(৮) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতের বাগান সমূহ;

(৯) তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, আল্লাহ্ পাকের প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য। আর তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

(১০) তোমরা লক্ষ্য কর যে আল্লাহ্ পাক আসমান সমূহকে কোন প্রকার স্তম্ভ ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন; আর তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে; আর তিনিই তাতে চড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার জীব-জন্তু। আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি; তা দ্বারা পৃথিবীতে সর্বপ্রকার উত্তম কল্যাণকর উদ্ভিদ উৎপাদন করি।

সূরা লোকমান প্রসঙ্গে

নামকরণ

এ সূরায় লোকমান হাকীমের ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই সূরাটির এ নামকরণ করা হয়েছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে হযরত লোকমান অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তিনি নবী ছিলেন না। শুধু একরামার মত উদ্ধৃত করা হয় যে তিনি নবী ছিলেন। তবে এর সূত্র অত্যন্ত দুর্বল। তিনি সুদানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পেশা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেন, তিনি জীবনের সূচনায় কাঠ মিস্ত্রির কাজ করতেন। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দর্জী। আর কেউ বলেন, তিনি বকরী চরাতেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ভাগ্নেয়। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর খালাত ভাই আর তিনি হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর নিকট থেকে এলম হাসিল করেছেন। তিনি সুদীর্ঘ বয়স পেয়েছেন। এমনকি তিনি দাউদ

(আঃ)-এর জমানা পেয়েছেন। হযরত দাউদ (আঃ)-এর নবুওয়্যত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বনী ইস্রাঈলের কাযী এবং মুফতী ছিলেন। যখন দাউদ (আঃ) প্রেরিত হলেন তখন তিনি ফতোয়া প্রদান পরিত্যাগ করলেন এবং বললেন, নবীর বর্তমান থাকাই যথেষ্ট অর্থাৎ নবীর বর্তমানে অন্যের ফতোয়া দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, জনসাধারণের হেদায়েতের জন্যে তিনিই যথেষ্ট।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষ আয়াতে (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ..) পবিত্র কোরআনের সত্যতা এবং অলৌকিকত্বের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আর এ সূরার প্রথম আয়াতেও পবিত্র কোরআনের সত্যতার কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। এ মর্মে যে, এই কিতাব কোরআনে করীম হলো, রহমতের কিতাব, হেদায়েতের কিতাব এবং এর প্রত্যেকটি কথা হেকমতপূর্ণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত। অতএব, এই গ্রন্থকে গ্রহণ করা এবং এর প্রতি ঈমান আনা সৌভাগ্যের নিদর্শন।

পক্ষান্তরে এই কিতাব গ্রহণ না করা এবং গান-বাজনা, নভেল-নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হওয়া দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

২. আল্লাহ পাক এ সূরায় লোকমান হাকীমের মূল্যবান উপদেশের উল্লেখ করেছেন এবং তাতে তৌহীদের সত্যতা, শেরকের বাতুলতা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং নেক আমলের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং মন্দ কাজ পরিহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩. পূর্ববর্তী সূরায় আখেরাতের উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় আখেরাতের উল্লেখের পাশাপাশি তার কিছু দলিল-প্রমাণও বর্ণিত হয়েছে।

৪. পূর্ববর্তী সূরার শুরুতে সে সব লোকের কথার উল্লেখ ছিল যারা আল্লাহ পাকের ওয়াদার উপর আস্থা স্থাপন করে। আর এ সূরার শুরুতে সে সব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ পাকের সাথে ওয়াদা রক্ষা করে।

৫. পূর্ববর্তী সূরার শেষে কেয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ সূরার শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, কেয়ামত সম্বন্ধে আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা।

মোট কথা, এ সূরার শুরুতে আল্লাহ্ পাক নেককার বদকারদের অবস্থা এবং পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যেহেতু এ সূরা মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে, আর নাজিল হওয়ার সময় মক্কা শরীফে উভয় দল উপস্থিত ছিল। তাই নেককার হলেন সে যুগের মোহাজেরীনগণ, আর বদকার হলো যারা ইসলামকে সেদিন বাধা দিয়েছিল।

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) লিখেছেন, এবনে মরদবিয়া, বায়হাকী দালায়েলে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা লোকমান মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য অন্য সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আবাবাস (রাঃ)-এর আরেকটি কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা লোকমানের ৩ আয়াত ব্যতীত সবই মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য সূরায় ৪ রুকু, ৩৪ আয়াত, ৭৪৮ বাক্য,

ও ২,১১০ খানি অক্ষর রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

الٓمّٓ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝

এ আয়াতে পবিত্র কোরআনের গুরুত্ব, মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ এ আয়াত সমূহ হেকমতপূর্ণ কিতাবের, যে কিতাব নেককার লোকদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ নাজিল হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের الحكيم শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।

এর আরেকটি অর্থ হতে পারে নিখুঁত, ত্রুটিবিহীন, সুদৃঢ়। যদিও পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে সর্বকালের মানুষের হেদায়েতের জন্যে, কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে সকলের জন্যেই রয়েছে এই মহান গ্রন্থে হেদায়েত এবং নছীহত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে এই মহান গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয় শুধু সে সব লোক যারা সৎ, যারা মহৎ, যাদেরকে নেককার বলা হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝

অর্থাৎ এই কিতাব বিশেষভাবে হেদায়েত এবং রহমত নেককারদের জন্যে।

এর দৃষ্টান্ত হলো সূরা বাকারার প্রথম আয়াতঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

"এই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, যারা আল্লাহ আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যে এই কিতাব পথ প্রদর্শক"।

অর্থাৎ যদিও এই কিতাব সকলের জন্যই পথ-প্রদর্শনক, কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় শুধু সে সব লোক যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, পবিত্র কোরআন হেদায়েত ও রহমতের প্রতীক, তাদের জন্যে যারা "মোহসেন" তথা নেককার, যারা সৎ কাজ করে। محسن শব্দটি احسان থেকে। আর احسان এর ব্যাখ্যা রয়েছে হাদীস শরীফেঃ

ان تعبد الله كانك تراه

অর্থাৎ তুমি এভাবে আল্লাহ পাকের এবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো।

فان لم تكن تراه فانه يراك

যদি তোমার এ অবস্থা না হয় যে তুমি তাঁকে দেখছো বলে ভাবতে পার না তবে একথা তো সত্য যে তিনি তোমাকে দেখছেন, তুমি তাঁর সন্মুখে দণ্ডায়মান। এ উপলব্ধি নিয়ে যারা আল্লাহ্ পাকের এবাদত করে পবিত্র কোরআনের ভাষায় তারাই হলো "মোহসেন"। আর এমন লোকদের জন্যে পবিত্র কোরআন নিঃসন্দেহে জীবন্ত রহমত এবং হেদায়েত।

পরবর্তী আয়াতে এমন নেককার লোকদের প্রকাশ্য গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

অর্থাৎ যারা নামাজ কায়েম করে যথাযথ ভাবে এবং যাকাত আদায় করে সঠিক নিয়মে এবং আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা আখেরাতকে সর্বদা সম্মুখে রাখে, দুনিয়ার এ জীবনকে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী মনে করে এবং তাদের সকল সাধনার মূল লক্ষ্য হয় আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো আখেরাতের উপর পূর্ণ একীন, এমন লোকদের সম্পর্কেই পরবর্তী আয়াতে রয়েছে সুসংবাদঃ

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

তারাই সে সব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত হেদায়ত-প্রাপ্ত এবং তারাই সফলকাম, আর তারাই ভাগ্যবান। তারা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এমন অগণিত নেয়ামত লাভ করবে যা কেউ কখনও দেখেনি, যার কথা কেউ কখনও শোনেনি, এমনকি কখনও চিন্তাও করেনি।

পৃথিবীতে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। নেককার আর বদকার বা ভাগ্যবান ও হতভাগা। এতক্ষণ পর্যন্ত ভাগ্যবানদের বর্ণনা রয়েছে আর পরবর্তী আয়াত থেকে যারা ভাগ্যাহত বা হতভাগা তাদের অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আর মানুষের মধ্যে একপ্রকার লোক রয়েছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে খেলাধূলার বস্তু ক্রয় করে থাকে আর তা করে, না বুঝে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা না করে, শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হেদায়েতকে তারা উপহাস করে থাকে। তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি।

শানে নজুল

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে মক্কার নজর এবনে হারেস নামক এক ব্যক্তি একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করেছিল। সে যখনই এই সংবাদ পেত যে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেছে তখনই সে ঐ ব্যক্তিকে তার বাড়ীতে দাওয়াত করতো এবং বাঁদীকে বলতো, এই ব্যক্তিকে ভাল করে পানাহার করাও এবং গান শোনাও।

যখন অনুষ্ঠান শেষ হতো, তখন তার আহুত মোহমানকে বলতো, তুমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ধর্ম গ্রহণ করতে চাও কেন? তিনি তো নামাজ-রোজার আদেশ দেন এবং তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করার আহবান করেন, অথচ আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি এসব আনন্দ-উৎসবের, তখন আলোচ্য আয়াত নাজেল হয়।

এবনে জরীর উফীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কোরায়েইশ গোত্রের এক ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে যে সে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করেছিল।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু সালমা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মেয়েদেরকে গানের প্রশিক্ষণ দেয়া বৈধ নয়, আর তাদের মূল্যও হারাম অর্থাৎ তাদেরকে বিক্রি করাও বৈধ নয়। আর যে ব্যক্তি এমন কাজ করেছে তার সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। যে ব্যক্তি গানের প্রসার ঘটায় আল্লাহ পাক তার উপর দু'টি শয়তান সওয়ার করিয়ে দেন। ঐ শয়তান দুটি তাকে আঘাত করতে থাকে, যে পর্যন্ত না সে নিজে নীরব হয়ে যায়।

ইমাম তিরমিজী হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গায়িকা বাঁদীদেরকে বিক্রয় করোনা, ক্রয়ও করোনা, এদের ব্যবসায়ে কোন কল্যাণ নেই। আর এদের মূল্য হারাম। এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এবং কালবী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে নজর এবনে হারেস এবনে কালদার ব্যাপারে। নজর ব্যবসা করতো, হিরা নামক স্থানে যেত, সেখানে থেকে কিসসা-কাহিনীর বই ক্রয় করে আনত এবং কোরায়েশদের নিকট বর্ণনা করতো এবং বলতো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের নিকট আদ ও সামুদ জাতির ঘটনা বর্ণনা করে, আমি তোমাদের নিকট রুস্তম ও আসপানদিয়ারের ঘটনাবলী এবং ইরানের বাদশাহদের কাহিনী বর্ণনা করি। লোকেরা তার কথা শ্রবণের জন্যে উৎসাহিত হতে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ لهوالحديث শব্দটির অর্থ হলো গায়ক ও গায়িকা।

আলোচ্য আয়াতের মর্মবাণী হলো, কিছু লোক গায়ক-গায়িকাদেরকে ক্রয় করতো, অথবা এর অর্থ হলো, কিছু লোক পবিত্র কোরআনকে বাদ দিয়ে গান-বাজানার উপকরণ পছন্দ করতো।

মকহুল (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি গায়িকা নারীদেরকে ক্রয় করে আর মৃত্যু পর্যন্ত ঐ অবস্থায়ই থাকে, আমি তার নামাজে জানাযা পড়াবোনা। কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, (এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) হাসান (রঃ), একরামা (রঃ) এবং সাঈদ এবনে জুবায়ের (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের لهوالحديث শব্দটির অর্থ হলো গান শ্রবণ করা। আর এ সম্পর্কেই আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

আবুস সাহ্বা বাকরী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসঊদ (রাঃ) তিনবার বলেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। لهوالحديث হল গান।

এবনে জুরাহের (রঃ)-এর মতে, لهوالحديث হলো তবলা, ঢোল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বরেছেন, যদিও গান-বাজনা সম্পর্কেই আয়াতটি নাজিল হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে কিসসা-কাহিনী শ্রবণ করা ও অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, لهوالحديث অর্থ সর্ব প্রকার খেলা-ধূলা।

আর যাহ্যাক (রঃ) বরেছেন, এর অর্থ শেরক।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, لهوالحديث হলো,

كل ما شغلك عن عبادة الله وذكره من السمر ولاضاحيك والخرافات والغناء ونحوها

অর্থাৎ যা কিছু মানুষকে আল্লাহ পাকের এবাদত-বন্দেগী এবং তাঁর স্মরণ থেকে বিরত রাখে, যথা খোশগল্প, হাসি-তামাশা, গান-বাজনা প্রভৃতি সবই لهو الحديث এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে আয়াতটি নাজিল হয়েছে, কিন্তু তার মর্মকথা ব্যাপক। যখনই কোন বিষয় মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখবে এবং মানুষকে আদর্শচ্যুত করবে, আল্লাহ পাকের বন্দেগী থেকে এবং তাঁর স্মরণ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবে, সে সবই পাপ এবং চির নিন্দনীয় ও চির বর্জনীয়।

আয়াতের মর্মকথা

মানুষের মধ্যে এমন পাপীষ্ঠ লোকের অভাব নেই, যারা পবিত্র কোরআন পাওয়া সত্বেও নিজেদের মূর্খতা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে খেল-তামাশায় নাচ-গানে লিপ্ত হয়, শুধু তাই নয়; বরং পবিত্র কোরআনের প্রতি উপহাস করে এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে নিজেদের ন্যায় অন্যদেরকেও বঞ্চিত করে, যেমন নজর বিন হারেস তাই করতো।[১]

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯ পৃষ্ঠাঃ ২২৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ৪২৩
তফসীরে রুহুল মাআনী, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠাঃ৬৭

"তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি"।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, অপমানজনক শাস্তি বলার কারণে মোমেন এবং কাফেরদের শাস্তির পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে। আখেরাতে গুনাহগার মোমেনদেরও শাস্তি হবে, তবে তা হবে তাদেরকে পবিত্র করার জন্য, অপমান করার জন্যে নয়, আর কাফেরদের শাস্তি হবে অপমানজনক, অর্থাৎ তারা শুধু শাস্তিই ভোগ করবে না; বরং অপমানিতও হবে।

নাফরমানীর শাস্তি দুনিয়াতেও হয়

আলোচ্য আয়াতে যে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা শুধু যে আখেরাতে হবে তাই নয়, দুনিয়াতেও উপরোল্লেখিত অন্যায় অনাচারের শাস্তি হতে পারে। হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের কিছু লোক মদ্য পান করবে এবং মদের অন্য কোন নাম দিয়ে দেবে। তাদের সম্মুখে বাজনা বাজানো হবে এবং গায়িকারা গান গাইবে। আল্লাহ পাক তাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেবেন। তাদের কিছু কিছু লোককে বানর এবং শুকরেও পরিণত করবেন (এবনে মাজাহ্)।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন আমার উম্মত পনরটি কাজ করবে তখন তাদের উপর বালা-মছিবত নাজিল হবে। আরজ করা হলো, "ইয়া রসূলাল্লাহ! ঐ কাজগুলো কি কি?" তিনি এরশাদ করলেনঃ

১. যখন গণীমতের মালকে সম্পদ মনে করা হবে (অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ রোজগারের জন্যে জেহাদ করা হবে)।

২. যখন আমানতের মালকে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ মনে করা হবে।

৩. যখন যাকাতকে বোঝা মনে করা হবে।

৪. যখন স্বামী স্ত্রীর অনুগত হয়ে যাবে।

৫. সন্তান তার মায়ের অবাধ্য হবে।

৬. বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।

৭. নিজের পিতার উপর জুলুম করবে।

৮. যখন মসজিদে শোর গোল হবে।

৯. যখন সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

১০. মন্দ ও দুষ্ট লোকের সম্মান এজন্যে করা হবে যেন তার দুষ্টুমি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

১১. মদ্য পান করা হবে।

১২. রেশমী কাপড় পরিধান করা হবে (অর্থাৎ পুরুষেরা রেশমী কাপড় পরবে)।

১৩. গায়িকাদেরকে রাখা হবে।

১৪. বাজনা, ঢোল, তবলা ব্যবহার করা হবে।

১৫. পরবর্তী কালের লোকেরা পূর্ব কালের লোকদেরকে লা'নত দেবে, এমন সময় ঝড়-তুফান এবং জমিন ধ্বসিয়ে দেয়ার শাস্তি আপতিত হতে পারে।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আখেরাতের সকল আজাবই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হবে তবে উপরোল্লেখিত অন্যায়কারীদের শাস্তি কঠোর হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত অপমানজনকও হবে। যে বা যারা সারা জীবন ইসলামের অবমাননা করেছে, সত্য দ্বীনের প্রতি উপহাস করেছে তাদের জন্যে অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা থাকাই যুক্তি-যুক্ত।

এখানে একথাও উল্লেখ্য, উপরোল্লেখিত অপরাধ সমূহের প্রকৃত শাস্তিতো আখেরাতেই হবে তবে দুনিয়াতেও এমন লোকদের জন্যে কঠিন-কঠোর শাস্তি রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দূরারোগ্য ব্যধি, মহামারীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়।[১]

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বহু হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমরা তন্মধ্যে থেকে এ পর্যায়ে দু'একখানির উদ্ধৃতি দেয়া জরুরী মনে করি।

এবনে আবিদ্দুনিয়া এবং বায়হাকী হযরত নাফে'র কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি ব:লেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। পথে এক স্থানে একটি রাখালের বাজনার আওয়াজ শ্রুত হলো। তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) তাঁর দুই কানে দু'টি আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এরপর অন্য পথে চললেন। তখন একথা বলে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন, "হে নাফে! এখন সেই বাজনার আওয়াজ শোনা যায়?" আমি যখন না সূচক জবাব দিলাম তখন তিনি তাঁর কান থেকে অঙ্গুলি বের করলেন এবং বললেন, আমি স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনিও এমনিভাবে কর্ণ কুহরে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়েছেন।

ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে সে ব্যক্তির সম্পর্কে যে একটি গায়িকা ক্রয় করে, আর ঐ গায়িকা দিন রাত গান গাইতো (অর্থাৎ নজর এবনে হারেছ)।

হযরত রাফে এবনে হাবসূল মাদানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চারজন মহিলার দিকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না, তন্মধ্যে যাদুকর ও গায়িকা রয়েছে।[২]

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا ...

"আর যখন তার নিকট আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় তখন সে দম্ভ ভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যেন সে তা শ্রবণ করতে পারেনি, তার কর্ণ দু'টি যেন বধির, অতএব

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮২৭
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪

তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও"।

পূর্ববর্তী আয়াতে যে কাফেরদের কথা বলা হয়েছে তারা মুর্খতাবশতঃ নাচ-গান, খেল-তামাশা প্রভৃতি মন্দ কাজে মেতে থাকে, তাদের আরেকটি অবস্থা হলো এই যে, তারা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ আয়াত সমূহ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করার পরিবর্তে দম্ভ ভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়, মনে হয় তাদের কান বধির হয়ে পড়েছে, বা তাদের কানে তালা পড়ে আছে, তারা যেন কিছুই শ্রবণ করতে পারেনি, হে রসূল! আপনি তাদের এ অন্যায়-অনাচারের শাস্তির খবর শুনিয়ে দিন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এ আয়াতে কাফেরদের কয়েকটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

(এক) وَلّٰى যখন দূরাত্মা কাফেরদের নিকট আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা পিঠ ফিরিয়ে নেয, যেন কিছুই নয়, আর জ্ঞান ও হেকমতপূর্ণ কথা থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন নিতান্ত নিন্দনীয় কাজ।

(দুই) مُسْتَكْبِرًا অর্থাৎ তারা যে পবিত্র কোরআনের আয়াত থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে তাই নয়; বরং দম্ভ প্রকাশ করে। কোন ব্যক্তি বা জাতির পতনের জন্যে এই একটি চারিত্রিক দুর্বলতাই যথেষ্ট, কাফেরদের এ দুর্বলতাও ছিল যে তারা ছিল অত্যন্ত অহংকারী।

(তিন) كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا যেন তারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ শ্রবণ করেনি, অর্থাৎ কাফেররা এভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায় যেন তারা পবিত্র কোরআনের আয়াত শ্রবণই করেনি। অহংকারের কারণে এদিকে তারা মনোনিবেশ করেনি।

(চার) كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا যেন তাদের দু'টি কানই বধির, অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ সম্পর্কে তাদের গাফলত এত বেশী যে তাদের কান দু'টি যেন বধির হয়ে পড়েছে। যাদের এ অবস্থা তাদের সম্পর্কে শাস্তির ঘোষণা হয়েছে এভাবেঃ

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

"(হে রসূল!) তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন"।

আলোচ্য আয়াতের بشر শব্দটি بشارت থেকে নিষ্পন্ন, এর অর্থ হলো সুসংবাদ। যেহেতু কাফেরদের জন্যে কোন সুসংবাদ নেই, তাই উপহাস করে বলা হয়েছে, "তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন"।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

"নিশ্চয় যারা ইমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতের বাগান সমূহ"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দুবৃত্ত কাফেরদের অন্যায়-অনাচারের কথা বলা হয়েছে। এরপর তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মোমেনদের

অবস্থা এবং শুভ-পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং সে ঈমান মোতাবেক নেক আমল করে, তাদেরই জন্যে রয়েছে নেয়ামতের বাগান, তারা বেহেশ্‌তের বাগানে বাস করবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا

তাদের জান্নাতের বাগানে অবস্থান সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী হবেনা; বরং তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। আর এটি আল্লাহ পাকের ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি যার ব্যতিক্রম হবেনা কখনো, আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মোমেনদেরকে সওয়াব প্রদানে এবং কাফেরদের শাস্তি বিধানে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা।

الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্ত হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যমণ্ডিত।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

আল্লাহ পাক আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ বিহীন অবস্থায় যা তোমরা লক্ষ্য করছো, আর পৃথিবীর উপর পাহাড়-পর্বত রেখে দিয়েছেন যেন তা হেলে না পড়ে, আর পৃথিবীতে সর্ব প্রকার জীব-জন্তু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমত পূর্ণ।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের ক্ষমতা, সম্মান, শান এবং তাঁর হেকমত ও কৌশল দেখতে চাও তবে তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের প্রতি লক্ষ্য কর। বিশাল বিস্তৃত এই যে নীলাভ আকাশ তিনি তৈরী করে রেখেছেন কোন প্রকার স্তম্ভ ব্যতীত, কিভাবে তা মাথার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান রয়েছে? এ প্রশ্নের একই জবাব, আর তা হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের হুকুমে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক এমনিভাবে বিশাল পৃথিবী নড়া-চাড়া করে না। কেননা পাহাড়গুলোকে আল্লাহ পাক জমিনের উপর বসিয়ে দিয়েছেন এবং হুকুম দিয়েছেন যেন নড়া-চড়া না করে। আর এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাক কত রকম জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন আজ পর্যন্ত কেউ তা শুমার করতে পারেনি। অতএব আসমান জমিনের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকই, তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তিনিই পালনকর্তা ও রিযকদাতা, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○

"আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি; তা দ্বারা পৃথিবীতে সর্বপ্রকার উত্তম,

কল্যাণকর উদ্ভিদ উৎপাদন করি"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক বন্দাদের জন্যে যে রিয্কের ব্যবস্থা করেন তার ঘোষণা রয়েছে অর্থাৎ আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি, আর তা দ্বারা পৃথিবীতে সর্বপ্রকার উত্তম বস্তু উৎপন্ন করি যা মানুষের পানাহারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অতএব, আল্লাহ পাকের সৃষ্টির এসব বিস্ময়কর নমুনা তোমরা দেখছো আর তা দ্বারা তোমরা জীবন-ধারণ করছো। এখন বল, আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদের তোমরা পূজা কর তাদেরও কি কোন সৃষ্টি আছে? যখন কোন সৃষ্টি নেই তখন তারা স্রষ্টা নয়, আর যখন স্রষ্টা নয়, তখন তারা মা'বুদ বা উপাস্যও নয়, অতএব তাদের পূজা করা বা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যারা এমন মূর্খতার পরিচয় দেয়া তারা নিঃসন্দেহে নিজেদের প্রতি জুলুম করে আর শেরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। যারা শেরক করে তারা সব চেয়ে বড় জালেম।[১]

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ
الظّٰلِمُوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ اٰتَیْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ
اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ یَّشْكُرْ فَاِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ
غَنِیٌّ حَمِیْدٌ ﴿۱۲﴾ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشْرِكْ
بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ ﴿۱۳﴾ وَوَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ ۚ
حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشْكُرْ لِیْ
وَلِوَالِدَیْكَ ؕ اِلَیَّ الْمَصِیْرُ ﴿۱۴﴾

তরজমা

(১১) এসবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তিনি ভিন্ন অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও; বরং পাপীষ্ঠরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

(১২) আমি লোকমানকে বিচার-বুদ্ধি দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে আল্লাহ পাকের প্রতি শোকর গুজার হও। যে শোকর আদায় করে সে তার নিজের কল্যাণার্থেই করে; আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (সে তার নিজেরই ক্ষতি করে) কেননা, আল্লাহ পাক অভাবমুক্ত, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ৪২৪
তফসীরে এবনে কাসীর, পারা-২১, পৃষ্ঠা-৪২

(১৩) স্মরণ কর সে সময়কে যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল, 'হে আমার পুত্র! আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করোনা; নিশ্চয় শেরক হলো ভয়ংকর জুলুম"।

(১৪) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে অত্যন্ত কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভ ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু' বছরে। অতএব, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতিও। অবশেষে আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াতে কাফের মুশরেকদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে তোমরা দেখছো বিরাট আকাশ কিভাবে স্তম্ভ বিহীন অবস্থায় রয়েছে, আর ভূমণ্ডলে কিভাবে পাহাড়গুলো বসে আছে এবং জমিনকে স্থবির করে রেখেছে এবং অগণিত জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এমনিভাবে বারি বর্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় পৃথিবীতে সবুজের মেলা, শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ফসলের মাঠ। এসব কিছুই তো আল্লাহ পাকের দান, এ অনন্ত অসীম দান ভোগ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না, তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস কর না; বরং তাঁর সাথে তোমরা শেরক কর। আর তিনি ব্যতীত যাদের তোমরা পূজা কর তারা কি কোন কিছু সৃষ্টি করেছে? যখন তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি, এমন ক্ষমতাও তাদের নেই, তখন তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বন্দেগী না করে নিজেদের হাতে বানানো মূর্তির সম্মুখে কেন মাথা নত কর? কোন্ যক্তিতে তাঁর সাথে শেরক কর?

بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

'বরং এ জালেমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে'।

অর্থাৎ যাদের পথভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট, বুদ্ধিমান মাত্রই এ সত্য অনুধাবন করে যে তারা দিশেহারা, তারা পথভ্রষ্ট। আলোচ্য আয়াতে জালেম বলা হয়েছে মুশরেকদেরকে, কেননা জুলুম হলো কোন জিনিসকে তার সঠিক স্থানে না রাখা, যারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যদের পূজা করে, তারা তাদের এবাদত-বন্দেগীর যোগ্য নয় এমন স্থানে বন্দেগী নিয়ে উপস্থিত হয়, তাই তাদেরকে জালেম বলা হয়েছে। আর যারা জালেম, তারা পথভ্রষ্ট এবং তাদের এ পথভ্রষ্টতা গোপন নয়; বরং দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ

'আমি লোকমানকে বিচার বুদ্ধি দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরেকদের বাতিল আকীদার কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা যে মূর্খতা,

অজ্ঞতা ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে শেরক করে একথাও বলা হয়েছে। এজন্যে হেদায়েত ও হেকমতের প্রতীক এ পবিত্র গ্রন্থ নাজিল হয়েছে যাতে করে মূর্খতার অন্ধকারে যারা আচ্ছন্ন রয়েছে, তাদেরকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসা যায়। কাফের-মুশরেকদের কর্তব্য ছিল এ মহান গ্রন্থকে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত মনে করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু কাফের মুশরেকরা এ মহান গ্রন্থের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতো দূরের কথা বরং তারা এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে, এ নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক লোকমান হাকীমের হেকমতপূর্ণ কথা-বার্তার উল্লেখ করেছেন। তিনি কিভাবে তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন, তার বর্ণনা রয়েছে। লোকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে তৌহীদ, এখলাস এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর গুজারী, চরিত্র-মাধুর্য ও নৈতিক গুণাবলী অর্জনের জন্যে উপদেশ দিয়েছেন।

হেকমতের তাৎপর্য

এসবই হলো হেকমতের কথা, বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান-গুণের কথা, এবং এসব কথাই হলো সার্বিক কল্যাণ লাভের এবং সাফল্য অর্জনের পথ। আর এসব উপদেশ মনে রাখার মতো এবং আমল করার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ

আর নিশ্চয় আমি লোকমানকে দান করেছি এলম এবং হেকমত, জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি, ধী-শক্তি আর এসবই হলো সকল নেয়ামতের মূল উৎস। আর লোকমানের প্রতি এসবই ছিল আমার নেয়ামত, অতএব মানুষের কর্তব্য হলো লোকমান হাকীমের এ উপদেশ সমূহ স্মরণ রাখা এবং তার উপর আমল করা। কোন এলম যত মূল্যবানই হোক, যদি তার উপর আমল না করা হয়, তবে ঐ এলম কোন কাজে আসেনা, এলমের সঙ্গে আমল যখন একত্রিত হয় তখন তা হয় হেকমত। আর ঐ হেকমত দ্বারাই মানুষ জীবন-পথের সঠিক সন্ধান পায়। এজন্যে আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীমে হেকমত সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا (সূরা বাকারা)

"আর যাকে হেকমত প্রদান করা হয়েছে তাকে অনেক কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে"।

অর্থাৎ হেকমতের মধ্যেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। অন্যথায় আমল ব্যতীত এলম অকেজো। হেকমতের মধ্যে দু'টি বিষয় রয়েছে। এক, সঠিক এলম বা সত্যোপলব্ধি, দুই, এলম অনুযায়ী আমল।

লোকমানকে যে এলম দান করা হয়েছে তা এলহামের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে, কেননা লোকমান নবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন হাকীম বা জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁর প্রতিটি কথা ছিল হেকমতপূর্ণ।

লোকমান কি নবী ছিলেন?

অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে, লোকমান নবী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। উন্নততর আদর্শের অধিকারী ছিলেন তিনি, অত্যন্ত গুণী-জ্ঞানী হিসেবে তাঁর জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ সমূহ নবী রসূলগণের উপদেশের ন্যায় হতো। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, পরিণামদর্শী এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক তাঁর কথার উল্লেখ করার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেন যে ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, লোকমান কি নবী ছিলেন? ওহাব বলেন, না। তিনি অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত লোকমানকে অধিকার দেয়া হয়েছিল যে নিজের জন্যে নবুওয়্যত অথবা হেকমতকে পছন্দ কর, লোকমান হেকমতকে পছন্দ করেছেন।

আল্লামা বগভী (রাঃ) লিখেছেন, হযরত লোকমান দ্বিপ্রহরে নিদ্রিত ছিলেন। স্বপ্নেই গায়বী আওয়াজ শ্রবণ করলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হে লোকমান! তুমি কি চাও যে আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে তোমাকে ক্ষমতা দান করুন যেন তুমি সঠিকভাবে ক্ষমতা পরিচালনা কর। অথবা তোমাকে হেকমত দান করা হোক। স্বপ্নেই লোকমান জবাব দিলেন, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে উভয় বিষয়ের মধ্যে পছন্দ করার অধিকার দিয়ে থাকেন তবে আমি হেকমতই পছন্দ করি, হুকুমত নয়। কিন্তু যদি আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে হুকুমত গ্রহণ করার আদেশ হয়ে থাকে তবে আমি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি যে আল্লাহ্ পাক আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবেন এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে আমাকে রক্ষা করবেন। পুনরায় গায়বী আওয়াজ আসল, লোকমান তুমি হুকুমতের স্থলে হেকমত কেন পছন্দ করলে? লোকমান বললো, যদি আমার প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো যে তিনি আমাকে হুকুমত দান করবেন তবে আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই দিয়ে দিতেন। কিন্তু যেহেতু জিজ্ঞাসা করেছেন, তাতে একথা প্রমাণিত হয় যে এতে আল্লাহ্ পাকের মর্জি নেই, আর এ অবস্থায় যদি স্বেচ্ছায় আমি তা গ্রহণ করি তবে ক্ষমতা পরিচালনায় আল্লাহ্ পাকের সাহায্য পাব না। তাই হুকুমতের স্থলে আমি হেকমত গ্রহণ করলাম।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, লোকমান বলেছেন, বিভিন্ন সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণে চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, এমন অবস্থায় যদি লোকমানের সিদ্ধান্ত সঠিক হয় তবে সে নাজাত লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে, আর যদি তার ভুল হয়ে যায় তবে সে জান্নাতের পথ হারিয়ে ফেলবে। দুনিয়াতে নেতা হওয়ার চেয়ে নিম্নে থাকা উত্তম, যে ব্যক্তি আখেরাতের স্থলে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তবে তার হাত থেকে দুনিয়া তো যায়ই, আখেরাতও আসেনা। ফেরেশতাগণ লোকমানের এসব হেকমতপূর্ণ কথা শ্রবণ করে আশ্চর্যন্বিত হন। একদিন নিদ্রিত অবস্থায় আল্লাহ্ পাক লোকমানকে হেকমত দান করলেন, জাগ্রত হয়ে তিনি

হেকমতপূর্ণ কথা বলতে লাগলেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হযরত দাউদ (আঃ)-কেও হুকুমত এবং হেকমত যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়, হযরত দাউদ (আঃ) নিঃশর্তে হুকুমত গ্রহণ করেন, ফলশ্রুতিতে কয়েকবার তাঁর দ্বারা কিছু ভুলও হয়, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকবারই তাঁকে মাফ করে দেন। হযরত লোকমান তাঁর হেকমত দ্বারা হযরত দাউদ (আঃ)-কে সাহায্য করতেন।[১]

লোকমান সম্পর্কে আরও কথা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত লোকমান সম্পর্কে লিখেছেনঃ অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন ওলী আল্লাহ্, অত্যন্ত পরহেযগার এবং আল্লাহ্ পাকের অতি প্রিয় বন্দা।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে লোকমান ছিলেন হাবশী গোলাম এবং একজন কাঠ মিস্ত্রী।

হযরত জাবের (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, হযরত লোকমান উচ্চতায় ছিলেন স্বল্প দৈর্ঘ্যের, ওষ্ঠদ্বয় ছিল মোটা।

হযরত সাঈদ এবনুল মুসায়্যেব (রঃ) বর্ণনা করেনঃ লোকমান ছিলেন মিশরেরর অধিবাসী তবে হাবশী ছিলেন। তাঁকে আল্লাহ্ পাক হেকমত দান করেছিলেন, নবুওয়্যত নয়।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন হাবশী গোলামকে এরশাদ করেছেনঃ বর্ণের জন্যে নিজেকে ছোট মনে করোনা, মানুষের মধ্যে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত উত্তম, আর তিনজনই কৃষ্ণবর্ণের ছিল। হযরত বেলাল (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গোলাম ছিলেন। হযরত মাহজা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোলাম ছিলেন আর হযরত লোকমান হাকীম।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এ পর্যায়ে তিনি চারজনের উল্লেখ করেছেন। লোকমান, আবিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী, বেলাল এবং মাহজা।

আবু মুসলিম খওলানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ লোকমান এমন এক বন্দা ছিলেন, যিনি সর্বদা চিন্তা করতেন, মানুষ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতেন এবং অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। তিনি আল্লাহ্ পাককে ভালবেসেছিলেন, তাই আল্লাহ্ পাক তাঁকে ভালবেসেছিলেন, আল্লাহ্ পাক তাঁকে হেকমত দান করেছিলেন।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ একবার হযরত লোকমানকে তাঁর মুনীব আদেশ দিলেন যে একটি বকরী জবেহ্ কর এবং বকরীর উত্তম দু'টি অংশ আমার নিকট

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৯ পৃষ্ঠা-২৪৬-৪৭
২। তফসীরে আদুররুল মনসুর, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৭৫

নিয়ে আস, তখন তিনি বকরীর কলিজা এবং জিহ্বা নিয়ে আসলেন। কিছুদিন পর লোকমান হাকীমকে তাঁর মুনীব আদেশ দিলেন, বকরী জবেহ্ কর এবং তার মন্দ দু'টি অংশ নিয়ে আস, তিনি ঐ দু'টি অংশই পুনরায় হাযির করলেন। তাঁর মুনীব জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তম অংশ যখন চেয়েছি তখনও তুমি এ দু'টি অঙ্গই নিয়ে এসেছ, আর যখন মন্দ অংশ চেয়েছি তখনও এ দু'টিই হাযির করেছ, এর কারণ কি? তিনি বললেন, কলিজা এবং জিহ্বা যদি ভাল থাকে তবে এর চেয়ে ভাল কোন অঙ্গ নেই, আর যদি এ অঙ্গ দু'টি মন্দ হয় তবে এর চেয়ে মন্দও কোন অঙ্গ নেই।

বর্ণিত আছে, লোকমান হাকীম যে বাগানের দেখা-শুনার দায়িত্বে ছিলেন, তার মালিক একবার বাগান পরিদর্শন করতে আসলেন, তিনি বাগানের আম খেতে চাইলেন তবে প্রথমে লোকমানকেই খেতে দিলেন, লোকমান সহজ স্বাভাবিকভাবেই আম খেয়ে ফেললেন, এরপর বাগানের মালিক আম মুখে নিয়ে দেখলেন যে তা অত্যন্ত টক, তখন তিনি লোকমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত টক কিন্তু তুমি সহজভাবে কিভাবে খেলে? তিনি বললেন, জনাব আপনার হাত থেকে যা পেয়েছি তা টক হওয়ার কারণে ফিরিয়ে দেব কিভাবে? একবার লোকমান হাকীম বণী ইসরাঈলের এক মজলিসে ওয়াজ করছিলেন। একজন চাষী দাঁড়িয়ে বললো, তুমি কি সে ব্যক্তি নও যে আমার সঙ্গে অমুক অমুক স্থানে বকরী চরাতে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি সে ব্যক্তিই। তখন চাষী বললো, তাহলে তুমি এ উচ্চ মর্তবা কিভাবে লাভ করলে? তিনি বললেন, সত্যবাদিতা এবং অহেতুক কথা না বলার কারণে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেনঃ তাঁর উচ্চ মর্তবার কারণ হলো আল্লাহ পাকের দান, আমানতদারী, সত্যবাদিতা, অহেতুক কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একথাও বলেছেন তিনি যে নবী ছিলেন না, তার একটি প্রমাণ এই, তাঁর সম্পর্কে একথা সর্বজন-বিদিত যে তিনি গোলাম ছিলেন। আর গোলামী নবুওয়্যতের শানের খেলাফ। নবী সর্বদা সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বংশীয় লোক হয়ে থাকেন। এজন্যেই অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম একমত যে তিনি নবী ছিলেন না।

হযরত আবু দরদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত লোকমান হাকীম কোন উচ্চ বংশীয় লোক ছিলেন না কিন্তু চরিত্র-মাধুর্য ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, মানুষের সঙ্গে তিনি মধুর ব্যবহার করতেন, সর্বদা নীরব থাকতেন, চিন্তা করতেন, দিনে নিদ্রিত হতেন না, মানুষের সামনে থুথু ফেলতেন না, এমনিভাবে মানুষের সামনে প্রস্রাব-পায়খানা এবং গোসলও করতেন না। অহেতুক কাজ থেকে দূরে থাকতেন, হাসতেন না। যে কথাই বলতেন তা হতো হেকমতপূর্ণ, তাঁর সন্তানের মৃত্যু হলে তিনি ক্রন্দন করেননি। তিনি বাদশাহ এবং আমীরদের দরবারে এজন্যে যেতেন যেন সেখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ

"এবং আমি লোকমানকে হেকমত দান করেছি"।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের "হেকমত" শব্দ দ্বারা ইসলামের মর্মার্থের সঠিক উপলব্ধিকে বোঝানো হয়েছে।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের "হেকমত" শব্দের অর্থ বুদ্ধি-জ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধি। আল্লাহ পাক লোকমান হাকীমকে এ আদেশ দিয়েছেন, তোমাকে অন্যদের উপর যে প্রাধান্য এবং বৈশিষ্ট্য দান করেছি, তার জন্যে তুমি আমার শোকর আদায় কর।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের "হেকমত" শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন ভাবে। এর অর্থ হলো সঠিক এলম সঠিক আমলের সঙ্গে (মাদারেক)।

ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, হেকমত হলো এলমের উপর আমলের তওফিক পাওয়া।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, হেকমত অর্থ হলো বুদ্ধি-বিবেচনা।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে আমি লোকমানকে বলেছি, হে লোকমান! তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ

"আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার নিজের উপকারার্থেই করে"।

কেননা, কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আল্লাহ পাকের কোন উপকার নেই এবং তাঁর এর কোন প্রয়োজনও নেই, বরং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজেই এর দ্বারা উপকৃত হয়।

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ○

"আর যে না-শোকরী করে তাতে আল্লাহ পাকের কিছু যায় আসে না"।

অর্থাৎ এতে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না। কেননা তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই, তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, কারো প্রশংসারও তাঁর প্রয়োজন নেই, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা না করুক তাতে তাঁর কিছু যায় আসেনা।

শোকরের তাৎপর্য

শোকরের তাৎপর্য হলো, নেয়ামত দাতার নেয়ামতের কথা স্বীকার করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, শোকর তিন প্রকার। ১. মনে মনে নেয়ামত দাতার এহসানের কথা চিন্তা করা। ২. রসনা দ্বারা নেয়ামত দাতার প্রশংসা করা। এবং ৩. সর্বাঙ্গ দ্বারা নেয়ামত দাতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

শোকর রসনা দ্বারা হয়, আমল দ্বারাও হয় এবং নিয়ত দ্বারাও হয়। অর্থাৎ রসনা দ্বারা আল্লাহ পাকের হামদ ও শোকর করা, দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ-প্রতঙ্গকে সর্বদা আল্লাহ পাকের আনুগত্যে মশগুল রাখা এবং একথার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ পাকই আমার

মওলা।

وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ

অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করবে সে তা তার উপকারার্থেই করবে। কেননা শোকর আদায়ের কারণে লব্ধ সম্পদ সংরক্ষিত হয় এবং নেয়ামত বৃদ্ধি পায়, তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ (সূরা ইব্রাহীম)

"যদি তোমরা আমার শোকর আদায় কর তবে আমি তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে দেব"।

দ্বিতীয়ত শোকর গুজারীর কারণে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ হয় এবং চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের ব্যবস্থা হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক দু'জন নবীকে "শোকর গুজার বন্দা" বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ (সূরা নহল)

অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নেয়ামতের শোকর গুজার।

আর হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (সূরা বণী ইসরাঈল)

অর্থাৎ সে ছিল অত্যন্ত শোকর গুজার বন্দা।[১]

হযরত লোকমানকে আল্লাহ পাক যে হেকমত তথা জ্ঞান-বুদ্ধি, সত্যোপলব্ধি দান করেছেন তা ছিল অসাধারণ। এ অসাধারণ জ্ঞান-গুণের একটি দাবী হলো তিনি যেন স্বয়ং মহান দাতা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিদেরকেও উপযোগী শিক্ষা দান করেন। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে লোকমান হাকীমের উপদেশের উল্লেখ রয়েছে যা তিনি তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ

"আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল, "হে আমার পুত্র! আল্লাহ পাকের সাথে কখনো শেরক করো না"।

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

"নিশ্চয় শেরক ভয়ংকর জুলুম, জঘন্য মহাপাপ, মারাত্মক অপরাধ"।

শেরক হলো মহা পাপ

লোকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে সর্বপ্রথম যে নসীহত করেছেন তা আল্লাহ পাকের হক্ব

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৪৯-৫০

সম্পর্কে, অর্থাৎ শুধু এক আল্লাহ্ বন্দেগী করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।

বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, যখন এ আয়াত

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (সূরা আনআম)

নাজিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কেননা আয়াতের অর্থ হলো, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে একত্রিত করেনি, অর্থাৎ কোন প্রকার গুনাহ করেনি। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, কোন গুনাহ করেনি? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এ জুলুম অর্থ সাধারণ গুনাহ নয়, বরং লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দেয়ার সময় যে জুলুমের উল্লেখ করেছিলেন, তা হলো সে জুলুম যে সম্পর্কে লোকমান বলেছিলেন, 'বৎস! আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করোনা, শেরক হল মারাত্মক জুলুম'।[১]

হযরত লোকমানের প্রথম নসীহত ছিল হক্কুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ পাকের হক্ব সম্পর্কে, এরপর হক্কুল এবাদ সম্পর্কে কথা হওয়া সমীচিন। আর বন্দার হক্বের মধ্যে মানুষের উপরে সর্বাধিক হক্ব হলো তার পিতা-মাতার, লজ্জার কারণে হযরত লোকমান তার পুত্রকে পিতা-মাতার হক্ব সম্পর্কে কিছু বলেননি। হয়তো পুত্র এ সম্পর্কীয় নসীহতকে পিতার স্বার্থ-যুক্ত মনে করবে। এজন্যে আল্লাহ্ পাক এ পর্যায়ে পিতা-মাতার হক্ব সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে"।

পিতা-মাতার হক্ব

এর দ্বারা পিতা মাতার হক্ব আদায়ের তাগিদ করা হয়েছে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর শোকর গুজার হওয়া এবং তাঁর বন্দেগী করা। এরপর তার পিতা-মাতার হক্ব আদায় করা। কেননা পিতা-মাতাই তার সন্তানকে লালন-পালন করে। পিতার সেবা-যত্ন তখন হয় যখন সন্তান বোধ শক্তি সম্পন্ন হয় কিন্তু মা তখন সন্তানকে যত্ন করে যখন সে কিছুই খবর রাখেনা এবং কিছুই বোঝেনা। এজন্যে আলোচ্য আয়াত মায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ

অর্থাৎ তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু' বছরে।

গর্ভে ধারণের এক বছর এবং তারপর দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত দু'বছর, মোট এই তিন বছর যাবত মাকে তার প্রত্যেক সন্তানের জন্যে চরম কষ্ট ভোগ করতে হয়, এজন্যে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেনঃ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

অর্থাৎ হে মানব জাতি! প্রথমে আমার শোকর আদায় কর কেননা, আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদের পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর কেননা তোমার লালন-পালনে তাদের দান অসামান্য, অতএব আল্লাহ পাকের শোকর গুজারীর পর পিতা-মাতার প্রতি-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সন্তান মাত্রেরই একান্ত করণীয় কাজ।[১]

إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝

"আর তোমাদের প্রত্যেককে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে"।

কে আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো আর কে অকৃতজ্ঞ হলো, এমনিভাবে কে পিতা মাতার হক্ব আদায় করলো, আর কে করলো না তার হিসাব সেদিনই হবে।

এখানে উল্লেখ্য, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এহসান এবং অবদান নিঃসন্দেহে অসামান্য কিন্তু তা শুধু দুনিয়ার এ জীবনেই সীমিত, আর আল্লাহ পাকের নেয়ামত অনন্ত অসীম। আর তা শুধু দুনিয়াতেই সীমিত নয়; বরং দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে বিস্তৃত। অতএব, আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকা এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে সর্বদা তৎপর থাকা বন্দা মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

১। পিতা-মাতা হক্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে, দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন, খণ্ড–১৫,পৃষ্ঠা ১৩৪-৪৬।

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ

يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا

تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

তরজমা

(১৫) আর যদি তোমার পিতা-মাতা আমার সাথে এমন কোন কিছুকে শরীক করার জন্যে তোমার উপর পীড়াপীড়ি করে যার কোন জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবেনা। অবশ্য দুনিয়াতে তাদের সাথে ভাল ভাবে বসবাস করবে, আর যে আমার প্রতি মনোনিবেশ করেছে তার পথ অনুসরণ কর, অবশেষে তোমাদেরকে আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো।

(১৬) হে বৎস! কোন কিছু যদি শরিষার দানা পরিমাণও হয়, আর তা কোন পাথরের মধ্যে বা আসমানে অথবা পৃথিবীতে কোথাও থাকে তবে আল্লাহ্ পাক তা-ও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্তদ সূক্ষ্মদর্শী এবং সব বিষয় সম্পর্কে অবগত।

(১৭) হে বৎস! নামাজ কায়েম কর এবং সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় তা অত্যন্ত বড় সৎ সাহসের কাজ।

(১৮) আর মানুষের সম্মুখে তোমার গাল ফুলিয়ে বসোনা (মানুষকে অবজ্ঞা করোনা), আর মাটির উপর দম্ভ ভরে চলাফেরা করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক কোন অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে পিতা-মাতার হক্ব আদায়ের তাগিদ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি পিতা মাতা শেরক করার-তথা আল্লাহ পাকের নাফরমানীর আদেশ দেয় তবে তা মানা অবৈধ, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেনঃ আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্টির আদেশ পালন করা বৈধ নয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ

"আর যদি তোমার পিতা-মাতা আমার সাথে শরীক করার জন্যে পীড়াপীড়ি করে যার কোন জ্ঞান তোমার নেই তবে তুমি তাদের কথা মানবে না"।

মাতা-পিতা বা অন্য কেউ যদি শরীয়ত বিরোধী কাজের আদেশ দেয় তবে তা মানতে নেই।

مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

অর্থাৎ পিতা-মাতা যদি এমন কিছুকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করার কথা বলে যার মা'বুদ হওয়ার কথা তোমার জানা নেই, তবে পিতা-মাতার এমন আদেশ তুমি মানবে না।

মূলতঃ ত্রিভূবনে এমন কিছুর অস্তিত্বই নেই যাকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করা যায়, কাজেই এমন কিছু সম্পর্কে জানার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকলে তা জানা যায়, আর না থাকলে জানার কোন সম্ভাবনা থাকেনা। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, শেরক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, পৃথিবীতে এমন কোন কিছু নেই যাকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করা যায়, তাই পিতা-মাতা বা অন্য কারো কথায় আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যায় না, এ ব্যাপারে কারো কোন কথা মানা যায় না।

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

"দুনিয়াতে তাদের সাথে ভাল ভাবে সহ-অবস্থান কর"।

এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে পিতা-মাতা কাফের হলেও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয় তবে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করাও কর্তব্য।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার নিকট আমার মা এসেছেন, তখন তিনি মুশরেক ছিলেন, আর তিনি সাহায্যপ্রার্থী, আমি কি তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ, তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ।

ঈমানের দৃঢ়তা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) তেবরানীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত সা'দ এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত আমার সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, আমি আমার মায়ের অনেক খেদমত করতাম, আমি তাঁর সম্পূর্ণ অনুগত ছিলাম, যখন আল্লাহ্ পাক আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওফিক দান করলেন তখন আমার মা আমার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন এবং আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, যদি তুমি ইসলাম পরিত্যাগ না কর তবে আমি পানাহার ত্যাগ করে মৃত্যু বরণ করবো। আমি একথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও ইসলাম পরিত্যাগ করিনি। এদিকে তিনি পানাহার ছেড়ে দিলেন। চতুর্দিক থেকে আমাকে ভৎর্সনা করা হলো যে, এ ব্যক্তি তার মায়ের ঘাতক। ঐ অবস্থায় আমি তাঁকে রাজি করার অনেক চেষ্টা করলাম, অনেক খোশামোদ করলাম যে তুমি জেদ ছেড়ে দাও, আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে পারবোনা। এরই মধ্যে তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত করলেন, তখন তার অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়লো। আমি আমার মায়ের নিকট গিয়ে বললাম, হে আমার মা! তুমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় কিন্তু আমার দ্বীন থেকে প্রিয় নও, আল্লাহর শপথ! তোমার তো মাত্র একটিই প্রাণ, যদি তোমার একশটি প্রাণ হয়, আর তা একটি একটি করে বের হয়ে যায় তবুও আমি সত্য ধর্ম ইসলামকে ত্যাগ করতে পারবো না। আমার একথা শ্রবণ করে মা নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং পানাহার শুরু করলেন।[১]

وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ

"আর যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে মনোনিবেশ করেছে তার অনুসরণ কর"।

আয়াতের মর্মকথা

আয়াতের মর্মকথা এই, যদি পিতা-মাতা কাফের-মুশরেক বা বিধর্মী হয় তবে দ্বীনি ব্যাপারে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবেনা কিন্তু দুনিয়ার ব্যাপারে তবু তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা কর্তব্য হবে। "আর দ্বীনি ব্যাপারে সে ব্যক্তির অনুসরণ কর যে আমার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করেছে"। অর্থাৎ যারা নেককার বন্দা, যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের পথের পথিক, দ্বীনি ব্যাপারে শুধু তাদেরই অনুসরণ কর। পিতা-মাতা তোমার দেহের মুরুব্বী, কিন্তু আল্লাহ ওয়ালাগণ তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির মুরুব্বী। অতএব, যে আল্লাহর পথে চলে তুমি সে পথেই চল এবং তার পরিপূর্ণ অনুসরণ কর। ইনশাআল্লাহ! এভাবেই তুমি আল্লাহ পাকের নিকট পৌঁছবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিছেছেন, আলোচ্য আয়াতের سبيل শব্দের অর্থ দ্বীন, আর من اناب বাক্য দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৪৬

তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীকার আতা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ

বাক্য দ্বারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইসলাম গ্রহণ করেছেন? আপনি কি এই ব্যক্তিকে সত্য মনে করেছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তিনি সত্য, তোমরাও তাঁর প্রতি ঈমান আন। এরপর তিনি সকলকে নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন এবং তাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁরা সে সব লোক যাঁরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলমান হয়েছিলেন। আল্লাহ পাক এ আয়াতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি পিতা-মাতা সন্তানকে আল্লাহর জিকর এবং নফল এবাদত থেকে বিরত রাখে বা প্রয়োজনের চেয়ে অধিক অর্থ-সম্পদ রোজগারের আদেশ দেয়, তখন কি করণীয়?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ)-এর মতে, এমন হুকুম পালন করা ওয়াজিব নয়, কেননা আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে নেককার লোকদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর নফল এবাদত, দুনিয়া পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু বর্জন করা এবং সর্বদা আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা নেককার মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। যেমন সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের জন্যে তথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নিজের মাতৃ-ভূমি থেকে হিজরত করেছেন, অনেকে পিতা-মাতার মতের বিরুদ্ধে ইসলামের জন্যে জান-মালের অসাধারণ কোরবানী দিয়েছেন। কাজেই সত্যিকার অর্থে তাঁরাই আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করেছেন।

হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত জোবায়ের (রাঃ) বলেছেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পিতা আবু কাহাফা তাঁকে বললেন, আমি লক্ষ্য করছি, তুমি দুর্বল বাঁদীদের আযাদ করছো, যদি তুমি তাদের স্থলে শক্তিশালী গোলামদেরকে আযাদ করতে তবে তা তোমার জন্য ভাল হতো, কেননা তারা তোমার হেফাজত করতো এবং তোমার পক্ষ থেকে দুশমনের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যেত। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমি দুর্বল গোলামদের আযাদ করছি সে সওয়াবের নিয়তে যা আল্লাহর কাছে রয়েছে। তখন এ আয়াত

وَسَیُجَنَّبُهَا الْاَتْقَی ○ الَّذِیْ یُؤْتِیْ مَالَهٗ یَتَزَکّٰی ○ (১)

নাজিল হয়। এটি সেই সময়ের ঘটনা যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত আমের এবনে ফোহায়রা (রাঃ), হযরত উম্মে আমীস (রাঃ) এবং হযরত জোবায়ের (রাঃ) প্রমুখকে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, হযরত আবু বকর (রাঃ) চার হাজার দেরহাম সঙ্গে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করেছিলেন, তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে কিছুই রেখে যাননি, আর এ কাজটিও তাঁর পিতা আবু কাহাফার মতের খেলাফ ছিল।

ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○

এরপর অর্থাৎ এই দুনিয়ার জীবন যাপনের পর তোমাদের সকলকে আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদেরকে অবগত করবো, তোমরা কে কি করেছিলে।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ

আলোচ্য আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত সা'দ এবনে মালেক (রাঃ) সম্পর্কে। তবে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এবং আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ

"হে বৎস! নিশ্চয় যদি শরিষার দানা পরিমাণও কিছু হয় আর তা থাকে পাথরের মধ্যে বা আকাশে অথবা মাটির নিচে, আল্লাহ পাক তা-ও উপস্থিত করবেন"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, তিনি অন্তর্যামী, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, একটি ক্ষুদ্রতম শস্য দানাও যদি কোন পাথরের ভেতর থাকে, অথবা আসমানে বা মাটির নিচে পড়ে থাকে, আল্লাহ পাক তা-ও হাযির করবেন।

বস্তুতঃ সমগ্র সৃষ্টি জগতের সব কিছুই আল্লাহ পাকের নখদর্পণে, কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে থাকতে পারে না। লোক-চক্ষুর অন্তরালে অনেক কিছুই গোপন থাকে কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন থাকেনা, সব কিছুই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান। আলোচ্য আয়াতের انها দ্বারা কোন চরিত্র বা কোন কর্ম বা কোন কথা ভাল-মন্দ এসব কিছুকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট প্রকাশ্য।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, انها এর সর্বনামটি দ্বারা পাপকার্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা হযরত লোকমানের পুত্র তাঁকে বলেছিল, হে আমার পিতা! আমি যদি গোপনে কোন পাপ কাজ করি কেউ তা না জানে, এ অবস্থায় আল্লাহ পাক কিভাবে জানবেন? তারই জবাবে হযরত লোকমান একথা বলেছেন, যার উদ্ধৃতি আল্লাহ পাক প্রদান

করেছেন।

حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ

এর দ্বারা সামান্যতম পরিমাণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আসমানে বা জমিনে বা পাথরের নিচে, কোন গোপনতম প্রকোষ্ঠে এবং সম্পূর্ণ সংরক্ষিত স্থানে যদি কোন কিছু থাকে আল্লাহ্ পাক সেখান থেকেও ঐ জিনিসটি নিয়ে আসবেন।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, صخرة অর্থ পাথর তবে এর দ্বারা পাহাড়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের صخرة শব্দটির অর্থ হলো সেই পাথর, যা জমিনের সাতটি স্তরের নিচে রয়েছে, যেখানে কাফের এবং পাপীষ্ঠদের আমলের বিরবণ সংরক্ষিত থাকে।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক জমিনকে একটি মাছের উপর সৃষ্টি করেছেন, এ মাছটি পানির অভ্যন্তরে পাথরের পাহাড়ের উপর রয়েছে, ঐ পাহাড়টি একজন ফেরেশতার পৃষ্ঠদেশের উপর রয়েছে, ঐ ফেরেশতা একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর ঐ পাথরটি শূণ্যে রয়েছে।[১]

হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দেয়ার সময় যে صخرة শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হলো সেই পাথর। এক কথায় বলা যায়, আল্লাহ্ পাকের নিকট মানুষের কোন আমল গোপন থাকেনা। রাতের অন্ধকারে যা হয় বা পাহাড়ের অভ্যন্তরে যা থাকে অথবা আকাশে বা পাতালে যা কিছু হয়, এর কোন কিছুই আল্লাহ্ পাকের অজানা নয়। মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের খবরও তিনি রাখেন। যাবতীয় গোপনতম, ক্ষুদ্রতম, এমনকি সূক্ষ্মতম বস্তু সম্পর্কেও আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, হযরত লোকমানের এ সব নসীহত যেহেতু অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ এজন্যে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ ভাল কাজ করুক বা মন্দ আর তা যত সামান্যই হোক না কেন, ভাল কাজ হলে পুরস্কার এবং মন্দ কাজ হলে শাস্তি কেয়ামতের দিন অবশ্যই হবে। কেননা আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। রাতের অন্ধকারে একটি ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা যখন এদিক সেদিক আসা-যাওয়া করে তখন তার পায়ের যে শব্দ হয় তা-ও আল্লাহ্ পাক জানেন।

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সব কিছুর খবর রাখেন"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের এলম সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৫ পৃষ্ঠা-২৫৪

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত লোকমানের জীবনের এটিই ছিল শেষ বাক্য। এ বাক্যটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরে এমন ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় যে কারণে তাঁর কলিজা ফেটে যায় এবং তিনি এ ক্ষণস্থায়ী জগত থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।[১]

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ

"হে বৎস! নামাজ কায়েম কর, মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ"।

অর্থাৎ যথা নিয়মে নামাজ আদায় কর। নামাজ দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ। নামাজ ঠিক রাখার মাধ্যমেই দ্বীন ঠিক থাকে। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে, মানুষের পরিপূর্ণতা অর্জনে, নৈতিক মানের উন্নয়নে, সর্বোপরি আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জনে নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই যথা নিয়মে, সঠিক ভাবে নামাজ আদায় করার মাধ্যমেই জীবন-সাধনার সার্থকতা অর্জিত হয়। এরপর অন্যদেরকেও ভাল কাজের নির্দেশ দাও।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ঠিক না হলে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন যেমন ঠিক হয়না, ঠিক তেমনি জাতীয় জীবনেও শান্তি ও নিরাপত্তা আসেনা, তাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য নয়; বরং সমাজ ও জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধনই ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্যে নামাজের মাধ্যমে আত্ম সংশোধনের পর সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার নিমিত্তে ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করার বিধান পেশ করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে সৎ কাজের আদশ দেয়ার এবং মন্দ কাজে নিষেধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। লোকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط

"এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ কর"।

সৎ কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করা একান্ত জরুরী কিন্তু কাজটি সহজ নয়; এক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি আসতে পারে, অন্যায়-অত্যাচারের তথা বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়াও অসম্ভব নয়। সত্য-সাধনায় যদি কোন বিপদাপদ আসেও তবে সবর অবলম্বনই হলো ঐ অবস্থায় একমাত্র কর্মসূচী।

اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

"নিশ্চয় এটি হলো অত্যন্ত বড় সৎ সাহসের কাজ"।

মন্দ কাজে বাধা দেয়া আদৌ নিঃস্কন্টক কাজ নয়, এটি একটি মহান কর্তব্য, আর এ কর্তব্য পালনে বিপদাপদের মোকাবেলা করে সত্যের উপর অবিচল থাকা অত্যন্ত বড়

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৫৫

কাজ। যারা সৎ ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী, যারা বলিষ্ঠ চিত্ত, যারা সংকল্পে সুদৃঢ়, তাদের পক্ষেই এ মহান দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط

"আর মানুষের সম্মুখে তোমার গাল ফুলিয়ে বসোনা (মানুষকে অবজ্ঞা করোনা), আর মাটির উপর দম্ভ ভরে চলাফেরা করোনা"।

অর্থাৎ হে বৎস! ভদ্রতা-নম্রতা-বিনয় হলো উন্নত এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যারা এসব গুণের অধিকারী হয়, তারাই জীবন-সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করে। পক্ষান্তরে অহংকার হলো অত্যন্ত নিন্দনীয় চারিত্রিক দুর্বলতা, অতএব তুমি অহংকারী হয়োনা। মানুষের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করবে, যারা অহংকারী যারা মুখ ভার করে গাল ফুলিয়ে বসে থাকে, তুমি তাদের মত হয়োনা, তোমার চলাফেরায়ও নম্রতা, ভদ্রতা এবং বিনয়ের প্রকাশ হতে হবে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ দর্পভরে পৃথিবীতে চলাফেরা করোনো; এবং মানুষের সম্মুখে হাসিমুখে কথা বলো, বিনম্র ব্যবহার করো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা অহংকার করোনা, নিজেকে বড় এবং অন্যকে ছোট মনে করোনা, কেউ তোমার সাথে কথা বলতে চায়, আর তুমি গাল ফুলিয়ে বসে থাকবে এমনটি যেন না হয়। আর চলাফেরায় যেন দম্ভ প্রকাশ না পায়। যারা অহংকারী হয়, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক কোন অহংকারীকে পছন্দ করেন না"।

আলোচ্য আয়াতের مختال শব্দটির অর্থ যে দর্পভরে চলে, আর فخور অর্থ যে অহংকারী, যাদের মধ্যে এসব চারিত্রিক দুর্বলতা থাকে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না। অহংকারীর অহংকার তার নিজেরই ধ্বংসের কারণ হয়। মানব সমাজে সে অপ্রিয় অপছন্দনীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়, আর আল্লাহ পাকের দরবারে হয় অভিশপ্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে অহংকার পরিহার করার তাগিদ রয়েছে।

অহংকার পরিহার কর

বস্তুত যে সব চারিত্রিক দুর্বলতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় এবং আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত করে তোলে এবং অন্য মানুষের নিকট তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে তন্মধ্যে অহংকার হলো সবচেয়ে বড়। আর এ অহংকার আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। নিজেকে অপরের চেয়ে বড় মনে করা এবং অপরকে ছোট বা হীন মনে করাই হলো অহংকার। এটি ব্যক্তি জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি। আর সমাজ জীবনের অনেক অশান্তি-অকল্যাণের মূল উৎস। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ যার অন্তরে তিল পরিমাণ অহংকার

রয়েছে তার জন্যে বেহেশতের দ্বার রুদ্ধ।

সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর ফেরেশতাগণকে আদেশ দিলেনঃ আদমকে সম্মান সূচক সেজদা দাও, ফেরেশতাগণ সেজদা দিলেন কিন্তু ইবলীস অহংকার করলো এবং সেজদা দিতে অস্বীকার করলো। ঐ অহংকারই ইবলীসের পতনের কারণ হলো। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর বিবরণ।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

"এবং সে সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি বলেছিলাম ফেরেশতাদেরকে যে তোমরা আদম (আঃ)-কে (সম্মান সূচক) সেজদা দাও তখন সকলেই সেজদা করেছিল, শুধু ইবলীস বিরত ছিল, সেজদা করতে অস্বীকার করে অহংকার করেছিল এবং সে মূলতঃ কাফেরদের অন্তর্গত ছিল"।

এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি কথা প্রমাণিত হচ্ছে। ইবলীস ছিল ফেরেশতাদের মোয়াল্লেম কিন্তু তার পতন হয়েছে অহংকারের কারণে। ২. অহংকার হলো কাফেরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নমরূদ, সাদ্দাদ, ফেরাউন আর আবু জেহেলদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই অহংকার পরিহার করার তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। পবিত্র কোরআনের অন্যত্র এ সম্পর্কে আরো সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ○

"নিশ্চয় যারা আমার বন্দেগীর ব্যাপারে অহংকার করে তারা অদূর ভবিষ্যতে অপমানিত হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে"।

বস্তুতঃ অহংকার হলো অবিশ্বাসী কাফেরদের বৈশিষ্ট্য, আর বিনয় হলো মোমেনদের চারিত্রিক গুণ।

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾ وَ
اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾
وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

তরজমা

(১৯) আর তোমার চলাফেরায় মধ্য-পন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার স্বরকে নীচু রাখবে, নিশ্চয় গর্ধভের স্বরই স্বরগুলোর মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণ্য।

(২০) তোমরা কি দেখনা যে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক আসমান জমীনের সব কিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে কলহ-দ্বন্দ্ব করে, অথচ তাদের নিকট কোন হেদায়াত নেই, কোন উজ্জ্বল কিতাবও নেই।

(২১) আর তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ পাক যা নাজিল করেছেন তা মেনে চল, তারা বলে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে যার উপর পেয়েছি, তাই মেনে চলবো। (জিজ্ঞাসা করি) যদি তাদের পূর্ব পুরুষকে শয়তান দোযখের আযাবের দিকে ডাকে, তবুও কি?

(২২) এবং যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করে, আর সে নেককার হয় তবে সে অবশ্যই সুদৃঢ়ভাবে মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্ পাকের নিকটই রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের ন্যায় এ আয়াত সমূহেও হযরত লোকমানের উপদেশের

উল্লেখ রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ

হে বৎস! চলাফেরায় মধ্য-পন্থা অবলম্বন কর, সংযতভাবে চল, বিনয় ও নম্রতার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখ। চাল-চলনে যেন কখনো অহংকারের বহিঃপ্রকাশ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হলো এ উপদেশের উদ্দেশ্য।

চাল-চলনে বিনয়ী ভাব প্রকাশিত হওয়া তথা অহংকারী না হওয়া প্রকৃত বন্দার বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণিত হয়েছে অন্য আয়াতে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا (সূরা ফোরকান)

"আল্লাহ পাকের প্রকৃত বন্দা তারাই যারা পৃথিবীতে ধীর পদে (বিনম্রভাবে) চলে"।

অর্থাৎ প্রকৃত মোমেনের এটিই বৈশিষ্ট্য যে তারা বিনম্র পদক্ষেপে চলাফেরা করে, তাদের চাল-চলনে অহংবোধ থাকেনা।

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط

"আর তোমার স্বরকে নীচু রাখবে"।

অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্তি উচ্চস্বরে কথা বলবে না, কর্কশ স্বরে কথা বলবে না, মধুর স্বরে কথা বলবে, উচ্চস্বরে চেচিয়ে কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ○

"নিশ্চয় গর্ধভের স্বরই স্বরগুলোর মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণ্য"।

অতএব, গর্ধভের ন্যায়, কর্কশ স্বরে চিৎকার দিয়ে কথা বলা কখনও উচিত নয়।

বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বর্ণনা করেন, জীব-জন্তুর মধ্যে এ পর্যায়ে বিশেষভাবে গর্ধভের উল্লেখ করার কারণ হলো, জীব-জন্তু মাত্রেরই আওয়াজ আল্লাহ পাকের তসবীহ হয় কিন্তু গর্ধভ চিৎকার করে শয়তানকে দেখার কারণে। এজন্যে হাদীস শরীফে এসেছে, যখন গর্ধভের চিৎকার শোন তখন "আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম" পাঠ কর, এজন্যে যে গর্ধভ শয়তানকে দেখেছে (এ কারণেই চিৎকার দেয়)।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, গর্ধভ কখনও তার ঘাস ও পানির জন্যে চিৎকার দেয়, অথবা তার জৈবিক প্রয়োজন বা অন্য গর্ধভের সঙ্গে লড়বার জন্যে, যে কোন অবস্থায় গর্ধভের আওয়াজ হয় অত্যন্ত অপ্রিয় ও ঘৃণ্য। আর এ কারণেই হাদীস শরীফে রয়েছে, গর্ধভ যদি নামাজের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে তবে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যায়।

এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআনে দোযখীদের চিৎকার করা সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّشَهِيقٌ (সূরা হুদ)

زفير ও شهيق শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, গর্ধভের চিৎকার, গর্ধভের অনুচ্চ এবং উচ্চ স্বরে চিৎকার। যেহেতু গর্ধভের আওয়াজ অত্যন্ত অপ্রিয় ও ঘৃণ্য হয়, তাই আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের আওয়াজ যেন তেমন না হয়, এ সম্পর্কে সতর্ক করাই এ উপদেশের লক্ষ্য।

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ

এ আয়াত মোতাবেক আল্লাহ ওয়ালাগণের অনুসরণ করা কর্তব্য। তাই এ পর্যায়ে লোকমান হাকীমের আরও কিছু উপদেশ এখানে উল্লেখ করা যায়।

লোকমান হাকীমের আরও কিছু উপদেশ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ লোকমান হাকীম বলতেন, যে কেউ আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছু আমানত রাখে, আল্লাহ পাক তা হেফাজত করেন। (আহমদ)

অতএব, মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো তার ঈমান এবং ইসলাম আল্লাহ পাকের নিকট আমানত রাখা, যেন শয়তানের প্রতারণা থেকে তা সংরক্ষিত থাকে।

আওন এবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, লোকমান তার পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছেন যে, হে বৎস! তুমি যখন কোন মজলিসে যাও তখন তাদেরকে সালাম দাও এবং এক কোণে নীরব অবস্থায় বসে পড় এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, যদি তারা আল্লাহ পাকের জিকর সম্পর্কে কথা বলে তবে তুমিও তাতে অংশগ্রহণ কর, আর যদি তারা জিকরে এলাহী ব্যতীত অন্য কথায় মশগুল হয় তবে তুমি অন্যত্র চলে যাও।

খতিব শারবিনী তাঁর "তফসীরে সেরাজ মুনীরে" লোকমান হাকীমের আরও কয়েকটি উপদেশের উল্লেখ করেছেন।

১. হে বৎস! তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর, তাহলে পুঁজি ব্যতীত ব্যবসায় যেমন লাভ হয়, তেমনি তুমি লাভবান হবে।

২. হে বৎস! জানাযায় হাযির হও তবে বিয়ের মজলিসে নয়, কেননা জানাযার কারণে তুমি আখেরাতকে স্মরণ করবে, আর বিয়ের মজলিসে তুমি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হবে।

৩. হে বৎস! পেট পুরে আহার করোনা, তোমার উচ্ছিষ্ট কুকুরের সামনে রেখে দাও।

৪. হে বৎস! মোরগের প্রতি রক্ষ্য কর, সে ভোরে উঠে আযান দেয়, আর সে সময় তুমি বিছানায় নিদ্রিত থাক, অতএব, মোরগের চেয়ে অধিকতর অসহায় হয়োনা।

৫. হে বৎস! তওবা করতে বিলম্ব করোনা, কেননা মৃত্যু হঠাৎ আসে, খবর দিয়ে আসেনা।

৬. হে বৎস! কখনও মূর্খ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করোনা, তোমাকে যে দেখবে সে

উপলব্ধি করবে যে তুমিও ঐ মূর্খ লোকের কথায় ও কাজে সন্তুষ্ট, এভাবে লোকেরা তোমার ব্যাপারে প্রতারিত হবে।

৭. হে বৎস! সর্বদা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক, তাকওয়া পরহেযগারীকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ কর কিন্তু এভাবে জীবন-যাপন কর যেন মানুষের নিকট তোমার পরহেযগারী প্রকাশ না পায়, মানুষ মনে করে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, এজন্যে তারা তোমাকে সম্মান করে, আর এ অবস্থায় এমন যেন না হয় যে তুমি মন্দ কাজে লিপ্ত হও।

৮. হে বৎস! নীরবতা পালন কর, নীরবতার কারণে কখনও তোমাকে লজ্জিত হতে হবেনা। যদি তোমার কথা রৌপ্য হয় তবে নীবরতা হলো খাঁটি স্বর্ণ।

৯. হে বৎস! মন্দ কাজ থেকে দূরে থাক, একটি মন্দের পর আরেকটি মন্দ আসে।

১০. হে বৎস! অতি ক্রোধ থেকে বিরত থাক, কেননা ক্রোধের আধিক্য মন খারাপ করে, এর দ্বারা মনের আলো দূরীভূত হয়।

১১. হে বৎস! ওলামায়ে কেরামের মজলিসে হাযির থাকবে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা শুনবে, কেননা আল্লাহ পাক হেকমতের নূর দ্বারা মৃত অন্তরকে জীবিত করে দেন, যেমন বৃষ্টি দ্বারা মৃত শুষ্ক জমীনকে জীবিত করেন, আর যে মিথ্যা কথা বলে তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য বিদায় হয়ে যায়। চরিত্রহীন লোককে অনেক সময়ই বিপদগ্রস্ত হতে হয়, পাহাড় থেকে পাথর তুলে আনা সহজ কিন্তু নির্বোধ লোককে বোঝানো সহজ নয়।

১২. হে বৎস! কোন নির্বোধ লোককে দূতরূপে প্রেরণ করোনা, যদি কোন বুদ্ধিমান লোক না পাও তবে নিজেই চলে যেও।

১৩. হে বৎস! কখনো কোন বাঁদীকে বিয়ে করোনা, (যদি তা কর) তবে তোমার সন্তানদেরকে তুমি চির গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবে।

১৪. হে বৎস! এমন সময় আসবে, যখন জ্ঞানী ব্যক্তিদের নয়ন মন শান্তি পাবেনা।

১৫. হে বৎস! এমন মজলিসে অংশগ্রহণ করবে যেখানে আল্লাহ পাকের জিকর হয়। কেননা, ঐ মজলিসের লোকদের প্রতি যখন আল্লাহর রহমত হবে তখন তুমিও তার কিছু অংশ পাবে। আর এমন মজলিসে বসবেনা যেখানে আল্লাহর জিকর না হয়। কেননা, যদি তাদের উপর আল্লাহর কোন গজব আসে তবে তাতে তুমিও ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৬. হে বৎস! তোমার খাবার যেন শুধু মোত্তাকী পরহেযগার লোক খায়, মন্দ লোকরা যেন তোমার খাবার গ্রহণ না করে।

১৭. হে বৎস! জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে পরামর্শ কর।

১৮. হে বৎস! দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র, যাতে বহু লোক নিমজ্জিত হয়ে গেছে, যদি তুমি এর থেকে নাজাত পেতে চাও তবে আল্লাহর ভয়কে তোমার নৌকা রূপে তৈরী কর, আর ঈমানের আসবাবপত্র দ্বারা ঐ নৌকাকে পরিপূর্ণ কর। আর আল্লাহর প্রতি ভরসাকে তার লঙ্গর বানাও। এভাবে হয়তো এ সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে তুমি বাঁচতে পার।

১৯. হে বৎস! আমি বড় বড় পাথর এবং বড় বড় লোহা বহন করেছি কিন্তু মন্দ প্রতিবেশীর চেয়ে কঠিন এবং ভারী কোন বোঝা দেখিনি।

২০. হে বৎস! আমি অনেক কষ্ট ভোগ করেছি কিন্তু দারিদ্র এবং পরমুখাপেক্ষীতা থেকে কষ্টকর কোন কিছু দেখিনি।

২১. হে বৎস! জ্ঞান-গুণ এবং বুদ্ধি অনেক ফকীর-মিসকীনকেও রাজা-বাদশাহদের আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

২২. হে বৎস! তুমি সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা, যারা তাদের প্রশংসার প্রার্থী হয়।

২৩. হে বৎস! যখন তুমি এলম হাসিল কর তখন তার উপর আমল করার সর্বাত্মক চেষ্টা কর।

২৪. হে বৎস! ওলামায়ে কেরাম এবং নেককার লোকদের সংসর্গে থাকা অবশ্য কর্তব্য মনে কর এবং তাদের নিকট শিখতে চেষ্টা কর।

২৫. হে বৎস! যখন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছা হয় তখন তাকে পরীক্ষা করে নাও এবং তাকে রাগান্বিত কর এবং দেখ রাগান্বিত অবস্থায় সে তোমার সাথে কী ব্যবহার করে, যদি তখন সুবিচার করে তবে সে বন্ধুত্বের যোগ্য, আর যদি সে সুবিচার না করে তবে তার নিকট থেকে আত্মরক্ষা করা তোমার কর্তব্য।

২৬. ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করবে, কেননা ঋণ দিনের বেলা অবমাননা আর রাতের দুশ্চিন্তা।

২৭. হে বৎস! মনে রেখ, যখন তুমি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তখন থেকে তোমার পৃষ্ঠ-দেশ দুনিয়ার দিকে রয়েছে, আর তোমার মুখমন্ডল আখেরাতের দিকে অতএব, যে ঘরের দিকে তুমি যাচ্ছ, তা এ ঘর থেকে অনেক নিকটবর্তী যে ঘর থেকে তুমি বিদায় হবে।[১]

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

"তোমরা কি দেখনা যে আল্লাহ্ পাক তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন আসমান জমীনের সব কিছুকে এবং তোমাদের প্রতি তিনি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তাঁর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহ"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে তওহীদের প্রমাণ এবং শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং মুশরেকদের উদ্দেশ্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এরপর লোকমান হাকীমের উপদেশের উল্লেখ রয়েছে, আর তাতেও সর্বপ্রথম তওহীদের উপর গুরুত্বারোপ করা

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস (রঃ) খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৩০-৩২

হয়েছে। এ আয়াত থেকে পুনরায় মূল বক্তব্য তওহীদ সম্পর্কেই আলোচনা শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম দানের উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَوْا .....

হে মানব জাতি! তোমরা কি দেখনা? যা কিছু আসমানে আছে, যথা চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র-পু সবই তোমাদের উপকারার্থে নিয়োজিত রেখেছি। আর যা কিছু জমীনে আছে তা-ও তোমাদের কল্যাণার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আর আল্লাহ পাক তাঁর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহ তোমাদেরকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তোমাদেরকে দান করেছেন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য প্রভৃতি। এমনিভাবে তোমাদের হেদায়েতের জন্যে রসূল প্রেরণ করেছেন, পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন, ইসলামকে জীবন-বিধান রূপে তোমাদের জন্যে পছন্দ করেছেন, তোমাদেরকে বিচার-বুদ্ধি দান করেছেন, এক কথায় হে মানব জাতি! আল্লাহ পাক তোমাদের জৈবিক, বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজনের আয়োজন করেছেন। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গুজার হওয়া।

একখানি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে বনী আদম! তোমাদের এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর মাধ্যমে, অতএব তোমাদের নিকট মৃত্যু আসার পূর্বেই আখেরাতের জন্যে আমল কর। হে বনী আদম! আমি তোমার এমন কোন অঙ্গ সৃষ্টি করিনি যার জন্যে আমি রিয্ক সৃষ্টি করিনি। হে বনী আদম! যদি আমি তোমাকে মূক করে সৃষ্টি করতাম তবে তুমি বাকশক্তির জন্যে আক্ষেপ করতে, আর যদি আমি তোমাকে অন্ধ করে সৃষ্টি করতাম তবে তুমি চক্ষুষ্মান হওয়ার জন্যে আক্ষেপ করতে, আর যদি আমি তোমাকে বধির করে সৃষ্টি করতাম তবে তুমি শ্রবণ শক্তির জন্যে দুঃখ করতে। অতএব, তুমি আমার নেয়ামতের কদর কর এবং আমার শোকর গুজার হও, অবাধ্য নাফরমান হয়োনা, নেমক হারামী করোনা, অবশেষে তোমাদের সকলকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।[১]

وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ

"আর তিনি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহ"।

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামত

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য এবং রিয্ক-দৌলত প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো জ্ঞান-বুদ্ধি, সত্যোপলব্ধি, চরিত্র-মাধুর্য, গুনাহর জন্যে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি না হওয়া, ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য করা, আল্লাহর মা'রেফাতের নূর হাসিল হওয়া, আল্লাহ

১। আল আহাদিসুল কুদসিয়্যাহ, কৃত ইউসুস আস শেখ ইব্রাহীম আম সামরাঈ, পৃষ্ঠা-৮১

পাক ও তাঁর রসূলের সঙ্গে মহব্বত রাখা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআত লাভ করা প্রভৃতি। আল্লাহ পাকের এ সমস্ত নেয়ামত লাভের কারণে মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করা এবং এ বিষয়ে চিন্তা করা যে, যিনি আমাদেরকে জীবনের যথা-সর্বস্ব দান করেছেন, তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য কি? যদি আমরা তাঁর অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হই তবে তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ ছিনিয়েও নিতে পারেন। অতএব, তাঁর অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁর সাথে শেরক করা সর্বাধিক অন্যায় কাজ।

وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ط

"আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন"।

এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রকাশ্য নেয়ামত হলো ইসলাম আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো আল্লাহ পাক তোমাদের গুনাহ সমূহ এবং যাবতীয় দোষ-ক্রটি গোপন রাখেন, এটি নিঃসন্দেহে বন্দার প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ।

এবনে মরদবিয়া, বায়হাকী, দায়লামী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, প্রকাশ্য নেয়ামত হলো ইসলাম এবং তোমার রিয্ক এবং গোপন নেয়ামত হলো তোমার কৃতকর্মের মন্দ অংশটি গোপন রাখা।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছে যে, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। মুজাহেদ (রঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, প্রকাশ্য নেয়ামত হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করা, আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো অন্তরে কালেমায়ে তৈয়েবার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, প্রকাশ্য নেয়ামত হলো ইসলাম এবং অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো মানুষের গুনাহ সমূহ গোপন রাখা।

তফসীরকার যাহ্যাক (রাঃ) বলেছেন, প্রকাশ্য নেয়ামত হলো ইসলাম এবং কোরআনে করীম। আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো মানুষের পাপাচারকে গোপন রাখা।[১]

ইমাম রাজী (রাঃ) আলোচ্য আয়াতাংশে ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ প্রকাশ্য নেয়ামত হলো মানব দেহের নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রদত্ত গোপন শক্তি সমূহ যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা-এর প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি নিহিত রয়েছে, যেমন রসনায় বাক শক্তি রয়েছে, নয়ন যুগলে দর্শন শক্তি রয়েছে, আর কর্ণ কুহরে শ্রবণ শক্তি রয়েছে, প্রকাশ্যে এর প্রত্যেকটিই দেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং গোশ্ত

১। তফসীরে তাবারী, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০

খণ্ড কিন্তু এর প্রত্যেকটিতে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি এবং বৈশিষ্ট্য। অতএব, প্রকাশ্য নেয়ামত হলো এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিহিত বিভিন্ন শক্তি ও গুণাবলী।[১]

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, প্রকাশ্য নেয়ামত হলো সে সব নেয়ামত যা প্রত্যক্ষ করা যায় যেমন আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, আহার্য বস্তু সমূহ, বাড়ী-ঘর, পোষাক-পরিচ্ছদ, আর যেসব নেয়ামত স্বচক্ষে দেখা না গেলেও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা আঁচ করা যায়, সেগুলো হলো অপ্রকাশ্য নেয়ামত।[২]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আরো বলেছেনঃ প্রকাশ্য নেয়ামত হলো তওহীদের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান, আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, প্রকাশ্য নেয়ামত হলো তোমার সে সব নেক আমল, যে সম্পর্কে মানুষ অবগত, আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো তোমার সে সব গুনাহ্ সমূহ যা মানুষ জানেনা। আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রকাশ্য নেয়ামত হলো পানাহার, অর্থ-সম্পদ প্রভৃতি। আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো ফল-ফলারী, বৃষ্টি প্রভৃতি। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, প্রকাশ্য নেয়ামত হলো সে সব যা দ্বারা আল্লাহ্ পাক তোমাকে সম্মানিত করেছেন। আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত হলো সে সব বালা-মসিবত, যা থেকে তোমাকে আল্লাহ্ পাক হেফাজত করেছেন।[৩]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ

"আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে কলহ-দ্বন্দ্ব করে, অথচ তাদের নিকট কোন হেদায়াত নেই, কোন উজ্জ্বল কিতাবও নেই"।

আল্লাহ পাকের এমনি সুস্পষ্ট নেয়ামত সমূহ লাভ করা সত্ত্বেও কোন কোন মানুষ অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্ পাকের তওহীদ সম্পর্কে কলহ করে, তাদের অবস্থা অন্ধ-বধিরের ন্যায়, তারা আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত দেখেও দেখেনা, তাঁর রহমতের সাগরে নিমজ্জমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর কথা শুধু ভুলে থাকেনা; বরং তাঁর বিধি-নিষেধকে অমান্য করে, তাদের বুদ্ধি-জ্ঞান নেই, তারা কারো নিকট থেকে কোন হেদায়াত লাভ করেনি, কোন আসমানী কিতাবও তাদের নিকট নেই, শুধু তাদের পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত তাদের কাছে এ অন্যায়ের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ মানুষের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে, অথচ তাদের কথার সমর্থনে কোন

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৫২
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৩০
৩। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৪৫

যুক্তি-প্রমাণ নেই, কোন মনীষীর হেদায়াত নেই, আর কোন আসমানী গ্রন্থও তাদের নিকট নেই।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াত নাজিল হয়েছে নজর এবনে হারেস এবং উবাই এবনে খালফ গংদের সম্পর্কে।[১]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ

"আর তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ পাক যা নাজিল করেছেন তা মেনে চল, তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে যার উপর পেয়েছি, তাই মেনে চলবো"।

অর্থাৎ পূর্ব পুরুষদের অনুকরণই তাদের একমাত্র সম্বল, যখনই তাদেরকে বলা হয় এক আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমান আন তখন তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের দোহাই দেয়। তারা আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত রসূলের প্রতি বিশ্বাস করতে রাজি নয়, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকেও মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের এ মূর্খতা-প্রসূত উক্তির জবাবেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ○

(জিজ্ঞাসা করি) যদি তাদের পূর্ব পুরুষকে শয়তান আযাবের দিকে ডাকে, তবু কি তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করতে থাকবে? কেননা শয়তান তাদের পূর্ব পুরুষকে শেরকের দিকে আহবান করেছে, আর শেরকের নিশ্চিত শাস্তি দোযখ, তবে কি তারা দোযখের শাস্তি ভোগ করতে প্রস্তুত রয়েছে!

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, কাফেরদের একথা যে 'আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে যার উপর পেয়েছি, তাই মেনে চলবো' একান্ত মূর্খতা-প্রসূত, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কালামের দিকে ডেকেছেন, তাঁর তওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। তাদের কথার অর্থ হলো আমরা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ কথাকে মানি না, তার স্থলে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের কর্মেরই অনুসরণ করি। এরপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, শয়তান তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাবের দিকে ডেকেছে, আর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সওয়াব এবং কল্যাণের দিকে ডাকেন। এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দেয়না।

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ....

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৫৭
তফসীরে রুহুল মাআনী, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৯৪

"এবং যে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করে, আর সে নেককার হয় তবে সে অবশ্যই সুদৃঢ়ভাবে মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে"।

প্রকৃত মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের-মুশরেকদের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসতো এবং শয়তানের অনুসারী হতো। আর এ আয়াত থেকে নেককার মোমেনদের কথা এরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এখলাস এবং মহব্বতের সাথে অকৃত্রিম হৃদয়ে মনোনিবেশ করেছে, তারা মজবুত, অটুট রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

ইমাম রাজী (রাঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের-মুশরকদের অবস্থা বর্ণনার পর প্রকৃত নেককার মোমেনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যারা নিজেদেরকে আল্লাহর রাহে বিলীন করে দিয়েছে, যারা এভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে এবাদত করে যেন তারা তাঁকে দেখছে, তারা সুদৃঢ় রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে, তাদের কোন ভয় নেই, নেই তাদের কোন দুশ্চিন্তা।[১]

বস্তুতঃ যারা প্রকৃত মোমেন, যারা নেককার, যাদের আমলে এখলাস থাকে, যারা বিশুদ্ধ চিত্তে ঈমান আনে এবং শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে জীবনের প্রতিটি কাজ করে এবং আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকে, তাদের পরিণাম হবে শুভ, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে তারা হবে ধন্য।

وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ○

"যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে"।

যারা অকৃত্রিম হৃদয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করবে, তাদের শুভ-পরিণতি সুনিশ্চিত।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হবে তাদের শাস্তি অবধারিত।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা তওহীদের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করবে, আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নেক আমল করবে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে, তাদের আর কোন ভয় থাকবে না, যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ (সূরা ইউনুছ)

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৫৩

"সতর্ক হও ! যারা আল্লাহর ওলী, তাদের কোন ভয় নেই, আর তাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই"।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا
يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

তরজমা

(২৩) আর যে কুফরী করে (হে রসূল!) তার কুফরী ও নাফরমানী যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। আমার নিকটই তো তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মনের নিভৃত কোণের কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(২৪) আমি তাদেরকে সামান্য কিছু দিন মাত্র উপভোগের সুযোগ দেব, এরপর তাদেরকে কঠিন আযাব ভোগ করতে বাধ্য করবো।

(২৫) (হে রসূল!) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে আসমান জমীন, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। (হে রসূল!) আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকেরই জন্যে কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

(২৬) আসমান জমীনের সব কিছু আল্লাহ পাকেরই, নিশ্চয় আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত; স্বয়ং প্রশংসিত।

(২৭) আর যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষগুলো কলম হয় আর এ সমুদ্রের সঙ্গে আরো সাত সমুদ্র হয় কালি, তবু আল্লাহ পাকের কথা শেষ হবেনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে নেককার মোমেনদের শুভ-পরিণতির কথা এরশাদ হয়েছে, আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেরদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যথিত না হন।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

মূলতঃ এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে এ মর্মে যে, সত্য-অসত্য এখন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, কাফেররা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে, তওহীদের অনেক উজ্জ্বল, অকাট্য প্রমাণ তারা দেখতে পেয়েছে, এতদসত্ত্বেও তারা যদি তাদের কুফরী ও নাফরমানী অব্যাহত রাখে, তবে (হে রসূল!) আপনি এজন্যে মনক্ষুন্ন হবেন না। আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করতে থাকুন, তাদের ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দিন, তাদের সম্পর্কে আপনি আদৌ চিন্তিত হবেন না কেননা, তাদের সকলকে অবশেষে আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে। তাদের সারা জীবনের কার্যকলাপ কড়ায় গন্ডায় তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা টের পাবে যে আল্লাহ পাকের নাফরমানীর শাস্তি কত ভয়াবহ হয়!

فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا

"তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আমি তাদেরকে অবহিত করবো"।

এর অর্থ হলো তাদেরকে আযাব দেব।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানব মনের নিভৃত কোণের কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত"।

অর্থাৎ তাদের মনে যে সব কথা তারা গোপন রেখেছিল, সে সম্পর্কেও আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। প্রত্যেকের আমল, নিয়ত, চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস, ভবিষ্যত পরিকল্পনা এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ পাকের জানা। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। অতএব, তাদের শাস্তি বিধান করা কোন কঠিন কাজ নয়। কারো মনে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, যারা কুফরী ও নাফরমানীতে সর্বদা লিপ্ত থাকে, দুনিয়ার জীবনে তাদের হাঁক-ডাক, শান-শওকত, প্রভাব-প্রতিপত্তি অন্যের তুলনায় অনেক বেশী লক্ষ্য করা যায়, সেক্ষেত্রে তাদের পরিণতি মন্দ হবে একথা কি করে বোঝা যাবে? এরই জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا

তাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাস, আনন্দ-উল্লাস নিতান্ত সামান্য কয়েক দিনের ব্যাপার, এতে রয়েছে তাদের সর্বনাশ।

ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ○

"এরপর তাদেরকে কঠিন আযাব ভোগ করতে বাধ্য করবো"।

অর্থাৎ এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামান্য কয়েক দিনের আনন্দ-উল্লাসের পরই তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমন অবস্থায় তারা নিষ্পেষিত হতে থাকবে, তাদের পলায়নের বা আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকবেনা।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

"(হে রসূল!) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে আসমান জমিন, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনিই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, বিশ্ব সৃষ্টি তাঁরই সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অপূর্ব নিদর্শন, বিশ্ব সৃষ্টির প্রতিটি অনু-পরমাণু আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের জীবন্ত সাক্ষী। কিন্তু তারপরও এ নির্বোধ পৌত্তলিকরা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে অথচ তাঁর সাথে শরীক হওয়ার মত কিছুই নেই, কেননা তিনি ব্যতীত আর সবই তাঁর সৃষ্টি আর সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে। এমনকি, যারা কাফের তারাও তাঁকে একমাত্র স্রষ্টা মনে করে। এতদসত্বেও তারা তাঁর হীন সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করে, এটিই তাদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতা।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যেই, আল্লাহ পাকের শোকর, তিনি তোমাদেরকে এ সত্য মেনে নিতে বাধ্য করেছেন যে আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের স্রষ্টা।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

"বরং অধিকাংশ লোক তা জানেনা"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যে তাদের একান্ত কর্তব্য তা তাদের অধিকাংশ লোকই জানেনা, আর তাদেরকে সতর্ক করা হলেও তারা সতর্ক হয় না।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অতএব, আসমান জমিনে তথা নিখিল বিশ্বে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের, সমগ্র সৃষ্টি জগত এক আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন, সব কিছুর স্রষ্টাও তিনি, পালনকর্তাও তিনি, অধিকর্তাও তিনি, তিনি ব্যতীত এবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ○

নিশ্চয় আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি সর্ব গুণে গুণান্বিত, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত, তাঁর কারো প্রশংসার প্রয়োজন নেই, কেননা প্রশংসা মাত্র শুধু তাঁরই।

وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ

"আর যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষগুলো কলম হয়, আর এ সমুদ্রের সঙ্গে আরো সাত সমুদ্র হয় কালি, তবু আল্লাহ পাকের কথা শেষ হবেনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী"।

শানে নজুল

এবনে এসহাক, আতা এবনে ইয়াসারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং আল্লামা বগভীও এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

(আর তোমাদেরকে অত্যন্ত সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে)

এ আয়াতখানি মক্কায় নাজিল হয়, এরপর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়্যারায় তশরীফ নিয়ে গেলেন তখন ইহুদী সম্প্রদায়ের একদল ধর্মজাযক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, আমরা শুনেছি আপনি وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا বলেন, এর দ্বারা কি আপনি আপনার সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করেন (যারা সত্যি জাহেল) অথবা এর দ্বারা আমাদেরকেও উদ্দেশ্য করেন (অথচ আমাদের মধ্যে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন)। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এ আয়াতে সকল লোকের কথাই বলা হয়েছে, অর্থাৎ কোরায়েশ গোত্র এবং তোমরাও, সকলের সম্পর্কে এ বক্তব্য রয়েছে। ইহুদীরা বললো, আপনার নিকট যে কথা এসেছে, আপনার দাবী মোতাবেক তা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু আমরা এর অন্তর্ভুক্ত নই, কেননা আমাদেরকে তৌরাত দান করা হয়েছে, আর তৌরাতে সব কিছুর বিবরণ রয়েছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম এলমের তুলনায় তৌরাতের এলম অতি সামান্য, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এবনে জরীর একরামার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইহুদীরা যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

"আর (হে রসূল!) আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, (হে রসূল!) আপনি বলুন, রূহ হলো আমার প্রতিপালকের আদেশ মাত্র আর তোমাদেরকে অতি সামান্য এলমই দান করা হয়েছে"।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলে, আমাদের সম্পর্কে কি আপনার এরূপ ধারণা যে আমাদেরকে সামান্য

এলম দান করা হয়েছে, অথচ আমাদের কাছে রয়েছে তৌরাত, যা সম্পূর্ণ হেকমতপূর্ণ গ্রন্থ, আর যাকে হেকমত দান করা হয়েছে তাকে অনেক অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এ বর্ণনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতকে মদনী আয়াত বলা হবে। কিন্তু কিছু লোকের ধারণা এই, আলোচ্য আয়াতখানি মক্কা শরীফেই নাজিল হয়েছে। ইহুদীরা কোরায়েশের লোকদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল, তারা যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফেই ছিলেন।

এবনে জরীর এবং আবুশ শেখ তাঁর "কেতাবুল আজমতে" বর্ণনা করেছেন, মুশরেকরা বলেছিল, অদূর ভবিষ্যতে পবিত্র কোরআন শেষ হয়ে যাবে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমীন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং শান বর্ণনা করেছেন। তাঁর গুণাবলী অন্তহীন, তাঁর জ্ঞান অসীম, নিখিল বিশ্বে যা-কিছু রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি, সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষগুলোকে কলমরূপে ব্যবহার করা হয়, আর সাত সমুদ্রকে কালিতে পরিণত করা হয়, আর এর সঙ্গে আরও সাত সমুদ্র যোগ করা হয় কিন্তু আল্লাহ পাকের কথা, তাঁর গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্বের কথা, তাঁর শান এবং ইজ্জতের কথা শেষ হবেনা, তাঁর প্রশংসার হক্ব আদায় হবেনা। এজন্যেই প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

"হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নেয়ামত সমূহকে শুমার করতে পারি না, তোমার গুণাবলীর বর্ণনা দিতে পারি না, তুমি এমনই যেমন তুমি তোমার নিজের বর্ণনা দিয়েছ"।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের। এর দ্বারা কারো ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে আল্লাহ পাকের কর্তৃত্ব হয়তো আসমান জমীনের মধ্যেই সীমিত। এ ভুল ধারণা নিরসন-কল্পেই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ২৬০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠাঃ ৫৫
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা ১৮২
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২৫, পৃষ্ঠাঃ ২৫৭
তফসীরে রুহুল মাআনী, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা ঃ ১০০
তফসীরে তাবারী, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠাঃ ৫১-৫২
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠাঃ ৫৪

অর্থাৎ পৃথিবীতে যত বৃক্ষ রয়েছে সেগুলো যদি কলম হয়ে যায়, আর পৃথিবীর সাতটি সমুদ্র যদি কালিতে পরিণত হয়, তার সঙ্গে আরও সাতটি সমুদ্র যোগ করা হয় তবু আল্লাহ পাকের গুণাবলীর কথা, তাঁর শান এবং মর্তবার কথা লিখে শেষ করা যাবে না। এদিকে সমস্ত কালি এবং কলম শেষ হয়ে যাবে।[১]

ইতিপূর্বে শানে নজুলে বর্ণিত হয়েছে যে ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে বলেছিল যে আমাদের নিকট তৌরাত রয়েছে, অতএব আমাদের জ্ঞান কম নয়। তারই জবাব এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ পাকের কথা অনন্ত অসীম, তৌরাতে তো মাত্র কয়েকটি আদেশ রয়েছে, এর বেশী কিছু নয় অতএব, পবিত্র কোরআনের ঘোষণা, "তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে" কথাটি ধ্রুব সত্য। আর শুধু সাত সমুদ্রই নয়; সাত হাজার সমুদ্রের পানিও যদি কালিতে পরিণত হয় তবু আল্লাহ পাকের কালাম লিখে শেষ করা যাবেনা। কেননা, দুনিয়ার বৃক্ষ এবং সমুদ্র সীমিত, আর আল্লাহ পাকের এলম, হেকমত, তাঁর বিস্ময়কর কুদরত, গুণাবলী এবং তাঁর জ্ঞান সবই অনন্ত অসীম।

আল্লাহ পাকের এলমের কোন সীমা নেই, এমনিভাবে তাঁর কুদরত ও শক্তিরও কোন সীমা নেই, এজন্যে হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, যদি আল্লাহ পাক তাঁর আদেশ সমূহ লিপিবদ্ধ করান তবে সমস্ত কলম ভেঙ্গে শেষ হয়ে যাবে এবং সকল সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

মুশরেকরা বলতো যে, আল্লাহ পাকের এ কালাম শেষ হয়ে যাবে, অথচ এর ন্যায় অসত্য, অবাস্তব কথা আর কিছুই নেই। কেননা, আল্লাহ পাকের সৃষ্টির বিস্ময় কখনো শেষ হবেনা, তাঁর হেকমতেরও পরিসমাপ্তি ঘটবেনা। সমগ্র মানব জাতির এলম আল্লাহ পাকের এলমের তুলনায় সমুদ্রের অথৈ পানির তুলনায় একটি ফোটা মাত্র, আর আল্লাহ পাকের এলম, তাঁর কালাম, তাঁর কুদরত কখনো শেষ হবার নয়।

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়"।

অর্থাৎ তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আর তাঁর ক্ষমতার কোন সীমাও নেই, শেষও নেই কিন্তু তাঁর সকল সিদ্ধান্ত হেকমতপূর্ণ। তাঁর কৌশল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাই যারা তাঁর কথা মানেনা, তাদের শাস্তি বিধানে তিনি তাড়াহুড়া করেন না। আর যখন তিনি কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি দিতে চান তখন বিলম্বও করেন না। সবই তাঁর মর্জির ব্যাপার।[২]

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২৫, পৃষ্ঠাঃ ২৫৬
২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৮

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۡ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ
الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾

তরজমা

(২৮) তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের ন্যায়ই। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(২৯) (হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে আল্লাহ পাক রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন এবং তিনি সূর্য এবং চন্দ্রকে অনুগত করে রেখেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৩০) এর কারণ এই যে, আল্লাহ পাকই ধ্রুব সত্য; আর তারা তাঁর পরিবর্তে যাকেই ডাকে তা মিথ্যা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সবার উপরে; তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান।

(৩১) (হে রসূল!) আপনি কি দেখেননি যে আল্লাহ পাকের রহমতে সমুদ্র বক্ষে জাহাজগুলো চলে থাকে। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর কুদরতের নমুনা দেখাতে চান, নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন প্রত্যেক সবর অবলম্বনকারী শোকর গুজার ব্যক্তির জন্যে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত এবং অন্তহীন এলমের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে তারই একটি নমুনা স্বরূপ এরশাদ হয়েছেঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۭ

কোন একজন মানুষের সৃষ্টি এবং তার পুনরুত্থান যেমন, সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে জীবিত করাও ঠিক তেমনি। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের

পক্ষে এটি কোন কঠিন কাজ নয়। কেননা অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○ (সূরা ইয়াসীন)

"আল্লাহ্ পাকের ব্যবস্থা হলো এমন, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন "হও", সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়"।

তাই যখন তিনি সমগ্র মানব জাতির পুনরুত্থানের ইচ্ছা করবেন তখন তিনি মৃত মানব জাতিকে বলবেন, كُونُوا সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে পুনর্জীবন লাভ করবে এবং সকলের পুনরুত্থান একই সঙ্গে হবে।[১]

এবনে আবি শায়বা, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, একজন মানুষের সৃষ্টি, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানে যেমন كُنْ বলা হয় আর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়, ঠিক তেমনি সমগ্র মানব জাতির পুনরুত্থানের জন্যেও একই ব্যবস্থা।

ইমাম কাতাদা (রঃ) থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে।[২]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই তোমাদের পুনরুত্থান করবেন, এর কোনটিই কঠিন কিছু নয়। আর শুধু একজনেরই নয়; বরং সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি ও পুনরুত্থানও শুধু একজনের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের ন্যায়ই।

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা", অর্থাৎ তিনি তোমাদের সকল কথা শ্রবণ করেন।

بَصِيرٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বদ্রষ্টা, তিনি তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন।[৩]

ইমাম তাবারী (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে মুশরেকরা কি বলে তা তিনি শ্রবণ করেন এবং তাদের কার্যকলাপও তিনি লক্ষ্য করেন।[৪]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং কেয়ামতের দিন সকলকে পুনরুত্থিত করা এক ব্যক্তির পুনরুত্থানের ন্যায়ই। যেভাবে ক্ষণিকের মধ্যে একজনের সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান হয়, ঠিক তেমনি সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি এবং পুনরুত্থানও ক্ষণিকের মধ্যে হবে, এতে মুহূর্ত মাত্রও

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২৫, পৃষ্ঠাঃ ২৫৮
২। আদ-দুররুল মনসূর, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৩
৩। তানবিরুল মেকবাদ মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৪৬
৪। তফসীরে তাবারী, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫২

বিলম্ব হবে না। একটি আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে এবং সকলে পুনর্জীবন লাভ করবে, সমগ্র মানব জাতির পুনরুত্থান ঘটবে।

سَمِيعٌ بَصِيرٌ

অর্থাৎ কাফের-মুশরেকরা কেয়ামতকে অস্বীকার করে যে কথা বলে তা আল্লাহ্ পাক শ্রবণ করেন এবং কেয়ামতকে অস্বীকার করে তারা যে কাজ করে তা-ও তিনি দেখেন।[১]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ

"(হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে আল্লাহ পাক রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন এবং তিনি সূর্য এবং চন্দ্রকে অনুগত করে রেখেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত"।

আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো রাত-দিনের সৃষ্টি, এর গমনাগমন এতদ্ব্যতীত, শীতকালে দিন ছোট হওয়া, রাত বড় হওয়া, গ্রীষ্মকালে দিন বড় হওয়া, রাত ছোট হওয়া-এসব কিছুর মধ্যেই আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কদরত হেকমতের বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। চন্দ্র-সূর্য চলমান রয়েছে, আল্লাহ্ পাকের নির্দিষ্ট সময় তথা কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে চলমান থাকবে। আল্লাহ্ পাকই তাদেরকে মানব জাতির উপকারার্থে অনুগত ও কর্মরত রেখেছেন এবং মহাশূণ্যে চন্দ্র-সূর্যের জন্যে কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তাদের জন্যে সীমা নির্দিষ্ট রয়েছে, ঐ সীমা লংঘন করার সাধ্য কারোর নাই। এসব কিছুর মধ্যেই মহান আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের জ্বলন্ত নিদর্শন রয়েছে।

সূর্যের গন্তব্য কোথায়?

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান এ সূর্য কোথায় যায়? তিনি আরজ করলেন, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলই জানেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ সূর্য আল্লাহ পাকের আরশের নিচে সেজদায় পতিত হয় এবং স্বীয় প্রতিপালকের নিকট (দ্বিতীয় বার উদিত হওয়ার জন্যে) অনুমতি প্রার্থনা করে। অদূর ভবিষ্যতে তাকে একদিন বলা হবে যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও।

وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত"।

অর্থাৎ তিনি তোমাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে সব কিছুই জানেন, তাঁর অপার মহিমা, তাঁর অসীম কুদরত হেকমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। মৃত্যুর পর মানুষকে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬০-৬১

পুনরুজ্জীবন দান করা এবং পুনরুত্থান করা তাঁর পক্ষে কঠিন কিছুই নয় এবং তাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করাও আদৌ কঠিন কাজ নয়, অতএব মানুষ মাত্রেরই কেয়ামতের কঠিন দিনে জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব দেয়ার কথা মনে রাখা একান্ত কর্তব্য।[১]

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ

"কেননা আল্লাহ পাকই যে ধ্রুব সত্য, আর তাঁকে ব্যতীত তারা যাকে ডাকে সবই মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক সবার উপরে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ"।

আল্লাহ পাকই ধ্রুব সত্য

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহা পরাক্রমশালী, তিনি মহাজ্ঞানী"।

এসব গুণাবলী বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে আল্লাহ পাকই ধ্রুব সত্য, আকাশ-মাটি-পানিতে এক কথায় ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে তথা সর্বত্র তাঁর এই অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের অগণিত নির্দশন বিদ্যমান রয়েছে। চলমান পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন। যারা অন্তর-দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত, যারা সর্বদা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত, যারা জাগতিক সম্পদ ও শক্তি পেয়ে মুগ্ধ ও মত্ত, তাদের বন্ধ চক্ষু উন্মীলিত করার জন্যে আল্লাহ পাক কখনও তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই সাময়িক পরিবর্তন এনে নির্বোধ লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, পানির অপর নাম জীবন কিন্তু এ পানিই যখন আল্লাহর হুকুমে প্রলয়ংকরী বন্যার রূপ ধারণ করে তখন ঐ পানি থেকে জীবন রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে, ১৯৯৩ সালে আমেরিকায়, ১৯৯৪ সালে চীন ও ভিয়েতনামে এমনি প্রলয়ংকরী বন্যা হয়। এমনিভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমে জমিন স্থবির রয়েছে, তাই মানুষ তার উপর ইমারত নির্মাণ করছে এবং বসবাস করছে, এটি আল্লাহ পাকের রহমত কিন্তু যখন মানুষ আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে, আর তাতে সীমালংঘন করে, তখন ঐ জমিনের উপরই আল্লাহ পাকের হুকুম আসে, তখন জমীনে কম্পন হয়, ভূমিকম্প আসে, এই সময় মানুষ তার অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে। যেমন ১৯৯৩ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রে এবং ১৯৯৪ সালে আমেরিকার লস এঞ্জেলেসে এমনি ভূমিকম্প

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৫৬

হয়েছিল। আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে মানুষকে যখন তিনি শিক্ষা দিতে চান তখন তার সকল কল বিকল হয়ে যায়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে মানুষ অনেক উন্নতি অগ্রগতি অর্জন করেছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন আল্লাহর গজব আপতিত হয় তখন সকল উন্নতি-অগ্রগতি-সমৃদ্ধি পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে যায়। এসব কিছু একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে আল্লাহ পাকই ধ্রুব সত্য, তাঁর কুদরত হেকমত সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম চির সত্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য।

পক্ষান্তরে, পথভ্রষ্ট লোকেরা আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে ডাকে তা সবই মিথ্যা, আর শুধু মিথ্যা নয়; বরং সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যা। অতএব আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই বুদ্ধিমান, পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য। আর আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য যা কিছুর সম্মুখে তারা মাথা নত করে তার বাতুলতা উপলব্ধি করা এবং তা পরিহার করা কল্যাণকামী মানুষের একান্ত করণীয় কাজ।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ

"(হে রসূল!) আপনি কি দেখেননি যে আল্লাহ পাকের রহমতে সমুদ্র বক্ষে জাহাজগুলো চলে থাকে। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর কুদরতের নমুনা দেখাতে চান। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন প্রত্যেক সবর অবলম্বনকারী শোকর গুজার ব্যক্তির জন্যে"।

সমুদ্র বক্ষে প্রতিনিয়ত আমরা কি দেখি? সমুদ্রের অথৈ পানি, উত্তাল, তরঙ্গ, পর্বত-সম ঢেউ, রাত্রিবেলা ঘন অন্ধকার। ঐ অবস্থায় পণ্য বোঝাই একটি জাহাজ সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করে এক দেশ থেকে অন্য দেশের দিকে চলে যাচ্ছে। এ কাজটি কিভাবে সম্ভব হচ্ছে? এটি হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের কুদরতে তাঁর নেয়ামতে, যদি আল্লাহর রহমত না হতো তবে এই জাহাজ উত্তাল তরঙ্গের শিকার হয়ে যেত, পাহাড় সম ঢেউয়ের তোড়ে ঐ জাহাজ মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

যে জাহাজের নিচে পানি উপরে বাতাস, এর মধ্যে জাহাজটি ভাসমান, কয়েকজন অসহায় মানুষ রয়েছে তাতে, চারিদিকে শুধু পানি আর পানি, এ অবস্থায় শুধু আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও রহমতেই মানুষ তার আপনজনের কাছে ফিরে আসতে পারে।

لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ

আল্লাহ পাক এর দ্বারা তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখাতে চান, অতএব তোমরা তাঁর কুদরত এবং রহমত প্রত্যক্ষ করে, বিপদে ধৈর্য ধারণ কর এবং নেয়ামত লাভ হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা আল্লাহ পাকের নেয়ামত পেয়ে শোকর গুজার হয় তাদের জন্যে এতে রয়েছে বহু নিদর্শন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ○

"নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক সবর অবলম্বনকারী শোকর গুজার ব্যক্তির জন্যে"।

যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, যারা নিজের এবং সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে, সত্য-সাধনা করে এবং এ অবস্থায় কষ্ট সহ্য করে, আর যারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের পরিচয় পায় এবং নেয়ামত দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের জন্যে এতে রয়েছে বহু নিদর্শন।

অথবা صَبَّارٍ شَكُوْرٍ শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাক ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করেছন, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ রয়েছে সবরে, আর একভাগ শোকরে। (বায়হাকী)

অর্থাৎ মোমেন বন্দা সুখ-শান্তি লাভ করলে শোকর আদায় করে, আর দুঃখ-বেদনায় সবর অবলম্বন করে, আর মানুষের জীবন সুখ-দুঃখেরই মিলিত রূপ। অর্থাৎ জীবন-চিত্রের দু'টি দিক, একটি সুখ আরেকটি দুঃখ, আর প্রকৃত বন্দার কাজ হলো সুখের সময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর আদায় করতে থাকা, আর দুঃখের সময় সবর অবলম্বন করে আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করা।[১]

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ
دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ
فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿۳۲﴾
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ
عَنْ وَّلَدِهٖ ۫ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۫ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ
الْغَرُوْرُ ﴿۳۳﴾ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَ
يَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ
وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۳۴﴾

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬২
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২৫ পৃষ্ঠা-১৬২
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫৩

তরজমা

(৩২) আর যখন তরঙ্গ তাদেরকে মেঘমালার ন্যায় আচ্ছন্ন করে তখন তারা একাগ্র চিত্তে এক আল্লাহ্ পাককে ডাকে, তাঁর অনুগত হয়ে। কিন্তু যখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে উদ্ধার করে তীরে পৌঁছে দেন তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে। আর শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে।

(৩৩) হে মানব জাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, আর ভয় কর সেদিনকে যেদিন কোন পিতা তার সন্তানের উপকারে আসবেনা। আর কোন সন্তানও তার পিতার উপকারে আসবেনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের কথা সত্য, অতএব এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। আর সে প্রবঞ্চক (ইবলিস শয়তান) যেন তোমাদেরকে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

(৩৪) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের নিকটই রয়েছে কেয়ামতের জ্ঞান, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর তিনিই জানেন মাতৃ-গর্ভে কি রয়েছে, আর কোন ব্যক্তিই জানেনা যে সে আগামীকাল কি করবে। আর কেউ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু হবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞ, তিনি সব কিছুর খবর রাখেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত তোমরা দেখতে পাও সমুদ্র-বক্ষে বিচরণকালে, উত্তাল তরঙ্গ এবং পর্বত-প্রমাণ ঢেউ যখন জাহাজকে আচ্ছন্ন করে তখন এক আল্লাহ্ পাকের রহমতেই তোমরা রক্ষা পাও, এভাবে তওহীদের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ উত্তাল তরঙ্গের কারণে যখন তোমাদের জাহাজ ডুবুডুবু অবস্থায় থাকে, জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং মৃত্যু নিশ্চিত মনে হয় তখন সকলেই শেরক ভুলে যায়, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর যাদেরকে তারা ডাকত, সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে, ঐ কঠিন মুহূর্তে অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্ পাককে ডাকতে থাকে। তাঁর মহান দরবারে কাকুতি-মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা চায়। তখন আর্তনাদ করে বলে, হে আল্লাহ্! এ মহা বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

বস্তুতঃ যখন মানুষ সাক্ষাত মৃত্যুকে দেখে তখন এর পাশাপাশি তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদকেও দেখে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ

"যখন সমুদ্রের তরঙ্গ তাদেরকে মেঘমালার ন্যায় আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন তারা একাগ্রচিত্তে এক আল্লাহ্ পাককে ডাকে, তাঁর অনুগত হয়ে"।

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

অর্থাৎ শুধু আল্লাহ পাককেই ডাকে, আল্লাহ পাকই তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন, এ কথায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে।

فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ

'যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করে তীরে পৌঁছে দেন তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে তথা তওহীদের পথে থাকে, আর কিছু লোক নাফরমানী করে, অকৃতজ্ঞ হয়। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ যখনই তাদের জাহাজ সমুদ্র তীরে ভীড়ে, তখনই তারা শেরক করতে শুরু করে। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারা এভাবে অকৃতজ্ঞ হয়। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝

আলোচ্য আয়াতে ختار শব্দটির অর্থ হলো বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক, প্রবঞ্চক, যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আর كفور শব্দের অর্থ হলো যে বুঝে শুনে অকৃতজ্ঞ হয়। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো যারা বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ তারাই আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে। যারা এসব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত, যারা সরল-প্রাণ, সত্য-সন্ধানী, তারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতকে অস্বীকার করতে পারেনা।

শানে নজুল

এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর আবু জেহেলের পুত্র একরামা সম্পর্কে। সে মক্কা থেকে পলায়ন করে সমুদ্র পথে রওয়ানা হয়েছিল। তখন তাদের তরী ঝড়ের সম্মুখীন হয়। তখন একরামা অত্যন্ত বিনীত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে এ ফরিয়াদ করেছিলেন, হে আল্লাহ! যদি আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর, তাহলে আমি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করবো। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। এরপর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম কবুল করেছিলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, আর সেদিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তার সন্তানের উপকারে আসবেনা, আর কোন সন্তানও তার পিতার কাজে আসবে না"।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬৩

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের দলিল-প্রমাণ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য লাভের জন্যে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতে আত্মীয়তার বন্ধন কোন কাজে আসবেনা, সেখানে প্রয়োজন হবে ঈমান এবং তাকওয়া পরহেযগারীর, তাই পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে তাকওয়া পরহেযগারীর চেয়ে বড় কোন সম্পদ নেই, অবশ্য ঈমান পূর্বশর্ত।

অথবা পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র এভাবে রক্ষা করা যায়, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের কারণে বা নদীতে ঝড়-তুফানের কবলে পড়ার দরুন যদি জাহাজ ডুবির আশংকা হয়, এমন বিপদেও মানুষ পিতা-মাতাকে ভুলেনা, আর পিতা-মাতাও সন্তান-সন্ততিকে ভুলেনা, নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও একজন আরেকজনকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়, এমনি দৃষ্টান্ত বিরলও নয়। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ মানুষের জীবনে এমন মহা বিপদের দিনও আসবে যেদিন পিতা পুত্রকে কোন সাহায্য করতে পারবে না, আর পুত্রও পিতার কোন কাজে আসবে না, সকলেই 'নফসী' 'নফসী' বলতে থাকবে। সে মহা বিপদের দিনই হলো কেয়ামতের দিন, যা অবশ্যই আসন্ন, সে মহা বিপদের দিনের সংকট উত্তরণের উদ্দেশে সম্বল সংগ্রহের পথ-নির্দেশনা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে, আর তা হলো তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা, যদি মানুষ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে জীবন যাপন করে, তাহলে আখেরাতে তার কোন আশংকা নেই। কিন্তু এজন্যে একান্ত জরুরী হলো মানব অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভয় সৃষ্টি করা। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ

হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, আর কেয়ামতের দিনকে ভয় কর, সেদিনটি এমনি সংকটময় ও বিপদজনক হবে যে, কোন পিতা তার পুত্রের কোন উপকার করতে পারবে না, আর পুত্রও তার পিতার কোন কাজে আসবে না। অতএব, প্রত্যেকেরই তার আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। এ প্রস্তুতি গ্রহণের পন্থাই বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর তা হলো আল্লাহর ভয়। এ গুণটি অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়ার জীবনে শান্তি লাভ করতে পারে এবং পরকালীন জীবনের সাফল্য সুনিশ্চিত করতে পারে। আলোচ্য আয়াতে এজন্যে اتقوا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তোমরা ভয় কর। সমগ্র কোরআনে এ শব্দটি ৬৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আর تتقون শব্দটি ১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আর اتق শব্দটি ৩বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারাই তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। এর দ্বারা পবিত্র কোরআন বিষয়টির উপর কত অধিক গুরুত্বারোপ করেছে তা যেমন বোঝা যায়, ঠিক তেমনি

পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে এর প্রয়োজনীয়তা কত বেশী হবে তা-ও সহজেই অনুমান করা যায়।

لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতে বিশেষভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের মোমেনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সে যুগের অধিকাংশ মুসলমানই এমন ছিলেন যাদের পিতা-পিতামহ কাফের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তাই তাদের উদ্দেশে বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে তোমরা কোন অবস্থাতেই তোমাদের পিতা-পিতামহের জন্যে উপকারী হতে পারবেনা। অর্থাৎ তাদেরকে তোমরা দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষায় সাহায্য করতে পারবেনা বা এক্ষেত্রে কোন প্রকার সুপারিশও করতে পারবেনা।[১]

কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, আল্লাহর নবী হযরত ওজায়ের (আঃ) তাঁর জাতির করুণ অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, তাঁর নিদ্রা পর্যন্ত এ দুশ্চিন্তার কারণে বন্ধ হয়ে গেল। তাই তিনি আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে তাঁর জাতির জন্যে ক্রন্দণরত অবস্থায় মুনাজাত করতে লাগলেন। একদিনের ঘটনা। তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে কাকুতি-মিনতি করছিলেন। তখন তাঁর সম্মুখে আল্লাহর একজন ফেরেশতা উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়ামতের দিন কি নেককার লোকেরা মন্দ লোকদের পক্ষে সুপারিশ করতে পারবে। অথবা পিতা কি পুত্রদের উপকারে আসবে? ঐ ফেরেশতা বললেন, কেয়ামতের দিন হলো সকল বিতর্কের মীমাংসার দিন। সেদিন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন সম্মুখে থাকবেন, কেউ তাঁর অনুমতি ব্যতীত কথা বলতে পারবেনা। একজনকে অন্যজনের জন্যে পাকড়াও করা হবেনা, পিতার স্থলে পুত্রকে আর পুত্রের স্থলে পিতাকে, ভাইয়ের স্থানে ভাইকে, গোলামের স্থানে মুনীবকে, মুনীবের স্থানে গোলামকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা। কেউ কারো জন্যে কিছুই করতে পারবেনা। আর একজনের জন্যে অন্যজনের কোন মায়া-মহব্বতও থাকবেনা। প্রত্যেকে তার নিজের চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। প্রত্যেকে তার নিজের আমলের বোঝা নিয়েই অস্থির থাকবে, অন্যের কথা চিন্তা করার কোন অবকাশই থাকবেনা[২]

ইহুদী-নাসারাদের আকীদার বাতুলতা ঘোষণা

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে ইহুদী-নাসারাদের আকীদার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। তারা একথা বলতো যে, আমরা তো পয়গম্বরগণের বংশধর, এজন্যে আমাদের উপর কোন আযাবই হবেনা। আর নাসারাদের কিছু লোক বলতো, হযরত ঈসা

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২২৭-২৮
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১০৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৫৬

(আঃ) আমাদের পক্ষে কাফ্‌ফারা হয়ে যাবেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের নাজাতের দায়িত্ব নেবেন, ফলে কেয়ামতের দিন আমাদের উপর আযাব হবেনা। আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ নাজাত নির্ভর করে ঈমান, তাকওয়া এবং নেক আমলের উপর। অতএব, এসব গুণ অর্জন করাই হলো কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের জন্যেই প্রয়োজন আল্লাহর ভয়ের। কেননা আল্লাহর ভয় থাকলে মানুষ পাপাচার পরিহার করতে পারে। পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করতে পারে।[১]

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ○

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা সত্য, অতএব এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়, আর সে প্রবঞ্চক (ইবলিস শয়তান) যেন তোমাদেরকে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিনের যে ওয়াদা করেছেন তা ধ্রুব সত্য, সেদিন অবশ্যই আসবে, অতএব তোমরা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া মোহে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে যেওনা। আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ, সওয়াব-আযাব, জান্নাত-দোযখ সম্পর্কে যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই হবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব দুনিয়ার এ আনন্দ-উল্লাস, আরাম-আয়েশ, এখানকার ভোগের সামগ্রী ও সুদীর্ঘ আশা-আকাংক্ষা যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়, এর মধ্যে মুগ্ধ হয়ে তোমরা যেন আখেরাতকে ভুলে না যাও। এতদ্ব্যতীত, চির অভিশপ্ত ইবলিস শয়তান যেন তার চক্রান্ত এবং ধোঁকাবাজির ফাঁদে তোমাদেরকে ফেলে না দেয়, সে তো মানুষকে প্রতারণা করে তার সর্বনাশ করে দেয়, কোন কোন লোককে সে এভাবে ধোঁকা দেয়, 'দু'দিনের জীবনই তো! ভোগ করে লও, তোমাদের ভোগের জন্যেই তো আল্লাহ্ পাক সব কিছু দান করেছেন'। ইবলিস শয়তান কাউকে বলে, 'যৌবনে ভোগ কর বার্ধক্যে তওবা করে নিও, আল্লাহ্ পাক তওবা করা পছন্দ করেন'। কিন্তু এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক, আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ কর। আত্মীয়তার বন্ধন অবশেষে তোমাদের উপকারে আসবেনা। অতএব, দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতের কথা ভুলে যেওনা। আর ইবলিস শয়তানের চক্রান্তে পড়ে আত্মবিস্মৃত হয়োনা।

আল্লামা সুয়তি (রঃ) লিখেছেনঃ এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আলোচ্য আয়াতে الغرور শব্দটির অর্থ হলো ইবলিস শয়তান, আর আবদ এবনে হোমায়েদ একরামা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আলোচ্য আয়াতে الغرور শব্দটির অর্থ হলো ইবলিস শয়তান।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৩৯

এবনে আবি হাতেম কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনিও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। আর আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে জরীর সাঈদ এবনে জুবায়েরের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তুমি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আকাংক্ষা করবে যে তোমাকে ক্ষমা করা হবে।[১]

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, আখেরাতের জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে ঈমান, তাকওয়া পরহেযগারী এবং নেক আমলের সম্বল অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পিতা-পুত্র বা কোন আত্মীয়-স্বজন আখেরাতে সাহায্যকারী হবেনা; হতে পারবেনা। তৃতীয়তঃ আল্লাহ পাকের ওয়াদা মহা সত্য, কেয়ামত আসন্ন, হিসাব-নিকাশ অবশ্যই হবে। মানুষকে তার এ জীবনের কর্মফল ভোগ করতে হবে।

এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী, অতএব এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মায়া-মোহে আখেরাতকে ভুলে থাকা অনুচিত হবে। চতুর্থতঃ ইবলিস শয়তান মানুষের চিরশত্রু, মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে সে সর্বক্ষণ সচেষ্ট, অতএব মানুষের কর্তব্য হলো তার ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বদা হুশিয়ার থাকা।

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে কেয়ামতের এলম"।

শানে নজুল

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার একজন গ্রামীন ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হন। আল্লামা বগভী (রঃ) ঐ ব্যক্তির নাম লিখেছেন, হারেস এবনে হাফসা। তিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কেয়ামত কবে হবে? তিনি আরও জিজ্ঞাসা করেন, আমার স্ত্রী অন্তসত্বা বলুন, ছেলে হবে না মেয়ে? আমাদের দেশে এখন অনাবৃষ্টি রয়েছে, বলুন কবে বৃষ্টি হবে? যে স্থানে আমার জন্ম হয়েছে তাতো আমার জানা কিন্তু আমার মৃত্যু কোথায় হবে তা বলে দিন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এবনুল মুনজের একরামা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হন। তাঁর নাম হলো, ওয়ারেছ এবনে মাজেন এবনে হাফসা এবনে কাইছ গাইলান। তিনি এ প্রশ্ন করেছিলেন যে কেয়ামত কবে কায়েম হবে? দেশে এখন চরম অনাবৃষ্টি, অভাব-অনটন, বৃষ্টি কবে হবে? আমার স্ত্রীকে আমি অন্তসত্বা অবস্থায় রেখে এসেছি, সন্তান কবে হবে? আজ কি করেছি তা আমার জানা

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৩
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫৫

আছে, আগামীকাল আমি কি করবো? আমার জন্ম কোথায় হয়েছে তা আমি জানি, আমার মৃত্যু কোথায় হবে জানিয়ে দিন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মসনদে আহমদে সংকলিত একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, আমি কি কি আসতে পারি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে কোন জবাব না দিয়ে তাঁর খাদেমকে প্রেরণ করে বললেন, তাকে আদব শিক্ষা দাও, সে অনুমতি প্রার্থনাও করতে জানেনা, তাকে বল, তুমি আগে সালাম দাও, এরপর অনুমতি প্রার্থনা কর। সে ব্যক্তি একথা শ্রবণ করে যথারীতি সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে হাযির হলেন এবং বললেন, আপনি আমাদের জন্যে কি নিয়ে এসেছেন, তিনি এরশাদ করলেন, কল্যাণই কল্যাণ, শোন! তুমি শুধু এক আল্লাহরই এবাদত করবে, লাত ওজ্জা তথা মূর্তিগুলোকে বর্জন করবে, দিন-রাতে পাঁচ বার নামাজ আদায় করবে, সারা বছরে একমাস রোজা রাখবে, তোমাদের সমাজের ধনীদের থেকে যাকাত উশুল করে নিজেদের সমাজের দরিদ্র লোকদের মাঝে বিতরণ করবে।

ঐ ব্যক্তি আরও জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এমন কোন এলম রয়েছে, যা আপনার জানা নেই? তিনি এরশাদ করেছেনঃ হ্যাঁ এমন এলম রয়েছে, যা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[২]

এরশাদ হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ পাকের নিকট কেয়ামতের এলম রয়েছে।

অর্থাৎ কেয়ামত কবে হবে, একথাটি আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা। একমাত্র আল্লাহ পাকই এ সম্পর্কে অবগত, কবে এ ক্ষণস্থায়ী জগত এবং এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের অবসান ঘটবে একথা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানেনা।

وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ

"আর আল্লাহ পাকই বৃষ্টি নাজিল করেন"।

অর্থাৎ যখন তিনি ইচ্ছা করেন এবং যে স্থানের জন্যে ইচ্ছা করেন সেখানে তখন বৃষ্টিপাত হয়।

وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ؕ

"মায়ের গর্ভে কি আছে তা শুধু আল্লাহ পাকই জানেন"।

অর্থাৎ ছেলে নাকি মেয়ে এ খবর আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬৪
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৩
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৫৯

"আর কেউ জানেনা যে সে আগামী কাল কি করবে"?

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ

"আর কেউ একথাও জানেনা, যে তার মৃত্যু কোন্ স্থানে হবে"?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গায়বের পাঁচটি ভান্ডার রয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ কিছু জানেনা। আগামীকাল কি হবে তা-ও আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা। মায়ের গর্ভে ছেলে রয়েছে না মেয়ে তা-ও আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা, কেয়ামত কবে হবে একথাও আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা, আর কার মৃত্যু কোথায় হবে- এ সম্পর্কেও আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়, আর বৃষ্টি কখন হবে তা-ও আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। (আহমদ, বোখারী)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, কেয়ামত কবে হবে, এ কথাটি সেই পাঁচটি বিষয়ের একটি যার এলম আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট নেই।

এবনে আবি শায়বা খায়সামার সূত্রে বর্ণনা করেন, মালাকুল মউত হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট আসলেন। হযরত সোলায়মানের (আঃ) নিকট তখন যে সব লোক উপস্থিত ছিলেন, তাদের একজনের দিকে তিনি বারংবার লক্ষ্য করলেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইনি কে? হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, ইনি মালাকুল মাউত। ঐ ব্যক্তি বললো, আমার মনে হয় তিনি আমাকে মেরে ফেলতে চান, আপনি দয়া করে বাতাসকে আদেশ দিন যেন তা আমাকে হিন্দুস্তানে পৌঁছে দেয়। তিনি বাতাসকে আদেশ দিলে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে হিন্দুস্তানে পৌঁছে দেয়া হয়। মালাকাল মউত বললেন, আমি বিস্ময়ের সাথে এ ব্যক্তিকে বার বার দেখছিলাম, কেননা আমার উপর আদেশ হয়েছে, হিন্দুস্তানে তার রূহ কবজ করতে, অথচ সে আপনার নিকট উপস্থিত রয়েছে। অবশেষে মালাকুল মাউত হিন্দুস্তানেই ঐ ব্যক্তির রূহ কবজ করেছেন।

বর্ণিত আছে যে আব্বাসীয় খলীফা মনসুর মালাকুল মউত আজরাঈল (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার বয়স আর কত আছে? মালাকুল মউত পাঁচটি আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

পরদিন যখন তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট এ স্বপ্নের তা'বীর জানতে চাওয়া হলো, তখন তাঁদের মধ্যে কেউ বললেন, পাঁচ বছর। কেউ বললেন, পাঁচ মাস, আর কেউ বললেন, পাঁচ দিন। এরপর যখন হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন, এ প্রশ্নটি হলো সেই পাঁচটি বিষয়ের একটি যা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। তখন তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬৫-৬৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৩৯

ইমাম মালেক (রঃ) অত্যন্ত বড় আশেকে রসূল ছিলেন। সমগ্র জীবন তিনি মদীনা মুনাওয়্যারায় অতিবাহিত করেছেন কিন্তু শীত গ্রীষ্মে কখনো তিনি মদীনা শরীফে জুতা পরিধান করেননি। সর্বদা মদীনা শরীফে নগ্ন পদেই তিনি চলাফেরা করতেন। তিনি বলতেন, যে জমীনে স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রয়েছেন, সে জমীনের উপর আমি জুতা ব্যবহার করতে পারব না। তিনি আন্তরিকভাবে আকাংক্ষা করতেন যেন মদীনা শরীফের মাটিতেই তাঁকে দাফন করা হয়। এজন্যে জীবনের শেষ দিকে তিনি হজ্জের উদ্দেশে মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কয়েক বছর এভাবে অতিবাহিত হলো। এদিকে হজ্জে যাওয়ারও আকাংক্ষা জাগে অথচ মদীনা শরীফ ছেড়ে যেতেও পারেন না। এমনি অবস্থায় তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন এই বলে যে যদি তাকে দয়া করে একথা জানিয়ে দেয়া হয় যে হজ্জ সুসম্পন্ন করা পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন, সেক্ষেত্রে তিনি হজ্জ করে আসতে পারেন। এ অবস্থায় কয়েকদিন দোয়া করার পর তিনি স্বপ্নে দেখলেন, একটি হাত তাতে রয়েছে পাঁচটি আঙ্গুল। স্বপ্নের তা'বীরের ক্ষেত্রে সে যুগে আল্লামা এবনে সীরিন ছিলেন অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী। ইমাম মালেক (রঃ) এ স্বপ্নটির তা'বীর করার জন্যে এক ব্যক্তিকে আল্লামা এবনে সীরিনের নিকট প্রেরণ করলেন।

আল্লামা এবনে সীরিন সব কথা শ্রবণ করে বললেন, আমার বিশ্বাস বর্তমানে এই শহরে ইমাম মালেক (রঃ) ব্যতীত অন্য কেউ এ স্বপ্ন দেখতে পারেন না। আল্লামা এবনে সীরিন এ স্বপ্নের তা'বীরে বললেন, ইমাম সাহেব যা জানতে চেয়েছেন তা সে পাঁচটি বিষয়ের একটি যার এলম আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো নিকট নেই।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সব বিষয়ে অবগত। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছুর খবর তিনি রাখেন। এলমে গায়ব বা অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই নিকট রয়েছে, তবে আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যা কিছু জানিয়ে দিয়েছেন তা তিনি জানতেন যেমন সূরায়ে রুমের শুরুতে একটি ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে, পারস্য এবং রোম সম্পর্কীয়। আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমন একটি ঘটনার কথা জানিয়ে দিয়েছেন যা নয় বছর পর ঘটেছে। এমনিভাবে, কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে যা জানতে পেরেছেন, তা বলে গেছেন। হাদীস শরীফে তার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে এবং বর্তমান বিশ্বে তাঁর বর্ণিত অনেক আলামত প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

আয়াতের মর্মকথা

মানুষ যত জ্ঞানীই হোক না, কাল কি করবে তা সে জানেনা। এমনকি, আগামীকাল পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে কি-না, তাও সে জানেনা। মানুষের এমনি অক্ষমতা এবং

অসহায়ত্ব সত্ত্বেও সে ক্ষমতার দাপট দেখায় এবং সুদীর্ঘ আশা-আকাংক্ষা পোষণ করে থাকে। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ বিলাসে ও মায়া মোহে এত মুগ্ধ থাকে যে সে আদতেই একথা ভুলে যায় যে অবশেষে তাকে এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চিরতরে চলে যেতে হবে। শুধু তাই নয়; বরং সর্বাধিক বিস্ময়কর ব্যাপার এই, যিনি দান করেছেন মানুষকে তাঁর জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব, যাঁর দানে সে ধন্য হয়েছে, সে মহান দাতা আল্লাহ্ পাককেও সে ভুলে যায়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক মানুষকে এমন ভুল-ভ্রান্তি পরিহার করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৩ই নভেম্বর, মোতাবেক ৯ জমদিউস সানী, রোজ রবিবার সকাল ১১-৩০ মিনিটে সূরা লোকমানের তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! দয়া করে তোমার খাছ রহমতে তফসীরে নূরুল কোরআনকে কবুল কর এবং তা সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমীন।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সূরা সজদা

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ
يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ
اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۗ
اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾

তরজমা

(১) আলিফ-লাম-মীম।

(২) এই কিতাব বিশ্ব প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

(৩) তবে কি তারা বলতে চায় যে এই কিতাব তিনি নিজে রচনা করে এনেছেন? না, বরং তা (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে ধ্রুব সত্য, যাতে করে এমন সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি, হয়তো তারা হেদায়েত লাভ করবে।

(৪) তিনি আল্লাহ পাকই, যিনি আসমান জমীন এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে সবই ছয় দিনে তৈরী করেছেন। এরপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সহায়কও নেই। তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

সূরা সজদা প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। ৩০ আয়াত বিশিষ্ট এ সূরায় ৩ রুকু, ৩৩০ বাক্য ও ১,৫১৮ অক্ষর রয়েছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) 'কিতাবুল জুমআ'য় হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন ফজরের নামাজে এ সূরা এবং সূরা দাহর পাঠ করতেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে সূরা সজদা এবং সূরা মূলক পাঠ করতেন। (আহমদ, তিরমিজী, নেসায়ী)

এ সূরার ফজিলত

তেবরানী এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামাজের পর চার রাকাআত নফল নামাজ আদায় করে এবং তার প্রথম দু' রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং সূরা এখলাস পাঠ করে আর শেষ দু' রাকাআতে সূরা মূলক এবং সূরা সজদা পাঠ করে, এতে এমনি সওয়াব হয় যেন সে লাইলাতুল কদরে চার রাকাআত নামাজ আদায় করলো।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা মূলক এবং সূরা সজদা মাগরিব এবং এশার মধ্যে পাঠ করে, সে যেন লাইলাতুল কদরে নামাজ আদায় করলো।

এবনে মরদবিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা সজদা, সূরা ইয়াসিন এবং সূরা কমর পাঠ করে, তার জন্যে তা নূর হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং কেয়ামতের দিন তার মর্তবা বুলন্দ হবে।

হযরত এবনে রাফে (রাঃ) বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন সূরা সজদা এভাবে আসবে যে তার দু'টি ডানা থাকবে এবং এ সূরা ঐ ডানা দ্বারা তার পাঠকদেরকে ছায়া দেবে।[১]

এ সূরার আমল

জ্বর এবং মাথা ব্যথার জন্যে এ সূরা লিপিবদ্ধ করে বেধে নিলে আল্লাহ পাক জ্বর এবং মাথা ব্যথা দূর করে দেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কোরআনের সত্যতা বর্ণিত হয়েছে। এরপর তওহীদের

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮৫
তফসীর রুহুল মাআনী, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১১৬

দলিল-প্রমাণ ও হাশর-নশরের উল্লেখ রয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেও পবিত্র কোরআনের সত্যতার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর তওহীদ এবং হাশর-নশরের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর নেককার ও বদকারদের জীবন-ধারা ও তাদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

অথবা, বিষয়টিকে এভাবেও উপস্থাপন করা যায়, সূরা লোকমানে আসমান জমীন সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ সূরায় বিশ্ব-সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

الٓمّٓ○ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ○

আলীফ-লাম-মীম।

"এই কিতাব বিশ্ব প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ) বলেছেন, আলীফ, লাম, মীম অর্থ-

انا الله اعلم

("অর্থাৎ) আমিই আল্লাহ, আমিই সর্বাধিক জ্ঞানী"।[১]

অবশ্য অধিকাংশ তফসীরকার এ "হরফে মোকাত্তায়াত" সম্পর্কে একমত যে এর সঠিক অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন।[২]

এ পবিত্র গ্রন্থ কোরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নাজিল হয়েছে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, যে মহান সারগর্ভ গ্রন্থ সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে নাজিল হয়েছে তাতে কোন প্রকার সন্দেহের প্রশ্নই ওঠেনা, এ জ্ঞান-সমৃদ্ধ গ্রন্থ মানব মনের শান্তির জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, এতে কোন প্রকার সন্দেহ, ভুল-ভ্রান্তি সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। সূরা শুরু করা হয়েছে হরফে মোকাত্তায়াত الم দ্বারা। এর দ্বারা কোরআনে করীমের অলৌকিক মহিমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোন সৃষ্টির পক্ষে এমন কালাম রচনা করা সম্ভবই নয়, এটি স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কালাম। যাঁর প্রতি এ মহান গ্রন্থ নাজিল হয়েছে, যিনি সকলের নিকট সুপরিচিত, পরম বিশ্বস্ত, আল-আমীন উপাধির অধিকারী, যিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়, আল্লাহ পাকের রহমত স্বরূপ যাঁর আবির্ভাব হয়েছে, সমস্ত নবী রসূলগণের ইমাম এবং দলপতি হিসেবে যিনি আগমন করেছেন, তাঁর প্রতিই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে। আর নাজিল করেছেন স্বয়ং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক। যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাই তাঁর মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারেনা, তবু যারা আল্লাহ পাকের সর্বাপেক্ষা প্রিয় রসূলকে অস্বীকার করে এবং তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থকে অমান্য করে, তারা কিভাবে রক্ষা পাবে?

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৪৭

২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৩

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

তবে কি তারা বলতে চায় যে এই কিতাব তিনি নিজে রচনা করে এনেছেন? তিনি তো সারাটি জীবন তাদের মাঝেই অতিবাহিত করেছেন। জীবনে কখনো তিনি কোন মানুষের ব্যাপারে অসত্য কথা বলেননি, কখনো কোন লোককে কথা দিয়ে কষ্ট দেননি, এমনি অবস্থায় তিনি আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে কি করে অসত্য কথা বলতে পারেন?

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

"বরং তা (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে ধ্রুব সত্য"।

কেননা, সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষ একত্রিত হয়েও জ্ঞান-সমৃদ্ধ এ মহান গ্রন্থ্ পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াতও রচনা করতে পারবেনা, কারো পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ

"(হে রসূল!) আপনি যেন এমন সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করেন যাদের নিকট ইতিপূর্বে কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি, হয়তো তারা হেদায়েত লাভ করবে"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। এ বংশে ইতিপূর্বে আর কোন নবীর আগমন হয়নি। এতদ্ব্যতীত, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর প্রায় ছয়শত বছর যাবত কোন নবী রসূলের আবির্ভাব ঘটেনি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ এমন সম্প্রদায়কে হেদায়েত করার দায়িত্ব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অর্পিত হয়েছে যাদের নিকট ইতিপূর্বে কোন নবী রসূল আগমন করেননি।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম তাবারী (রঃ) তফসীরকার কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ মহান গ্রন্থ্ স্বয়ং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নাজিল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

ইমাম কাতাদা (রঃ) আরো বলেছেনঃ এতে প্রতিবাদ রয়েছে কাফেরদের একটি ভিত্তিহীন উক্তির, তারা বলেছিল এটি পৌরাণিক কাহিনী, আলোচ্য বাক্যে তাদের সে বক্তব্যের প্রতিবাদ রয়েছে। আর যে সব পৌত্তলিকরা একথা বলেছে যে এ গ্রন্থ্ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে রচনা করেছেন (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক) তাদের কথারও প্রতিবাদ এতে রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

বরং এটি ধ্রুব সত্য যে এ গ্রন্থ্ আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকেই নাজিল হয়েছে।[১]

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা- ৫৭

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

অর্থাৎ এই কিতাব এজন্যে অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়াসাল্লামকে এজন্যে প্রেরণ করা হয়েছে যেন আপনি কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন, আশা করা যায় যে তারা হেদায়েত লাভের ধন্য হবে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক এর দ্বারা মক্কার কোরায়েশকে উদ্দেশ্য করেছেন কেননা, ইতিপূর্বে তাদের নিকট কোন রসূল প্রেরিত হননি।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

"তিনি আল্লাহ পাকই, যিনি আসমান জমীন এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে সবই ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতা বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে তওহীদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক আসমান জমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।[১]

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط

"এরপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন"।[২]

مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ

"তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সহায়কও নেই"।

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হও, যদি তোমরা তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস কর, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার কর, তবে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তোমাদের মহা বিপদের সময় তোমাদের কোন অভিভাবক এবং সহায়ক থাকবেনা, তোমরা হবে চরম অসহায়, নিরূপায়, তোমরা হবে বিপদগ্রস্ত এবং কোপগ্রস্ত।

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

"তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা"?

তবু কি তোমরা সত্য উপলব্ধি করবেনা? অথচ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করা এবং ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ

১। সৃষ্টির জন্যে ছয় দিনের প্রয়োজন কেন হলো তা বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে দেখুন-তফসীরে নূরুল কোরআন, খণ্ড-(৮) পৃঃ ২৫৯-৬২
২। আরশে সমাসীন হওয়া সম্পকে বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খণ্ড-১১ পৃঃ ১৩৮-৪২

করা তোমাদের উচিত।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ
يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥
ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٦ الَّذِي أَحْسَنَ
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ٧ ثُمَّ جَعَلَ
نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ
مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٩ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا
لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ١٠

তরজমা

(৫) আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় তিনিই পরিচালনা করেন, এরপর সব কিছুই তাঁর দরবারে এমন এক দিনে উপস্থিত হবে যার পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান।

(৬) গোপন প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি দয়াময়।

(৭) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমভাবে সৃজন করেছেন, আর মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন কাঁদা মাটি থেকে।

(৮) এরপর নগণ্য নিংড়ানো পানি থেকে তার বংশ সৃষ্টি করেছেন।

(৯) এরপর তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে নিজের তরফ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন কর্ণ, চক্ষু, অন্তঃকরণ; তোমরা অতি সামান্যই শোকর গুজার হও।

(১০) আর তারা বলে, আমরা যখন মাটিতে মিশে যাব তখন আবারও কি নতুন করে অস্তিত্ব লাভ করবো? বরং তারা তাদের প্রতিপালকের মোলাকাতকেই অস্বীকার করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকই আসমান, জমিন ও

তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন। আর এ আয়াত থেকে সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে, কেননা অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

"সাবধান! সৃষ্টি আল্লাহ পাকেরই এবং আদেশও তাঁরই"।

যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি লালন-পালন করেছেন, সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর বিধি-নিষেধই কার্যকর হবে; তাই স্বাভাবিক। আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ পাকের আদেশ-ক্রমেই হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের আদেশ সপ্তম আসমানের উপর তথা আরশ থেকে জারি হয় এবং জমিনের সপ্তম স্তরের নিচ পর্যন্ত পৌঁছে। কেউ তাঁর বিধি-নিষেধের আওতার বাইরে থাকতে পারেনা; যদিও আসমান থেকে জমিনের দূরত্ব পাঁচশত বছরের কিন্তু ফেরেশতাগণ ক্ষণিকের মধ্যেই এ দূরত্ব অতিক্রম করেন।

ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ

"এরপর সব বিষয় তাঁর মহান দরবারে পৌঁছে যায়"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, يدبر الامر অর্থাৎ আল্লাহ পাক জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে আদেশ দেন অথবা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতার মাধ্যমে আসমান থেকে জমিনে আদেশ আসে। এরপর জিব্রাঈল (আঃ) অথবা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন অর্থাৎ তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যান।

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○

"এমন এক দিনে যা তোমাদের গণনা মোতাবেক হাজার বছরের সমান হয়"।

অর্থাৎ ফেরেশতাদের গমনাগমনের সময় তোমাদের সময়ের হিসেবে হাজার বছরের সমান হয়। তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেক এক হাজার বছরের জন্যে ফেরেশতাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেন। এই এক হাজার বছর শেষ হলে দ্বিতীয় হাজার বছরের পথ-নির্দেশ প্রদান করেন। এ হিসেবে ফেরেশতাদের এই হাজার বছরের কর্মসূচী আল্লাহ পাকের নিকট এক দিনের সমান।

আল্লাম বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত এবং জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত ফেরেশতাদের গমনাগমনের বর্ণনা রয়েছে এবং তাতে হাজার বছরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য আয়াতে এ সময়কে পঞ্চাশ হাজার বছর বলা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ○

"ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্দ্ধগামী হয় এমন এক দিনে যা পার্থিব জগতের পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান"।

এ দু'টি বর্ণনার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এভাবেঃ

কেয়ামতের দিনের সময়ের পরিমাণ

(১) কেয়ামতের দিনের সময়ের পরিমাণ দুনিয়ার হিসেবে এক হাজার বছরের সমান হবে কিন্তু কেয়ামতের দিনের মহা বিপদের কারণে তা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান মনে হবে।

(২) অথবা কেয়ামতের দিনের ধৈর্য মানুষের আমলের ভিত্তিতে কম-বেশী হবে। কারো ব্যাপারে তা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে আর কারো ব্যাপারে তা এক হাজার বছরের সমান হবে। আর কারো ব্যাপারে তা দুনিয়ার একটি সাধারণ দিনেরই সমান হবে। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছেঃ মোমেনের ব্যাপারে কেয়ামতের দিন একটি ফরজ নামাজের সময়ের সমান হবে (আবু ইয়ালা, এবনে হাব্বান, বায়হাকী সংকলিত)।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, জিব্রাঈল (আঃ)-এর অবস্থান-স্থল হলো 'সিদরাতুল মুন্তাহা'। জমিন থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আর 'সিদরাতুল মুনতাহা' থেকে জমিন পর্যন্ত গমনাগমনের সময়-সীমা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে মানুষের গমনাগমনের জন্যে এ দূরত্বটি হাজার বছরের সমান। কিন্তু জিব্রাঈল (আঃ) এবং তাঁর সাথী ফেরেশতাগণ এক মূহুর্তের মধ্যে এ দূরত্ব অতিক্রম করেন। আর এক হাজার বছর এবং পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা এ পথ অতিক্রমকারীদের অবস্থার পার্থক্যের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। কেননা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যা তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, জমিন এবং আসমানের মধ্যকার দূরত্ব ৭১ বা ৭২ বা ৭৩ বছরের পথের সমান। আর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জমিন এবং আসমানের মধ্যে এবং প্রত্যেক আসমান থেকে অন্য আসমান পর্যন্ত পাঁচশ' বছরের পথ রয়েছে। এখানেও যে দূরত্বের পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে তা পথচারীদের অবস্থার স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতেই করা হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে আল্লাহ পাক দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করেন। আর তা করেন ফেরেশতাদের মাধ্যমে যার প্রতিক্রিয়া দুনিয়াতে দেখা যায়। যখন দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে এবং ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে তখন সকল আদেশ এবং ব্যবস্থাপনা সরাসরি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হবে। আর তা সেদিন হবে যার পরিমাণ হাজার বছরের সমান হবে, অর্থাৎ তা কেয়ামতের দিন হবে। এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে যা তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দরিদ্র লোকেরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশ' বছর পূর্বে (কেয়ামতের দিনের হিসেবে অর্ধেক দিন পূর্বে) জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আর যে আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের কথা উল্লেখিত হয়েছে তার সমর্থন পাওয়া

যায় বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীস দ্বারা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদে যাকাত আদায় না করবে, তার সম্পদকে দোযখের আগুনে গরম করা হবে, সেগুলোর পাত তৈরী করা হবে আর ঐ পাতগুলো দ্বারা সে ব্যক্তির দু' পাঁজর এবং কপালে দাগ দেয়া হবে। আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত হতে থাকবে, যতক্ষণ আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের ফায়সালা করবেন, সেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, কেয়ামতের দিনই পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। আর তিরমিজী শরীফের সংকলিত হাদীসে এক হাজার বছরের উল্লেখ রয়েছে, এ দু'টি বর্ণনার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তার কারণ হলো বিভিন্ন ব্যক্তির অবস্থার পার্থক্য। সেদিন কারো জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান মনে হবে, আর কারো জন্যে এক হাজার বছরের সমান আর কারো জন্যে দুনিয়ার একদিনেরও কম সময় হবে। আর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যা হাকেম ও বায়হাকী সংকলন করেছেন, মোমেনদের জন্যে কেয়ামতের দিনের দৈর্ঘ হবে জোহর ও আছরের মধ্যকার সময়ের সমান।

আল্লামা বগভী (রঃ) ইব্রাহীম তাইমীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে সেদিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যেদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে এবং আরজ করা হয় যে ঐ দিনটি অত্যন্ত লম্বা হবে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ শপথ সেই আল্লাহ পাকের! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, মোমেনের জন্যে সেদিন তো এই ফরজ নামাজের চেয়েও হালকা হবে যা সে দুনিয়াতে আদায় করতো।

আল্লামা বগভী (রঃ) আরো লিখেছেন, এবনে আবি মালিকা বর্ণনা করেছেনঃ আমি এবং হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আযাদ করা গোলাম আবদুল্লাহ এবনে ফিরোজ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়েছি এবং এ পঞ্চাশ হাজার বছরের কথা যে আয়াতে রয়েছে, সে আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছি। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক যেদিনের কথা এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই, আর না জেনে আল্লাহ পাকের কালাম সম্পর্কে কোন কথা বলা আমি উচিত মনে করিনা।

বিখ্যাত তফসীরকার জালালউদ্দিন মহল্লী (রঃ) তাঁর তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) এ বর্ণনাকে পছন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ আসমান থেকে জমীনে নাজিল হয়। এখানে তা সম্পাদিত হওয়ার পর তা আমলের দপ্তরে লিপিবদ্ধ হওয়ার নিমিত্তে উর্দ্ধলোকে যায়। পৃথিবীর নিকটস্থ আসমানেই রয়েছে আমলের দফতর। পৃথিবী থেকে ঐ দফতরের দূরত্ব সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে তোমাদের হিসেবে তা হলো এক হাজার বছর কিন্তু আল্লাহ

পাকের হিসেবে তা মাত্র একদিন। অবশ্য সকলের জন্যেই যে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে এক হাজার বছর সময় লাগবে তা নয়; বরং এতে কত সময় লাগবে তা নির্ভর করবে গমনকারীর তীব্রতা এবং দ্রুততার উপর। আর তা হলো ঈমানের শক্তি-নির্ভর, যার ঈমান যত বেশী তার দ্রুততাও তত বেশী। তাই হাজার বছরের দূরত্ব ফেরেশতাগণ মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করেন। আর প্রকৃত মোমেনদের অবস্থা কি হবে তা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তা হলো কেয়ামতের দিন। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে আসমান থেকে জমীন পর্যন্ত সব কিছুর ব্যবস্থাই আল্লাহ পাক করে থাকেন। এরপর এমন একটি দিন আসবে যার পরিমাণ আমাদের হিসেব মোতাবেক হাজার বছরের সমান হবে। সেদিন পৃথিবীর সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেককেই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে। প্রত্যেককেই তার জীবনের সকল কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেকের হাতেই দেয়া হবে তার আমলনামা আর ঐ আমলামা হবে তার প্রকৃত জীবন-চিত্র। আর সে আমলনামায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের সকল কথাই লিপিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ পাকের অতুলনীয় ব্যবস্থার আওতার বাইরে কেউ থাকতে পারবেনা। তাই তাঁর কুদরত হেকমতের যেমন সীমা নেই, তাঁর রহমত যেমন অনন্ত অসীম, ঠিক তেমনি তাঁর জ্ঞান এবং হেকমতেরও শেষ নেই, সবই অনন্ত অসীম।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক আসমান থেকে জমীন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন, ফেরেশতাগণ আসমান থেকে জমীনে অবতরণ করে এবং এখানকার দায়িত্ব পালনের পর তারা পুনরায় আসমানে ফিরে যায়। একদিনেই তারা তা করে কিন্তু মানুষের গণনার হিসেবে তা এক হাজার বছরের সমান হয়। পাঁচশত বছর অবতরণের সময় এবং আরো পাঁচ শত বছর উর্দ্ধলোকে গমনের সময় ব্যয় হয়।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, যদি মানুষ এ পথে সফর করতো যে পথে ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ নিয়ে সফর করে, তবে তারা এক হাজার বছরে এ দূরত্ব অতিক্রম করতো।

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পক্ষ থেকেও এমন কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২]

يدبر الامر বাক্যটির ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতবী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ১৯৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলবী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৪৬-৪৭
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৫৩৮
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১২০-২২
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫৮
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৬

আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

قال ابن عباس ينزل القضاء والقدر

অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্যে যে তকদীর বা অদৃষ্ট নির্দিষ্ট রয়েছে, সে মোতাবেক বিধি-নিষেধ অহরহ নাজিল হতে থাকে।

একথার তাৎপর্য হলো, পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় যা কিছু আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক পরিবর্তন করা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় তার ফরমান অহরহ জারি হতে থাকে যা বহু পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার এ ফরমান জারী হওয়ার পর তা আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়। সে বিবরণ নিয়ে ফেরেশতাগণ পুনরায় উর্দ্ধলোকে গমন করেন।[১]

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

"গোপন ও প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন"।

অর্থাৎ যিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা, রিয্কদাতা এবং যিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মহা ব্যবস্থাপক, তিনি সৃষ্টির সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। তিনি তাঁর হেকমত মোতাবেক সব কিছুর ব্যবস্থা করেন।

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

"তিনি পরাক্রমশালী, তিনি পরম করুণাময়"।

অর্থাৎ যেহেতু তিনি পরাক্রমশালী, সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই নিখিল বিশ্বের ব্যবস্থাপনা তাঁর জন্যে অতি সহজ, আর তিনি পরম করুণাময়, অর্থাৎ তিনি তাঁর দয়া ও করুণার দৃষ্টিতে বন্দাদের দিকে দেখেন এবং তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা করেন।

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

অর্থাৎ যিনি মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন, যিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম করুণাময়, তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা উত্তমভাবেই করেছেন, অতি সুন্দর করে, সঠিকভাবে, যা যেমন হওয়া উচিত তা তেমনি সৃষ্টি করেছেন।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) আলোচ্য আয়াতাংশের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আর হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা সুদৃঢ়, মজবুত এবং নিখুঁত ভাবে সৃষ্টি করেছেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, احسن এর অর্থ হলো علم অর্থাৎ আল্লাহ

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৩৫

পাক খুব ভাল ভাবেই জানেন কোন্ জিনিস কিভাবে সৃষ্টি করতে হয়।

মূলতঃ আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে তিনি পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে অতি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি মাত্রই কত উত্তম, কত সুন্দর, কত নিখুঁত, মজবুত, অটুট, আকর্ষণীয়, লোভনীয় এবং মোহনীয়। আল্লাহ্ পাক এরপর মানুষকে তাঁর নিজের সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্য এবং মহিমা উপলব্ধি করার আহবান জানিয়েছেন।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○

"আর মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন কাঁদা মাটি থেকে"।

আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক কাঁদা মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاۤءٍ مَّهِيْنٍ ○

"এরপর নগণ্য নিংড়ানো পানি থেকে তার বংশ সৃষ্টি করেছেন"।

অর্থাৎ মানুষের পানাহার থেকে যে রক্ত তৈরী হয়, তা থেকে যে শুক্র-কণা সৃষ্টি হয় তা দ্বারাই আল্লাহ্ পাক মানুষের বংশধারা অব্যাহত রেখেছেন।

ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ

"এরপর ঐ মানুষটিকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে তাঁর তরফ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন"।

অর্থাৎ মানুষের আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঠিকভাবে তৈরী করেছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। এ কারণে মাটির তৈরী দেহটি জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত হয়, শুধু তাই নয়; বরং মাটির তৈরী এ দেহটিতে আরও অনেক শক্তি রেখে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ

"আর আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে কান, চোখ এবং হৃদয় তৈরী করে দেন"।

অর্থাৎ ঐ মানব দেহটিতেই শ্রবণের শক্তি, দেখার শক্তি এবং উপলব্ধির শক্তি দান করেন। এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান। আর এ দানের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে মানুষের শোকর গুজার হওয়া একান্ত কর্তব্য কিন্তু মানুষ এ কর্তব্য পালন করেনা। এরশাদ হয়েছেঃ

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

"তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই শোকর গুজার"।

চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দেখে তাঁর দান উপলব্ধি করা যেমন কর্তব্য, তেমনি শ্রবণ শক্তি দিয়ে আল্লাহ্ পাকে কালাম শ্রবণ করে তাঁর বিধি-নিষেধ পালন

করাও কর্তব্য। আর এমনিভাবে অন্তর দিয়ে তাঁর অগণিত নেয়ামতের কথা চিন্তা করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত হওয়াও একান্ত করণীয় কাজ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, আল্লাহ পাকের এসব নেয়ামত অহরহ ভোগ করা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়, তাঁর তওহীদকে অস্বীকার করে, তাঁর রসূলকে অমান্য করে।

আলোচ্য আয়াতের من روحه শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, অথবা তাঁর সৃষ্ট রূহ মানুষের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন।

وَقَالُوٓا ءَ اِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬

"আর তারা বলে, আমরা যখন মাটিতে মিশে যাব তখন আবারো কি নতুন করে অস্তিত্ব লাভ করবো? বরং তারা তাদের প্রতিপালকের মোলাকাতকেই অস্বীকার করে"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তওহীদ ও রেসালতের প্রতি যাদের বিশ্বাস ছিলনা, তাদের কথার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। আর কাফেরদের মধ্যে যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করতো, পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করতো, আলোচ্য আয়াতে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এশাদ হয়েছেঃ

وَقَالُوا

যিনি মানুষকে সর্বপ্রথম অস্তিত্ব দান করেছেন, যিনি তাকে দেখবার, শুনবার এবং বুঝবার শক্তি দান করেছেন এবং যিনি তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর মহান দরবারে হাযির করবেন, তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব-নিকাশ হবে। ঈমান এবং নেক আমলের সম্বল যার কাছে থাকবে সে চিরস্থায়ী সুখ এবং শান্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যারা ঈমান ও নেক আমলের সম্পদ থেকে হবে বঞ্চিত, তাকে আখেরাতে আল্লাহ পাকের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কিন্তু কাফেররা এ সত্যকে অবিশ্বাস করে, তারা বলে আমরা মরে পঁচে মাটিতে মিশে যাবার পরও কি আবার নতুন করে অস্তিত্ব লাভ করবো? একি সম্ভব? (অবশ্যই সম্ভব, আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেন তাই হয়)।

بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ○

মূলতঃ তারা শুধু যে পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে তাই নয়; বরং তারা আল্লাহ পাকের দরবারে হাযিরীকেই অস্বীকার করেছে।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ
تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾
وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ
لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا
نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

তরজমা

(১১) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা (আজরাঈল) তোমাদের প্রাণ হরণ করবে এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

(১২) (হে রসূল!) যদি আপনি কখনো দেখতেন যখন (কেয়ামতের দিন) কাফেররা তাদের প্রতিপালকের সন্মুখে মাথা নত করে রয়েছে (তারা বলছে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম এবং শ্রবণ করলাম, এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ্ কর, আমরা ভাল কাজ করবো, নিশ্চয় আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।

(১৩) আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করতাম, কিন্তু আমার এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে যে জ্বীন ও মানুষ দ্বারা অবশ্যই দোযখ পূর্ণ করবো।

(১৪) অতএব শাস্তি ভোগ কর, কেননা আজকের এ মোলাকাতের কথা তোমরা ভুলে রয়েছিলে, আমি তোমাদেরকে ভুলে রইলাম, তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের একথা উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, আমরা যখন মাটির সঙ্গে মিশে যাবো, তখন কি আবার নতুন করে অস্তিত্ব লাভ করবো? আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের একথারই জবাব দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের রূহ কবজ করে নিয়ে যায়, এভাবে তোমাদের মৃত্যু হয়ে যায়। রূহকে সংরক্ষিত রাখা হয়, দেহটি মাটির সঙ্গে মিশে যায়, কেয়ামতের দিন পুনরায় এই রূহকে মাটির মধ্যে ফুঁকে দেয়া হবে। তখন তোমরা পুনর্জীবন লাভ করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দেয়ার জন্যে হাযির করা হবে।

জীবনঃ মৃত্যুঃ পুনর্জীবন

মূলতঃ কাফেররা মানব দেহকেই মানুষ মনে করতো, এ কারণে তাদের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, একবার আমরা যখন মাটির সঙ্গে মিশে যাব তখন পুনরায় কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করবো? তাদের নিকট নতুন করে অস্তিত্ব লাভ করা ছিল অসম্ভব। কিন্তু তারা এ সত্য উপলব্ধি করেনি যে, শুধু দেহের নাম মানুষ নয়; বরং মানব দেহ এবং রূহ একত্রিত হলেই মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে। অতএব রূহ ব্যতীত শুধু দেহের নাম মানুষ নয়, প্রকৃত মানুষ হলো তার রূহ। এ রূহ কবজ করা হলে মানুষের মৃত্য হবে, এজন্যে আল্লাহ পাকের হুকুমে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতা মানুষের রুহ কবজ করে নিয়ে যায়। যদি ঈমানদার ও নেককার হয় তবে তা ইল্লিয়্যীনে রাখা হয় আর যদি কাফের ও পাপীষ্ঠ হয় তবে তাকে সিজ্জীনে রাখা হয়। মানুষের রূহের ক্ষয় নেই, লয় নেই, যখন কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের হুকুম হবে তখন ঐ রূহটিকে মাটির মধ্যে যথা নিয়মে ফুঁকে দেয়া হবে। তখন সে পুনরায় জীবিত মানুষে রূপান্তরিত হবে। আজরাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতগণ এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অর্থাৎ রূহ কবজ করার পর তাকে স্ব-স্থানে পৌঁছে দিয়ে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তাঁরা পালন করে থাকেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে এবনে আবি হাতেমে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী সাহাবীর শিয়রে আজরাঈল (আঃ)-কে উপস্থিত দেখে তাকে বললেন, "আমার সাহাবীর প্রতি আসানী করুন"। তখন আজরাঈল (আঃ) বললেন, "হে আল্লাহর নবী! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিজেই ঈমানদারদের সাথে অত্যন্ত বিনম্র ব্যবহার করে থাকি। হে আল্লাহর রসূল! শপথ আল্লাহ্ পাকের, আমি সারা পৃথিবীর সকল কাঁচা-পাকা বাড়ীর অধিবাসীদের প্রতি দৈনিক পাঁচ বার লক্ষ্য রাখি। পৃথিবীর প্রত্যেক ছোট-বড় মানুষকে আমি এতটা জানি যতটা সে নিজেও নিজেকে জানে না। হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ, আমি একটি মাছির প্রাণ হরণ করার শক্তিও রাখিনা যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হুকুম হয়"।

হযরত জাফর সাদেক (রাঃ)-এর মতে, পাঁচ বার মালাকুল মওতের সারা পৃথিবীর মানুষের প্রতি লক্ষ্য রাখার তাৎপর্য হলো হযরত আজরাঈল (আঃ) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় প্রত্যেকের উপর দৃষ্টিপাত করেন। যদি কোন ব্যক্তিকে নামাজের হেফাজতে মশগুল দেখেন তবে তার হেফাজতের জন্যে ফেরেশতাগণ মশগুল থাকেন। আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। আর তার জীবনের শেষ মুহূর্তে তাকে

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ পাঠ করার তালকীন করেন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, মালাকুল মওত প্রতি দিন প্রত্যেক বাড়ীর সন্মুখে দু'বার করে আসেন। আর কাবে আহবার (রাঃ) বলেছেন, মালাকুল মওত প্রত্যেক বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে দৈনিক সাতবার লক্ষ্য করেন যে এই বাড়ীতে এমন কোন লোক আছে কি-না যার রূহ কবজ করতে হবে। আর কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে, আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেকই তা হবে এবং প্রত্যেককেই সেদিন তার কর্মফল দেয়া হবে।[১]

মৃত্যু সম্পর্কে আরও কথা

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে আরও বিশেষ কয়েকটি কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) কারো মৃত্যুর নিদৃষ্ট সময় মালাকুল মওতের জানা থাকেনা, যখন কারো রূহ কবজ করার হুকুম হয় তখন তিনি জানতে পারেন। তাঁকে বলা হয় অমুক সময় অমুক ব্যক্তির রূহ কবজ কর।

(২) মৃত্যুর জন্যে নিযুক্ত ফেরেশতা মোমেনের জন্যে অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করেন আর কাফেরের জন্যে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং বীভৎস আকৃতি ধারণ করেন।

এবনে আবিদ দুনিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, যখন আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর বন্ধুরূপে নির্বাচিত করেন তখন মালাকুল মওত দরবারে এলাহীতে এ আরজী পেশ করেন, আমাকে অনুমতি দান করা হলে আমি এ সুসংবাদ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট পৌছাতে পারি। আল্লাহ পাক অনুমতি দান করলেন। মালাকুল মওত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এ সুসংবাদ দিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! এরপর বললেন, হে মালাকুল মওত! তুমি কাফেরদের রূহ কিভাবে কবজ কর, আমাকে দেখিয়ে দাও। মালাকুল মওত বললেন, আপনি তা সহ্য করতে পারবেন না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, তা কেন হবে? তখন মালাকুল মউত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দিক থেকে তাঁর চেহারা ফিরিয়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর দিকে তাকালেন। তখন ইব্রাহীম (আঃ) দেখলেন, কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি তাঁর সন্মুখে দন্ডায়মান রয়েছে, তার মাথাটা আসমানকে স্পর্শ করছে, আর তার মুখ থেকে আগুন বের হচ্ছে। তার দেহের প্রত্যেক পশম থেকে একটি মানুষের আকৃতি প্রকাশ পাচ্ছে এবং তার মুখ এবং পশম থেকে অনুরূপভাবে আগুন বের হচ্ছে। এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলো তখন তিনি দেখলেন মালাকুল মওত তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে রয়েছেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, হে মালাকুল মওত! কোন কাফের তার মৃত্যুর সময় আপনার এ ভয়াবহ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৬২

আকৃতি দেখা ছাড়া আর কোন কিছুর সন্মুখীন যদি না-ও হয়, তবু এ আকৃতি তার বিপদের জন্যে যথেষ্ট। যাহোক, আমাকে বলুন মোমেনদের রূহ কবজ করার সময় কি অবস্থা হয়? তখন মালাকুল মওত তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। ক্ষণিকের মধ্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দিকে দেখলেন। একজন অত্যন্ত সুপুরুষ রূপে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুগন্ধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাঁর পোশাক ছিল সাদা ধবধবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, মৃত্যুর সময় যদি কেউ আপনার এ পবিত্র সুন্দর চেহারা দেখে, এতদ্ব্যতীত আর কোন আনন্দ সামগ্রী তার নিকট না-ও থাকে তবু তার আনন্দের জন্যে তা যথেষ্ট হবে।

হযরত কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে মালাকুল মওত তাঁর সেই সুন্দর চেহারা দেখিয়েছেন যা কোন মোমেনের রূহ কবজ করার সময় হয়ে থাকে। তখন ইব্রাহীম (আঃ) মালাকুল মওতের চেহারায় অত্যন্ত চমক এবং সৌন্দর্য দেখেছিলেন, যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানেনা। আর কাফেরদের রূহ কবজ করার সময় যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছিলেন তা দেখে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বাহুতে কম্পন সৃষ্টি হয়, তখন তিনি পেটকে জমিনের উপর ছেড়ে দেন। তার অবস্থা এত ভয়াবহ হয়েছিল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই যেন তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে।

(৩) জীব-জন্তুর মৃত্যু কিভাবে হয়? আবুশ শেখ, দায়লামী এবং ওকায়লী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ চতুঃস্পদ জন্তু এবং জমীনের কীট-পতঙ্গের জীবনের মেয়াদ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। যখন তাদের তসবীহ খতম হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক নিজে তাদের প্রাণ হরণ করে নেন। মওতের ফেরেশতার তাতে কোন দায়িত্ব থাকেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসেও একথার উল্লেখ রয়েছে যে মালাকুল মওতের অংশগ্রহণ ব্যতীতই আল্লাহ পাকের হুকুমে তাদের জিন্দেগীর অবসান ঘটে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, মোমেনদের সম্মান বৃদ্ধির জন্যে এবং কাফেরদের শাস্তি প্রদানের জন্যে আল্লাহ পাক মানুষের মৃত্যুর জন্যে মালাকুল মওত এবং তাঁর সঙ্গী ফেরেশতাদের নিযুক্ত করেছেন।

খতীব তাঁর তফসীরে যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক মানুষের রূহ কবজ করার জন্যে মালাকুল মওতকে নিযুক্ত করেছেন, আর জ্বীনদের জন্যে অন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। আর একজন ফেরেশতা শয়তানদের রূহ কবজ করার জন্যে নিযুক্ত রয়েছেন। আর পশু-পক্ষী, মৎস্য, পিপীলিকা প্রভৃতির মৃত্যুর জন্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। সর্বপ্রথম শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চারজন সহ সমস্ত ফেরেশতা বেহুশ অবস্থায় মৃত্যুমুখে

পতিত হবেন, মালাকুল মওত তাঁদের রূহ কবজ করার জন্যে নিযুক্ত রয়েছেন। এরপর মালাকুল মওতেরও মৃত্যু হয়ে যাবে।

এবনে মাজায় হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক মালাকুল মওতকে সমুদ্রের শহীদান ব্যতীত আর সকলের রূহ কবজের দায়িত্ব দিয়েছেন, সমুদ্রের শহীদানের রূহ কবজ করার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজেই গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, যারা আল্লাহ পাকের এশক ও মহব্বতে নিমজ্জিত তাঁরা এই সম্মানের অধিকতর অধিকারী (আল্লাহ পাকই সর্বাধিক জ্ঞানী)।

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

"এরপর তোমরা সকলেই তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবে"।

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ মৃত্যুর পর মোমেনের রূহ উপরের দিকে নিয়ে যাবেন, এমনকি সপ্ত আসমানে পৌঁছে দেবেন। আর কাফেরের রূহ আযাবের ফেরেশতাগণ নিয়ে যাবেন। প্রথম আসমানে পৌঁছার পর দরজা খুলতে বলা হবে কিন্তু কাফেরের রূহের জন্যে আসমানের দরজা খোলা হবেনা; বরং সেগুলোকে উপর থেকে নীচের দিকে নিক্ষেপ করা হবে।

অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো প্রত্যেকটি মানুষকে পুনর্জীবন দান করে হিসাবের স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। আর হিসাবের পর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমল অনুযায়ী বদলা দেয়া হবে।[১]

এবনে আবি হাতেম এবং আবুশ শেখ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে একজন মানুষ পৃথিবীর প্রাচ্যে থাকে আরেকজন প্রতীচ্যে। মালাকুল মওত কিভাবে একই সময়ে দু'জনের রূহ কবজ করেন? তখন প্রশ্নকারীকে বলা হয় হযরত আজরাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ পাক এমন শক্তি দিয়েছেন যে সারা বিশ্ব তাঁর নিকট একটি তশতরীর ন্যায়, তাই বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে তিনি যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা তার রূহ কবজ করতে পারেন।

যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক মোমেনদের রূহ কবজ করার জন্যে হযরত আজরাঈল (আঃ)-কে দায়িত্ব দিয়েছেন কিন্তু অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ একমত যে সকলের রূহ কবজ করার জন্যে আজরাঈল (আঃ)-এর প্রতি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। শুধু জেহাদের উদ্দেশে যারা বের হন এবং সামুদ্রিক পথে তাঁদের শাহাদাত হয় এমন লোকদের রূহ কবজ করার দায়িত্ব স্বয়ং

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭৩-৭৪
তফসীরে আদদুরল মানছুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৭
তফসীরে রূহুল মাআনী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৫
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬২

আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন। তাঁদের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন-কল্পে।

পুনর্জীবন পুনরুত্থান কঠিন নয়

যেহেতু কাফেররা পুনর্জীবন বা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে, কেয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করেছে, কর্মফল ভোগ করতে হবে একথাও তারা অস্বীকার করেছে, তাই তাদের উদ্দেশে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ○

"এরপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই ফিরে আসবে। আর এটি আল্লাহ পাকের পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়"।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আজরাঈল শব্দটির অর্থ হলো আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বন্দা। আর তিনি আল্লাহর একজন বন্দাই কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে তিনি মানব দেহ থেকে রূহ বের করে নিয়ে আসেন, অথচ দেহের মধ্যে রূহ এমনভাবে গোপন রাখা হয়েছে যে কখনো কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যেও তা দেখা যায় না। যদি আল্লাহ পাকের এক বন্দার দ্বারা এমন গোপন রূহ বের করে আনা সম্ভব হয় তবে স্রষ্টা ও পালনকর্তা, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ পাকের পক্ষে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া মানব দেহকে মাটি থেকে বের করে আনা কেন কঠিন হবে?[১]

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ○

"(হে রসূল!) যদি আপনি দেখতেন যে কাফেররা যখন (কেয়ামতের দিন) তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অবনত মস্তকে দাঁড়াবে এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখেছি, আমরা শুনেছি এখন যদি আমাদেরকে ফেরত যেতে দাও তবে আমরা ভাল কাজ করবো, আমরা তোমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি"।

যারা পৃথিবীতে অবাধ্য কাফের ছিল, অহংকারী, অপরাধী এবং অবিশ্বাসী ছিল, যখন তাদেরকে কেয়ামতের দিন হাযির করা হবে তখন তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়াবে এবং কাকুতি-মিনতি করে একথা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা সবকিছু দেখেছি, সব কিছু শুনেছি, আমাদের মনে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে যে তুমি সত্য, তোমরা রসূল সত্য, তোমার কালাম সত্য, এ অবস্থায় যদি আমাদেরকে দয়া করে পৃথিবীতে আবার যেতে দাও তবে আমরা অনেক ভাল কাজ করবো, কেননা আমরা পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েছি।

আল্লাহ পাক ভাল ভাবেই জানেন যে, যদি তাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে আসতে দেয়া

১। তফসীরে রূহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১২৬

হয় তবে এ পাপীষ্ঠরা আবারও অনুরূপ অনাচারে লিপ্ত হবে, তাদের অন্যায়-অনাচারে এতটুকু ভাটা পড়বে না। আর এজন্যেই কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِیْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا

"হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য হতে কোন রসূল আসেনি? যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াত সমূহ বর্ণনা করেছে এবং আজকের এদিন সম্পর্কে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছে"।

এ প্রশ্নের জবাবে কাফেররা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই স্বাক্ষ্য দেবে, সেদিন তারা স্বীকার করবে যে দুনিয়ার জীবনে তারা অন্যায় করেছে। কিন্তু এ স্বীকৃতি তাদের কোন কাজে আসবে না। তাই আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন এরশাদ করবেনঃ

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّیْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

"আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হেদায়েত করতাম কিন্তু আমার এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে যে জ্বীন ও মানুষ দ্বারা আমি দোযখকে পরিপূর্ণ করবো"।

অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে দূরাত্মা কাফেররা দুনিয়াতে মিথ্যাবাদীতায় অভ্যস্ত ছিল, কেয়ামতের কঠিন দিনেও মিথ্যা বলার অভ্যাস পরিহার করবে না। তারা যে সেদিন বলবে, 'আমাদেরকে পৃথিবীতে ফেরত যেতে দিলে আমরা ভাল কাজ করবো'। তাদের একথাও সত্য নয়, বরং একেবারই মিথ্যা তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

যদি তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয় তবে তারা পুরাতন অভ্যাসেই মেতে উঠবে, তাদের জন্যে যা নিষিদ্ধ তা তারা করবে। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। আর এ প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ ولو شئنا অর্থাৎ যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে তাদের প্রকৃতি পরিবর্তন করে তাদেরকে ভাল কাজ করতে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু ভাল কাজের জন্যে কোন বন্দাকে বাধ্য করা আল্লাহ পাকের নীতি বিরুদ্ধ কাজ, তিনি কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"যার ইচ্ছা ঈমান আন আর যার ইচ্ছা কাফের হও"।

এমনিভাবে, দ্বীন ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করাও ইসলামী নীতির পরিপন্থী, তাই আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই"।

এজন্যে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে প্রত্যেককে হেদায়েত দান করতাম, অর্থাৎ তার প্রকৃতি পরিবর্তন করে তাকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করতাম কিন্তু তা করা হয়না।

وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

তাই ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, জ্বীন ও মানুষ দ্বারা দোযখকে পরিপূর্ণ করা হবে, আর শয়তানের অনুসারী জ্বীন ও মানুষ দ্বারাই দোযখকে পরিপূর্ণ করা হবে— একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الجنة والناس দ্বারা পাপীষ্ঠ লোকদের উদ্দেশে করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক কিছু লোককে জন্মগতভাবে জান্নাতী বানিয়েছেন, যখন তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের পৃষ্ঠদেশে ছিল তখনই তাদেরকে জান্নাতের জন্যে নিদৃষ্ট করেছেন। আর কিছু লোককে জন্মগতভাবে দোযখী বানিয়েছেন, যখন তারা তাদের পূর্ব পুরুষের পৃষ্ঠদেশে ছিল তখনই তাদেরকে দোযখের জন্যে নিদৃষ্ট করেছেন। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে দোযখে অথবা জান্নাতে ঠিকানা পূর্বেই লিপিবদ্ধ রাখা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তাহলে আমরা কেন সেই লেখার উপর ভরসা করে থাকি না? আর কেন এই আমল পরিত্যাগ করি না? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা আমল করতে থাক, প্রত্যেককে সে কাজেই নিয়োগ করা হয়, যার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাকে ভাগ্যবান লেখা হয়েছে, তার জন্যে নেককার ভাগ্যবানদের আমল সহজ করা হয়, আর যাকে হতভাগা লেখা হয়েছে, তার জন্যে হতভাগাদের আমল সহজ করা হয়। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى তেলাওয়াত করলেন। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দস্তে মোবারকে দু'টি লেখা নিয়ে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা কি জান এই লেখায় কি রয়েছে, আমরা বললাম, আমরা কিছু জানিনা। তখন তিনি তাঁর ডান হাতের লেখাটি সম্পর্কে এরশাদ করলেন, এটি বিশ্ব

প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে লেখা, এতে সকল জান্নাতী ব্যক্তির নাম তার পূর্ব পুরুষের নাম সহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এরপর তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর বাম হাতে যে লেখাটি ছিল তার সম্পর্কে বলেছেন, এটিও বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের লেখা, এতে দোযখীদের নাম তাদের পূর্ব পুরুষদের নাম সহ রয়েছে, এরপর তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এরপর এতে আর কম-বেশী করা হবেনা, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যখন বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গেছে তখন আর আমল করার উদ্দেশ্য কি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, সঠিক পথে চলতে থাক, জান্নাতী ব্যক্তির শেষ আমল জান্নাতবাসীর আমলের ন্যায়ই হয়, ইতিপূর্বে যেমনই করুক, আর দোযখী ব্যক্তির শেষ আমল দোযখীর ন্যায় হয়, ইতিপূর্বে সে যেমনই করুক। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ লেখাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে তা সরিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ লেখাগুলো গায়েব হয়ে গেল। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সুসম্পন্ন করেছেন, একদল জান্নাতী, আর একদল দোযখী হবে।[১]

মূলতঃ আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে যে পুরস্কার ও শাস্তির ঘোষণা রয়েছে তা ঈমান ও নেক আমলের ভিত্তিতে, আর ঈমান ও নেক আমল হতে হবে ঐচ্ছিক, কেউ বাধ্য হয়ে ঈমান আনলে তার জন্যে পুরস্কারের কোন ব্যবস্থা নেই। যে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে ঈমান আনবে, নেক আমল করবে তার জন্যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

"যে নেক আমল করবে, পুরুষ হোক কী নারী, আর সে মোমেন হবে, তাকে আমি দান করবো পবিত্র সুন্দর জীবন, আর তাকে আমি তার নেক আমলের জন্যে উত্তম বিনিময় দান করবো"।

পক্ষান্তরে, যারা কাফের এবং অবাধ্য হবে তাদের উদ্দেশে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা রয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

"আর যারা কাফের হবে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা-জ্ঞান করবে তারা হবে দোযখবাসী, আর তারা চিরদিন তাতে থাকবে"।

এজন্যে কেয়ামতের দিন তাদেরকে যা বলা হবে তা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৭৫-৭৬

"তোমরা যেভাবে নিজেদের এই দ্বীনকে ভুলে রয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে এভাবে ভুলে রইলাম, অতএব তোমরা সেই ভুলে থাকার স্বাদ ভোগ করতে থাক। সে স্বাদ হলো চিরশাস্তি আর তা হবে তোমাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ"।

দুনিয়ার জীবনে যারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা ভুলে যায় এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ ভুলে যায়, তাঁর প্রতি ঈমান আনেনা, তাঁর প্রেরিত রসূলকে অবিশ্বাস করে, তাদের জন্যে কেয়ামতের দিন এ ঘোষণা করা হবে। যেভাবে তোমরা কেয়ামতের দিনের হাযিরীকে ভুলে গিয়েছিলে, তেমনি আজ আমিও তোমাদেরকে ভুলে যাব, আর তোমরা সারা জীবন যে নাফরমানী করেছ, তার শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ দোযখের চির শাস্তি ভোগ কর। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ (সূরা তোয়াহা)

"তিনি বললেন, যেভাবে তোমাদের নিকট এসেছিল আমার আয়াত সমূহ কিন্তু তা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে, আর এভাবেই আজ তোমাদেরকে ভুলে যাওয়া হবে"।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا
سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ
جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ
أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ
فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا
فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَ
قِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৫) আমার আয়াত সমূহ শুধু তারাই মানে, যাদেরকে এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসায় তারা তসবীহ পাঠ করে,

আর তারা অহংকার করেনা।

(১৬) শয়ন ও শয্যা থেকে তাদের দেহের পার্শ্ব পৃথক থাকে, তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়, আর আমি যে রিয্‌ক তাদেরকে দান করেছি, তা থেকে তারা (আল্লাহর রাহে) ব্যয় করে।

(১৭) তাদের সত্য-সাধনার পরিণামে তাদের জন্যে যে নয়ন জুড়ানো গোপন নেয়ামত রয়েছে, কেউ তার কথা জানেনা।

(১৮) তবে কি যে ঈমানদার হয়েছে সে কি পাপীষ্ঠের ন্যায়? তারা সমান নয়।

(১৯) যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের কৃতকর্মের পরিণতি স্বরূপ, তাদের আপ্যায়নের জন্যে জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান।

(২০) আর যারা নাফরমানী করে তাদের বাসস্থান হবে দোযখ, যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখন তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে, যে আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা-জ্ঞান করতে, এখন তাই ভোগ কর।

তফসীরুল কোরআন

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا

মোমেনদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মোমেনদের অবস্থা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

(১) মোমেনগণ আল্লাহ পাকের কথাকে অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে।

(২) যখন তাদেরকে আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করিয়ে দেয়া হয় তখন তারা দরবারে এলাহীতে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

অর্থাৎ মোমেনের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।

(৩) আর সেজদারত অবস্থায় আল্লাহ পাকের হামদ, তাসবীহ-তাহলীলে মোমেনের রসনা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে শেরক থেকে পবিত্রতা অর্জন করা হয়।

(৪) আর তারা অহংকার করেনা; বরং বিনয়ী হয়।

(৫) মোমেনদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলোঃ

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

"তাদের পাঁজর বিছানা থেকে পৃথক থাকে"।

অর্থাৎ তারা বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করে রাত্রি অতিবাহিত করেনা; বরং রাত্রিকালে তারা আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, সে সব লোক কোথায়? যারা রাত ভর আল্লাহ্ পাকের এবাদতে মশগুল থাকতো, তাদের দেহ বিছানা স্পর্শ করতো না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

অর্থাৎ যাদের দেহের পার্শ্ব বিছানা থেকে দূরে থাকতো।

আর সূরায়ে ফোরকানে তাদের বিবরণ রয়েছে এভাবেঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا○

"আর যারা রাত্রি যাপন করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশে সেজদারত অবস্থায় এবং দন্ডায়মান অবস্থায়"।

কেয়ামতের দিনের ঐ ঘোষণার পর কিছু লোক দন্ডায়মান হবে এবং তাদের সংখ্যা হবে অতি অল্প, এরপর ঘোষক আরেকটি ঘোষণা করবে, সে সব লোক কোথায়? যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বা দুনিয়ার জিন্দেগীর ব্যস্ততা তাদেরকে আল্লাহর বন্দেগী থেকে গাফেল করতো না, যেমন পবিত্র কোরআনে রয়েছেঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (সূরা নূর)

"সে সব লোক যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহ্ জিকর থেকে গাফেল করেনা"।

এ ঘোষণার পরও কিছু লোক দন্ডায়মান হবে, যাদের সংখ্যা হবে কম। এরপর পুনরায় ঐ ঘোষক ঘোষণা করবে, সে সব লোক কোথায়? যারা সুখে দুঃখে আল্লাহ্ পাকের হামদ করতো।

এবারও সামান্য সংখ্যক লোক দাড়াবে। তখন এসব লোককে বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম আওযায়ী (রঃ) সহ ওলামায়ে কেরামের একদল এ মত পোষণ করেছেন যে আলোচ্য আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ দ্বারা তাহাজ্জদ গুজার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কল্যাণ অর্জনের পথ

ইমাম আহমদ, তিরমিজী, এবনে মাজা, এবনে আবি শায়রা, এবনে রাহবিয়া ও হাকেম হযরত মাআজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হযরত মাআজ (রাঃ) বলেছেন, আমি আরজ করেছি, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল বাতলে দিন, যার কারণে জান্নাতে যেতে পারি এবং দোযখ থেকে দূরে থাকতে পারি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, তুমি অত্যন্ত বড় কথা জিজ্ঞাসা

করেছ, আর আল্লাহ পাক যাকে তওফিক দান করেন তার জন্যে তা কঠিনও নয়, তুমি শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমজানের রোজা রাখবে, কা'বার হজ্জ করবে, এরপর এরশাদ করেছেন, আমি কি কল্যাণের কথা বলবো না, শোন রোজা হল ঢাল, গুনাহ থেকে এবং দোযখ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ঢাল, দান খয়রাত গুনাহকে এভাবে শেষ করে দেয় যেমন পানি অগ্নিকে, আর মধ্য রাত্রিতে নামাজ আদায় করাও কল্যাণের পথ। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

তেলাওয়াত করলেন। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে দ্বীনের মাথা, খুঁটি ও উঁচু চূড়ার কথা বলবোনা? হযরত মাআজ (রাঃ) আরজ করলেন, অবশ্যই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, দ্বীনের মাথা হলো ইসলাম, এর খুঁটি হলো নামাজ, আর তার উচ্চ চূড়া হলো জেহাদ, এরপর তিনি এরশাদ করেন, আমি কি তোমাকে এসব কিছুর ভিত্তি কি তা বলে দেবনা? তিনি আরজ করলেন, জ্বীহা। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রসনা স্পর্শ করে এরশাদ করলেন, একে নিয়ন্ত্রণ করে রাখ। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা রসনা দ্বারা কথা বললেও কি তার উপর ধর-পাকড় হবে? তখন তিনি এরশাদ কররেন, হে মাআজ! তোমার মাতা তোমার জন্যে ক্রন্দন করুক, যাদেরকে অধঃমুখী করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তা রসনার ব্যবহারের কারণেই করা হবে।

হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতে এমন কিছু অট্টালিকা রয়েছে, যার বাইরে থেকে ভেতর এবং ভেতর থেকে বাইরে দেখা যায়, আল্লাহ পাক এ অট্টালিকাগুলো তাদের জন্যে তৈরী করেছেন যারা বিনম্রভাবে কথা-বার্তা বলে এবং ক্ষুধার্তদের খাবার দান করে, সর্বদা রোজা রাখে, আর রাত্রি বেলা যখন পৃথিবীর মানুষ নিদ্রিত থাকে তারা তখন নামাজ আদায় করে। (বায়হাকী, তিরমিজী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রমজানের পর সর্বোত্তম আমল হলো মহররমের রোজা, আর ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ (তাহাজ্জদের নামাজ)।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক দু' ব্যক্তিকে অত্যন্ত পছন্দ করেন, একজন হলো সে ব্যক্তি যে নরম-গরম বিছানা ছেড়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার ছেড়ে রাতে নামাজের জন্যে দণ্ডায়মান হয়, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বন্দাকে দেখ, সে আরামের বিছানা থেকে বের হয়ে এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার ছেড়ে এসে, আমার সওয়াবের আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে আমার সম্মুখে এসে

দণ্ডায়মান হয়েছে। দ্বিতীয় হলো সে ব্যক্তি যে আল্লাহর রাহে জেহাদ করে, এরপর পরাজিত হয়ে সাথীদের সাথে পলায়ন করে, ঐ অবস্থায় চিন্তা করে জেহাদ থেকে পলায়ন তো অত্যন্ত বড় অপরাধ, আর রণাঙ্গনে প্রত্যাবর্তন করে জেহাদে শরীক হওয়া অত্যন্ত বড় নেক আমল। মনে মনে এ কথা চিন্তা করার সাথে সাথে সে ফিরে আসে এবং জেহাদে শরীক হয়, এরপর সে শহীদ হয়ে যায়, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, দেখ আমার বন্দা কিভাবে সওয়াবের আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে জেহাদে ফিরে এসেছে, এমনকি তার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহার (রাঃ) কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الصبح ساطع

ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به- موقنات ان ما قال واقع

يبيت يجافى جنبه عن فراشه ـ اذا استثقلت بالمشركين المضاجع

"আমাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ পাকের রসূল, যিনি সকালে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেন, অন্ধত্বের পর (তথা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার পর) তিনিই আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, যা তিনি বলেছেন সবই ধ্রুব সত্য।

"তিনি রাত্রিকালে তাঁর পাঁজর বিছানা থেকে পৃথক করে রাখেন, যখন কাফেররা তাদের বিছানায় বোঝা হয়ে পড়ে থাকে"।

ইমাম তিরমিজী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আলোচ্য আয়াত تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ সে সব লোকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা মাগরিবের নামাজের পর এশার নামাজের অপেক্ষা করতো।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ এ আয়াত আমাদের আনসারী সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, আমরা মাগরিবের নামাজের পর বাড়ী ফিরতাম না, বরং মসজিদে অপেক্ষা করতাম, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামাজ আদায় করতাম, এরপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করতাম।

এবনে আবি হাতেম এবং মোহাম্মদ এবনে মোনকাদের (রঃ)-এর মতে, এ আয়াতে যে নামাজের কথা বলা হয়েছে তা হলো সালাতুল আওয়াবীন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবু দরদা (রাঃ), হযরত আবুজর (রাঃ) এবং হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) এশা এবং ফজরের নামাজ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জামাআতে আদায় করতেন।

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আহমদ হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন

যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাআতের সঙ্গে আদায় করলো, সে অর্ধেক রাত নামাজ আদায় করলো, আর যে ফজরের নামাজ জামাআতের সঙ্গে আদায় করে সে যেন সারা রাত নামাজে অতিবাহিত করলো।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি লোকেরা আযান দেয়ার এবং নামাজের প্রথম কাতারে শরীক হওয়ার সওয়াব সম্পর্কে অবগত হতো, আর যদি লটারী ব্যতীত আযান দেয়া এবং প্রথম কাতারে শরীক হওয়া সম্ভব না হতো তবে তারা অবশ্যই লটারী করতো। আর জোহরের নামাজ জামাআতের সঙ্গে আদায় করার সওয়াব যদি তারা জানত, তবে দৌড়ে গিয়ে জামাআত ধরার চেষ্টা করতো, আর যদি তারা এশা এবং ফজরের নামাজ জামাআতের সাথে আদায়ের সওয়াব সম্পর্কে অবগত হতো, তবে দৌড়ে গিয়ে হাযির হতো।[১] (বোখারী, মুসলিম, আহমদ, নোসায়ী)

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এ আয়াত تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ। তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা এশার নামাজের পূর্বে নিদ্রিত হতোনা। এজন্যে আল্লাহ পাক তাদের প্রশংসা করেছেন, আর একথা শ্রবণ করে লোকেরা বিছানা থেকে দূরে থাকত যেন নিদ্রা তাদেরকে পেয়ে না বসে।[২]

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ এর অর্থ হলো তারা আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকার কারণে বিছানা থেকে দূরে থাকতেন। আর নিদ্রিত হলে যখনই জাগ্রত হতেন তখনই আল্লাহর জিকরে মশগুল হতেন। নামাজরত অবস্থায় অথবা দাঁড়ানো, বসা এবং শায়িত অবস্থায় এককথায় সর্বক্ষণ তাঁরা আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকতেন।

অধিকাংশ তফসীরকার এ আয়াত দ্বারা রাতের নফল এবাদত তথা তাহাজ্জদকে উদ্দেশ্য করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত মুজাহেদ (রঃ), মালেক (রঃ) এবং আওজায়ী (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।[৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, 'তারা বিছানা থেকে তাদের পাঁজরকে পৃথক রাখতেন' এর অর্থ হলো তারা আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে রাত্রি যাপন করতেন। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৭-৮১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫
২। তফসীরে আদদুররুল মানছুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৯-৯০
৩। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৩১

"তারা রাতের অতি সামান্য সময়-ই নিদ্রিত হতো"।[১]

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

(৬) অর্থাৎ মোমেনদের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য যে, তারা আল্লাহ্ পাককে ডাকতো আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি ও আযাবের ভয় নিয়ে এবং তাঁর রহমতের আশা নিয়ে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্ পাকের ভয় এবং সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবাদত করা দোষের নয় কিন্তু মানুষের ভয়ে অথবা মানুষকে আকৃষ্ট করার আশায় এবাদত করা বৈধ নয়, কেননা একেই "রিয়া" বলা হয়।

وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ○

(৭) আর আমি যে রিয্ক তাদেরকে দান করেছি, তা থেকে তারা (কল্যাণকর কাজে) ব্যয় করে। বস্তুতঃ এটিও মোমেনদের একটি বৈশিষ্ট্য যে তারা আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত রিয্ক থেকে আল্লাহর রাহে দান করে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, সাধারণতঃ এ বর্ণনা-ভঙ্গীতে যখন ব্যয় করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ যাকাত হয়। বিশেষতঃ যখন পূর্বে নামাজের কথা উল্লেখ করা হয় যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ○

"আর তারা নামাজ কায়েম করে ও আমার প্রদত্ত রিয্ক থেকে ব্যয় করে তথা যাকাত আদায় করে"।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা ফরজ যাকাতই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, শুধু যাকাতই নয়; বরং সর্বপ্রকার দান খয়রাতই এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[২]

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

"তাদের সাধনার শুভ-পরিণতি স্বরূপ যে নয়ন জুড়ানো গোপন নেয়ামত রয়েছে, তার কথা কেউ জানেনা"।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে সে মোমেনগণের কথা যাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্ পাকের হামদ এবং তসবীহে মশগুল হয়। তারা কখনো অহংকার করেনা, বিনয়ী, বিনম্র এ মোমেনগণ রাত্রিকালে যখন মানুষ ঘুমে বিভোর থাকে তখন রাতের নিভৃত অন্ধকারে তারা আল্লাহ্ পাকের এবাদতে মশগুল থাকে, তাদের পাঁজর বিছানায় লাগেনা, তারা আল্লাহ্ পাককে

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৮১
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৭-৮১

ডাকতে থাকে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে এবং তাঁর রহমতের আশায় আশান্বিত হয়ে, তারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে কল্যাণকর কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

মোমেনদের উদ্দেশে শুভ-পরিণতির সুসংবাদ

আর এ আয়াতে এমন মোমেনদের সৌভাগ্য এবং শুভ-পরিণতির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ যারা গভীর রাতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তাঁর এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়, শেষ রাতের মধুর নিদ্রা এবং সুখ-শয্যা ত্যাগ করে, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্রন্দনরত হয়, তাদের সওয়াব বা শুভ-পরিণতি বর্ণনাতীত এমনকি কল্পনাতীত। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

অর্থাৎ নেককার মোমেনদের জন্যে আল্লাহ পাক জান্নাতে কি নেয়ামত এবং সুখ-সামগ্রী রেখে দিয়েছেন, তা কেউ জানে না। যেহেতু তারা গোপনে আল্লাহ পাকের এবাদত করতো, তাই আল্লাহ পাকও তাদের জন্যে নয়ন জুড়ানো অসংখ্য নেয়ামত সমূহ রেখে দিয়েছেন। যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কর্ণ কখনো শ্রবণ করেনি, এমনকি কোন অন্তর তা কখনো কল্পনাও করেনি।

বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি আমার নেককার বন্দাদের জন্যে এমন অসংখ্য রহমত ও নেয়ামত তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনো দেখিনি, কোন কর্ণ কখনো শ্রবণ করেনি এবং কোন অন্তর কখনো তা চিন্তাও করেনি। এই হাদীস বর্ণনা করার পর বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতের নেয়ামত যারা পাবে, তারা কখনো তা থেকে মাহরূম হবে না। তাদের পোশাক কখনো পুরাতন হবে না, তাদের যৌবন কখনো বিদায় নেবে না, আর জান্নাতে তাদের জন্যে এমন নেয়ামত সমূহ রয়েছে, যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণও করেনি এবং কোন মানুষের অন্তর কখনো তা কল্পনাও করেনি। (মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফে আরও একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করেছেন, হে আল্লাহ! সর্ব নিম্নস্তরের জান্নাতীর মর্তবা কি? আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জবাব দেয়া হলো, সর্ব নিম্নস্তরের জান্নাতী হবে সে ব্যক্তি যে সকল জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশ করার পর আসবে, তাকে বলা হবে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর, সে আরজ করবে, হে আল্লাহ! কোথায় যাবো? প্রত্যেকেই তার নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে, আর যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী গ্রহণ করেছে। তখন তাকে বলা হবে তুমি কি এতে খুশী রয়েছ? দুনিয়ার কোন বাদশাহর যে সম্পদ এবং দ্রব্য-সামগ্রী থাকত তোমার জন্য তা হয়ে যায়।

তখন সে বলবে, আমি অবশ্যই এতে খুশী হবো। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তোমার জন্যে এতখানি রয়েছে, আরও এতখানি, আরও এতখানি, আরও এতখানি, আরও এতখানি (অর্থাৎ) দুনিয়াতে কোন বাদশাহর যা থাকে তার পাঁচগুণ সম্পদ ও সুখ-সামগ্রী তাকে দেয়া হবে। সে বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট, আমি খুশী হয়েছি, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ এসব তোমাকে আমি দিয়েছি, এর আরও দশগুণ দিলাম। এরপর যা তোমার অন্তরে চায় এবং যা দ্বারা তোমার নয়ন সুশীতল হয় সবই তোমার জন্যে রইলো, সে আরজ করবে, হে পরওয়ারদেগার! আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি।

এরপর হযরত মুসা (আঃ) আরজ করেছেন, হে পরওয়ারদেগার! যারা উচ্চ পর্যায়ের জান্নাতী হবেন, তাদের কি অবস্থা হবে? তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ এরা সেসব ভাগ্যবান লোক যাদের নেয়ামতের বীজ আমি স্বহস্তে বপন করেছি, আর তার উপর মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছি। তাই তা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণও করেনি, আর কোন অন্তর কল্পনাও করেনি। আলোচ্য আয়াতে যে ঘোষণা রয়েছে, তাই অবশেষে ঘটনায় পরিণত হবে।

হযরত সাঈদ এবনে যুবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ফেরেশতাগণ জান্নাতীদের নিকট দুনিয়ার দিনের সমান সময়ের মধ্যে তিনবার করে জান্নাতীদের নিকট যাবে। আর জান্নাতে আদন থেকে আল্লাহ পাকের তোহফা নিয়ে যাবে, যা তাদের জান্নাতে নেই, আলোচ্য আয়াতে সে নেয়ামতের কথাই উল্লেখিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ জান্নাতীদেরকে বলবে, আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন।

হযরত আবু ইয়ামান হাওজানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, জান্নাতের একশটি স্তর রয়েছে, প্রথম স্তর রৌপ্যের তার জমিনও রৌপ্যের। আর দ্বিতীয় স্তরটি হলো স্বর্ণের, তার জমিনও স্বর্ণের, সে জান্নাতের প্লেটও স্বর্ণের আর এই জান্নাতের মাটি হলো কস্তুরী। জান্নাতের তৃতীয় স্তরটি হলো মুক্তার, তার জমিনও মুক্তার আর মাটি হলো কস্তুরীর। এরপর যে সাতানব্বইটি স্তর রয়েছে তা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি এমনকি কোন মানুষ কখনো তা কল্পনাও করেনি। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১]

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

বেহেশতের যে নেয়ামতের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বেহেশতবাসীগণ লাভ করবে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। তারা জীবনকে আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে অতিবাহিত করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ পাক দান করবেন অনন্ত অসীম নেয়ামত।

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ○

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫

"তবে কি যে ব্যক্তি মোমেন হয়েছে সে কি পাপাচারীর ন্যায় হতে পারে? তারা সমান হতে পারেনা"।

শানে নজুল

ওয়াহেদী এবং এবনে আসাকের সাঈদ এবনে জুবায়ের (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রাঃ) এবং ওলীদ এবনে আকাবা এবনে মুয়ীদের মধ্যে কোন বিষয়ে কথা কাটাকাটি এবং ঝগড়া হয়েছিল। ওলীদ হযরত আলীকে বললো, তুমি এখনও শিশু, আর আল্লাহর শপথ! আমি তোমার চেয়ে বাগ্মী এবং তোমার চেয়ে শক্তিশালী, বীর। হযরত আলী (রাঃ) তাকে বললেন, চুপ! তুই আল্লাহর নাফরমান। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

মোমেন ও কাফের এক সমান নয়

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর ন্যায় বিচারের কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর দরবারে মোমেন ও কাফের অনুগত আর অবাধ্য এক সমান নয়, তাদের জীবন ধারা যেমন এক রকম নয়, ঠিক তেমনি জীবনের পরিণতিও এক সমান নয়। যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে কথাটি এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

"যারা মন্দ কাজে লিপ্ত তারা কি একথা ভেবে রেখেছে যে তাদের সাথে আমি সেই ব্যবহারই করবো যা ঈমানদার ও নেককারদের সাথে করি, তাদের জীবন ও মৃত্যু কি এক সমান"!

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَسْتَوِيْٓ أَصْحٰبُ النَّارِ وَأَصْحٰبُ الْجَنَّةِ

"দোযখবাসী ও জান্নাতবাসী কখনও এক সমান হবেনা"।[২]

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ○

জান্নাতবাসীগণ হবে সম্পূর্ণ সফলকাম, আর দোযখবাসীরা শুধু ব্যর্থ হবেনা, হবে বিপদগ্রস্ত, আর সে বিপদ সাময়িক হবেনা, হবে চিরস্থায়ী। এতদ্ব্যতীত মোমেন ও কাফের যে এক সমান নয়, তার আরও একটি প্রমাণ এই, কাফের ও পাপীষ্ঠ লোকদেরকে কেয়ামতের দিন নেককার মোমেনদের থেকে পৃথক করে রাখা হবে। পবিত্র কোরআনের

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮১
তফসীরে আদদুররুল মানছুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৯-৯০
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৬৭

সূরা ইয়াসীনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

“হে পাপীষ্ঠরা! আজকের দিনে তোমরা পৃথক হয়ে যাও”।

বস্তুতঃ আলো-আঁধার, ভাল-মন্দ যেমন এক নয়, নেককার ও বদকারও তেমনি এক হতে পারেনা। এভাবে মোমেন ও কাফেরও কখনও এক সমান হতে পারেনা। পরবর্তী আয়াতে বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

“আর যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদের কৃতকর্মের সুফল স্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্যে জান্নাত হবে চিরস্থায়ী বাসস্থান”।

মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, মোমেন এবং পাপীষ্ঠরা আদৌ এক সমান নয়। আর এ আয়াতে একথারই বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। যারা ঈমান আনে আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব পবিত্র কোরআনের প্রতি এবং সে ঈমান মোতাবেক নেক আমলও করে, তাদের আপ্যায়নের জন্যে জান্নাত সমূহ তৈরী করে রাখা হয়েছে। এটি হবে তাদের ঈমান ও নেক আমলের সুফল। ঈমান এবং নেক আমলের বরকতেই তারা চির শান্তি ও চির সুখ লাভ করবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ

পক্ষান্তরে, যারা পাপাচারে লিপ্ত হবে তথা কাফের হবে, তাদের ঠিকানা হবে দোযখ।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে فسقوا অর্থ كفروا অর্থাৎ যারা কাফের হয়েছে, কেননা সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ হলো কুফর ও শেরক, তাদের স্থায়ী ঠিকানা হবে দোযখ। আর ঐ দোযখ থেকে তারা কখনও রেহাই পাবে না। দোযখের কঠিন শাস্তি চিরদিন তারা ভোগ করতে থাকবে।

كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا

“যখনই তারা দোযখ থেকে বের হতে চাইবে, পুনরায় তাদেরকে সেখানেই ফিরিয়ে দেয়া হবে”।

অর্থাৎ দোযখের কঠিন শাস্তির কারণে যখন অধৈর্য হয়ে তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখন তাদেরকে তাদের স্ব-স্ব স্থানে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত ফোজায়েল এবনে ইয়াজ (রঃ) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! দোযখীদের হাত পা বেঁধে রাখা হবে, অগ্নিকুন্ড তাদেরকে উপরে

নিচে আনা নেয়া করবে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে শাস্তি প্রদানে নিয়োজিত থাকবে।

وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِى كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ○

"আর তাদেরকে বলা হবে, দোযখের আযাব ভোগ কর, তোমরা এ আযাবকে মিথ্যা-জ্ঞান করতে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত থাকতে। অতএব, সেই কুফরী ও নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই দোযখের শাস্তি ভোগ করতে থাক"।[১]

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "মোমেন" বলে হযরত আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ফাসেক বলে আকাবা এবনে আবি মুয়ীতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, উভয়ের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। আর মোমেন ও কাফেরের মধ্যে জীবন ধারা ও পরিণতির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে তা-ও ঘোষণা করা হয়েছে।[২]

আল্লাহ পাক আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর এরশাদ করেছেনঃ

اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (সূরা বাকারা)

"তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর"।

এরপর তাদেরকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে,

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّى هُدًى........ (সূরা বাকারা)

"যদি আমার নিকট থেকে কোন হেদায়েত আসে, যে কেউ ঐ হেদায়েত মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। আর যারা কাফের হবে এবং আমার আয়াত সমূকে মিথ্যা-জ্ঞান করবে তারাই হবে দোযখবাসী, চিরদিন তারা দোযখে থাকবে"।

এ ঘোষণার ভিত্তিতেই যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে নবী রসূলগণ আগমন করেছেন এবং নাজিল হয়েছে আসমানী গ্রন্থ সমূহ এবং তাঁরা সকলেই মানব জাতিকে হেদায়েত করার জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস পেয়েছেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, মানুষের প্রকৃত বাসস্থান হলো জান্নাত, আর দুনিয়া হলো জান্নাতে যাওয়ার পথ। মোমেনদের ঠিকানা হবে জান্নাতে। আর কাফেররা যেহেতু শেরক ও কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে তথা জান্নাতে প্রবেশে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, আর জান্নাতের বদলে দোযখকে গ্রহণ করেছে, তাই দোযখীরা যখন দোযখ থেকে বেরুতে চাইবে তখন তাদেরকে পুনরায় তাতে ঠেলে দেয়া হবে। আর তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবে, তোমরা যে দোযখের শাস্তিকে মিথ্যা-জ্ঞান

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৬৮
তফসীরে রুহুল মাআনী, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৩৩
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯২

করতে তা এখন ভোগ কর।[১]

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ
رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ
مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَ
جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا
بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(২১) আর আমি অবশ্যই তাদেরকে আখেরাতের মহা শাস্তির পূর্বে (এ পৃথিবীর) লঘু শাস্তি ভোগ করাবো যেন তারা (বিপদগ্রস্ত হয়ে কুফরী থেকে) ফিরে আসে।

(২২) আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে? যাকে তার প্রতিপালকের আয়াত সমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তবু সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। নিশ্চয় আমরা পাপীষ্ঠদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো।

(২৩) আর আমি মুসাকে কিতাব দান করেছিলাম, (হে রসূল!) আপনাকেও তেমনি কিতাব দেয়া হলো; অতএব আপনি (কিতাব প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে) কোন সন্দেহ করবেন না। আর আমি মুসাকে বণী ইসরাঈলের জন্যে পথ-প্রদর্শক করেছিলাম।

(২৪) আর আমি তাদের মধ্য হতেই (ধর্মীয়) নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক পথ-প্রদর্শন করতো; যখন তারা সবর অবলম্বন করেছিল এবং আমার আয়াত সমূহের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার প্রারম্ভে রেসালত, তওহীদ এবং কেয়ামতের দিনের পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮২

করা হয়েছে। আর সূরার পরিসামাপ্তিতে এসে এ আয়াত থেকে পুনরায় রেসালতের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ

দুনিয়াতে হবে লঘু শাস্তি

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং হাসান বসরীর (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের عذاب الادنى শব্দ দ্বারা দুনিয়ার বালা-মছিবত, রোগ-ব্যাধি এবং মহামারীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। আর একরামা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি সমূহ।

মোকাতেল (রঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা সে দুর্ভিক্ষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যাতে মক্কাবাসী চরম কষ্ট পেয়েছে, জঠর-জ্বালায় তারা মুর্দা এমনকি, কুকুর পর্যন্ত ভক্ষণ করেছে। এ দুর্ভিক্ষ সাত বছর অব্যাহত ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, বদরের দিন কাফেররা যে শাস্তি পেয়েছে এর দ্বারা তা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কাতাদা এবং সুদ্দী (রঃ)-ও একথা বলেছেন।

আয়াতের মর্মকথা

কাফের-মুশরেকদের কঠিন শাস্তি আখেরাতে অবশ্যই হবে কিন্তু মানুষ যেন গোমরাহী ছেড়ে হেদায়েতের দিকে ফিরে আসে সেজন্যে দুনিয়াতেও আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, প্লেগ-মহামারী প্রভৃতি। আর এসব শাস্তি এজন্যে দেয়া হয় যেন মানুষ সাবধান হয়, অন্যায়-অনাচার পরিহার করে, কুফর-শেরক বর্জন করে, তওহীদ ও রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করে।[১]

এবনে মরদবিয়া আবু ইদ্রিস আল-খাওলানী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে আমি হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন, আমি এ সম্পর্কে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেনঃ

الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ

অর্থাৎ লঘু শাস্তি হলো দুনিয়ার জীবনে বালা-মসিবত, মহামারী।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ হলো দুনিয়ার বালা-মসিবত আর এসব মসিবত এজন্যে দেয়া হয়, যেন মানুষ পাপাচার থেকে তওবা করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীর

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮২

ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে।

এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ এ হলো সে সব শাস্তি যা ইসলামী শরীয়ত বিভিন্ন অপরাধের জন্যে নির্দিষ্ট করেছে যাতে অপরাধীরা অন্যায়-অনাচার থেকে তওবা করে।

এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আযাবুল আদনা" শব্দ দ্বারা দুনিয়ার বালা-মসিবত এবং কবরের আযাবকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অন্য একটি সূত্রে মুজাহেদ (রঃ)-এর আরেকটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "আযাবুল আদনা" হলো হত্যা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দুর্ভিক্ষ।[১]

এসব শাস্তি শুধু এজন্যে দেয়া হয় যাতে করে পাপীষ্ঠরা পাপাচার থেকে বিরত হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা হয়না; তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ۝

"আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াত সমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তবু সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। আমি অবশ্য অবশ্যই পাপীষ্ঠদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো"।

যাদেরকে আল্লাহ পাকের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়া হয় কিন্তু তারা সে উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, নিঃসন্দেহে তারা মহা পাপী। এমন পাপীষ্ঠদের শাস্তি অবধারিত। নিশ্চয় এমন অপরাধীদের থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে পাপীষ্ঠদেরকে পৃথিবীতে লঘু শাস্তি দেয়া হবে কিন্তু এ লঘু শাস্তির পরও যদি তারা পাপাচার থেকে বিরত না হয় তবে তাদের শাস্তি হবে কঠিনতম, আর এ শাস্তি অবশ্যই হবে। এ শাস্তিকেই "প্রতিশোধ" বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মহা পাপীরা আল্লাহ পাকের আযাব এবং প্রতিশোধ থেকে কখনো রক্ষা পাবেনা। আর এ শাস্তিকেই পূর্ববর্তী আয়াতে العذاب الاكبر বা মহা শাস্তি বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের المجرمين শব্দটির অর্থ হলো পাপীষ্ঠরা। প্রশ্ন হলো মুজরেম বা পাপীষ্ঠ কাকে বলা হবে, এর জবাবে তফসীরকারগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ যে তিনটি কাজ করে সে মুজরেম বা পাপীষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় (এক) যে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৩-৯৪

ঘোষণা করে পতাকা উত্তোলন করে, (দুই) যে সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, (তিন) যে জালেমকে তার জুলুম করার ব্যাপারে সাহায্য করে। এরাই হলো মুজরেম বা পাপী।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে,

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ

"নিশ্চয় আমরা পাপীষ্ঠদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো"।[১]

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

"আর আমি মুসাকে কিতাব দান করেছিলাম, (হে রসূল!) আপনাকেও তেমনি কিতাব দেয়া হলো; অতএব আপনি (কিতাব প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে) কোন সন্দেহ করবেন না"।

যেভাবে মুসা (আঃ)-কে তৌরাত দান করা হয়েছে, তেমনি আর (হে রসূল)! আপনাকেও পবিত্র কোরআন দান করা হয়েছে। অতএব, পবিত্র কোরআনের অবতরণ নতুন কোন কথা নয়, ইতিপূর্বেও আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে।

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ

"অতএব, আপনি (কিতাব প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে) কোন সন্দেহ করবেন না"।

আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা

তফসীরকারগণ এ আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা করেছেনঃ

(১) যেভাবে মুসা (আঃ)-কে তৌরাতের ন্যায় মহান গ্রন্থ দান করেছি, ঠিক তেমনি (হে রসূল!) আপনাকে বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআন দান করেছি। অতএব, এ মহান গ্রন্থ লাভ করার ব্যাপারে আপনি কোন প্রকার সন্দেহ করবেন না এবং মুসা (আঃ)-কে তৌরাত দেয়ার ব্যাপারেও আপনি সন্দেহ করবেন না। এ ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহেদ (রঃ) এবং জুযাজ (রঃ)।[২]

তফসীরকারগণ বলেছেন, যদিও এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অন্যদেরকে এ সত্য সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ার কোন প্রশ্নই আসেনা।

(২) অথবা (হে রসূল!) মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে আপনার মোলাকাত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করবেন না, কেননা শবে মে'রাজে আসমানে এবং জমীনে উভয় স্থানে হযরত

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৬৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৪
২। তফসীরে কুরতবী, খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১০৮

মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হয়েছে, এটি ধ্রুব সত্য, আপনি মূসা (আঃ)-এর ন্যায় শুধু একজন নবীই নন; বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। যেভাবে মূসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে হেদায়েতের জন্যে অনেক ইমাম তৈরী হয়েছে, ঠিক তেমনি আপনারও রয়েছে খোলাফায়ে রাশেদ্বীন, আপনার পরে যাদের প্রতি হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।[১]

(৩) অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো, মূসা (আঃ) সন্তুষ্ট চিত্তে তৌরাত কবুল করেছিলেন, (হে রসূল!) আপনি এ সম্পর্কে সন্দেহ করবেন না। তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

(৪) তেবরানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না যে মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে হাযিরী দিয়েছিলেন।

(৫) কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে শবে মে'রাজে হযরত মুসা (আঃ)-এর সাক্ষাত হয়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শবে মে'রাজে আমি মূসা (আঃ)-কে দেখেছি। আমি ঈসা (আঃ)-কেও দেখেছি, তিনি লম্বাও নন, বেঁটেও নন, তার মাঝামাঝি, তার বর্ণ সাদায় লাল মিশ্রিত এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাকের বহু কুদরত তিনি দেখিয়েছেন, দোযখের দারোগা মালেককেও দেখেছি এবং দজ্জালকেও দেখেছি। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সফর-সঙ্গী ছিলাম। ভ্রমণের সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কোন্ স্থান'? সাহাবাগণ আরজ করলেন, 'এটি হলো ওয়াদী আযরাক'। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে এসে গেছে যখন আমি শবে মে'রাজে এ স্থানটি অতিক্রম করেছিলাম। তখন মূসা (আঃ) আমার সম্মুখে কানে আঙ্গুল দিয়ে 'লাব্বাইক' বলছিলেন এবং আল্লাহকে ডাকছিলেন'। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমরা যেতে যেতে আকেটি টিলার কাছে পৌছলাম। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কোন্ স্থান?" সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'এর নাম হলো 'মারশা'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে যখন আমি এ স্থান অতিক্রম করছিলাম তখন এখানে দেখেছিলাম ইউনুস (আঃ)-কে। তিনি লাল বর্ণের উটের উপর আরোহী ছিলেন। চৌগা পরিহিত ছিলেন। উটের রশি ধরে তিনি 'লাব্বাইক' বলছিলেন'। (মুসলিম শরীফ)

---

[১] তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লাহ ইদ্রীস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৫৪

এই হাদীসে দুনিয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-কে দেখার উল্লেখ রয়েছে যার ওয়াদা আলোচ্য আয়াতে করা হয়েছে।

সূরা বণী ইসরাঈলের তফসীরে শবে মে'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা (আঃ)-কে ষষ্ঠ আসমানে দেখেছেন এবং নামাজের সংখ্যা কম করাবার ব্যাপারে হযরত মুসা (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (শবে মে'রাজে) যখন আমাকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি (পথিমধ্যে) মূসা (আঃ)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর কবরে নামাজ আদায় করছেন।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শবে মে'রাজে যাওয়ার সময় মূসা (আঃ)-কে আলমে বরবখে নামাজরত অবস্থায় দেখেছেন এবং প্রত্যাবর্তন কালে ষষ্ঠ আসমানে তাঁর সাথে মোলাকাত হয়। এ হলো আলোচ্য আয়াতাংশ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ (অতএব আপনি মূসার (আঃ) সঙ্গে মোলাকাতের ব্যাপারে সন্দেহে থাকবেন না) এর একটি ব্যাখ্যা।[১]

وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ

"আর আমি মুসাকে বণী ইসরাঈলের জন্যে পথ-প্রদর্শক করেছিলাম"।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

তেবরাণী হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনিও এ ব্যাখ্যাই করেছেন। অবশ্য কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে جعلنه এর সর্বনামটি দ্বারা 'কিতাব' উদ্দেশ্য করা হলে আয়াতাংশের অর্থ হবে— "আমি মুসার প্রতি যে কিতাব নাজিল করেছি তাকে বণী ইসরাঈলের জন্যে পথ প্রদর্শক বানিয়েছি"।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ

"আর আমি তাদের মধ্য হতেই (ধর্মীয়) নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে পথ-প্রদর্শন করতো, যখন তারা সবর অবলম্বন করেছিল"।

وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ○

"আর তারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল ।

এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বণী ইসরাঈলে যারা গুণী-জ্ঞানী এবং নেককার

---

১ ...সীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮৩-৮৪
...ফসীরে আদদুররুল মানছুর, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৪
৩ ...ফসীরে রূহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৩৭-৩৮

ছিলেন আল্লাহ পাক তাদেরকে (ধর্মীয়) নেতা বা অধিনায়ক হিসাবে মনোনীত করেছিলেন, যারা আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক মানুষকে হেদায়েত করতেন।

আলোচ্য আয়াতের أئمة শব্দটির দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১. এর দ্বারা নবীগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, দু' হাজার বছরে বণী ইসরাঈলে চার হাজার আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমন হয়েছে। তাঁরা বণী ইসরাঈলের হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

২. ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে নবীগণের অনুসারীদেরকে যারা বণী ইসরাঈলের মধ্যে গুণী-জ্ঞানী, যোগ্যতাসম্পন্ন, নেককার ও পরহেযগার লোক ছিলেন, তাদেরকে নেতা হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। তারা মানুষের হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লাহ পাকের হুকুমে বা তাঁর তওফিকে তাঁরা এ কাজ করতেন। এটি ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য যে তাঁরা আল্লাহ পাকের হুকুমের তাবেদার ছিলেন। এজন্যে মানুষ তাঁদের অনুসারী হতো। তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো "সবর" বা ধৈর্য ও সহনশীলতা। কেননা, সত্য-সাধনায় বাধা-বিপত্তি আসে। ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমেই তার মোকাবেলা করতে হয়। এ গুণ তাদের মধ্যে ছিল। বিশেষতঃ মিশরে অবস্থানকালে ফেরআউনের তরফ থেকে বণী ইসরাঈলের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করা হয় এবং তাদেরকে সেই কঠিন দিনগুলোতে সবর অবলম্বন করতে হয়, চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয় এবং এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান, অটুট বিশ্বাস একান্ত জরুরী। এ গুণটিও তাদের মধ্যে ছিল।

পূর্ণ বিশ্বাস এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং নেতৃত্ব লাভ করার জন্যে দু'টি পূর্বশর্ত অবশ্যই আছে ১. আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ একীন-অটুট বিশ্বাস এবং অবিচল আস্থা ২. 'সবর' বা ধৈর্য ও সহনশীলতা। এ দু'টি গুণ অর্জনের মাধ্যমেই সাহাবায়ে কেরাম সমগ্র বিশ্বের এক বিরাট অংশে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের বরকতে তাঁরা যে ঈমানী শক্তি লাভ করেছিলেন এবং সবর বা ধৈর্য সহনশীলতার গুণ অর্জন করেছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে মাত্র বারো বছরের ব্যবধানে পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্য তাঁদের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। আজো যদি মুসলিম জাতি এমনি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হয়, তবে বিশ্বের নেতৃত্ব ইনশাআল্লাহ মুসলমানদের হাতে আসবে, এতে কোন সন্দেহের কারণ নেই।

اج بھی ھو جو ابراھیم کا ایمان پیدا

اگ کرسکتی ھے انداز گلستان پیدا

"আজও যদি কেউ ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় ঈমান অর্জন করে তবে অবশ্যই অগ্নিকুণ্ড

ফুলের বাগানে পরিণত হতে বাধ্য"।

سبق پڑہ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
لیا جائیگا تجہ سے کام دنیا کی امامت کا

"তুমি আবার শিক্ষা কর সততা, সুবিচার এবং বীরত্বের পাঠ, তাহলে বিশ্বের নেতৃত্ব অবশ্যই তোমাদের হাতে আসবে"।

আয়াতের মর্মকথা

যেহেতু হযরত মূসা (আঃ)-কে দ্বীন ইসলামের তবলীগে চরম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, আর মক্কায়ে মোয়াজ্জামায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও সুদীর্ঘ তেরটি বছর অকথ্য নির্যাতন-উৎপীড়ন সইতে হয়েছে। তাই এ আয়াতে মূসা (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠায় আজ আপনাকে যে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হচ্ছে, ইতিপূর্বে মূসা (আঃ)-কেও এমনি বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং সবর অবলম্বন করতে হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে যারা পূর্ণ একীন এবং সবরের গুণ অর্জন করেছিল তাদেরকে বণী ইসরাঈলের নেতৃত্ব দান করা হয়েছিল। ঠিক এমনিভাবে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যেও যারা এসব গুণ অর্জন করবে আল্লাহ পাক তাদেরকেও এ উম্মতের নেতৃত্ব দান করবেন।[১]

মুর্শেদে কামেলের বৈশিষ্ট্য

এ প্রসঙ্গে হযরত থানবী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে মুর্শেদে কামেলের গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি একীনে কামেল এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি অবিচল আস্থা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ মুর্শেদে কামেলের মধ্যে থাকা একান্ত জরুরী। এতদ্ব্যতীত, মুর্শেদে কামেল হওয়া সম্ভবই নয়। তিনি আরও বলেছেন, যখন কোন মুরীদের মধ্যে এবাদত, রেয়াযত, একীন, সাধনা ও তাতে ধৈর্য ও সহনশীলতা লক্ষ্য করা যায় তখন তাকে খেলাফত দেয়া যায়।[২]

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৩৮
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৮১

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝٢٥ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ
كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسٰكِنِهِمْ
إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۝٢٦ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ
الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝٢٧ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ
هٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ ۝٢٨ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝٢٩ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۝٣٠

তরজমা

(২৫) (হে রসূল!) তারা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করছে আপনার প্রতিপালকই সে সম্পর্কে কেয়ামতের দিন ফয়সালা করে দেবেন।

(২৬) তারা কি এর দ্বারাও পথ-নির্দেশ পেলোনা যে আমি তাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি, যাদের বাসভূমিতে তারা চলাফেরা করছে। নিশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন, তবু কি তারা শুনতে পায় না?

(২৭) তারা কি লক্ষ্য করেনা যে আমি ঊষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি, এরপর তা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করি যা তাদের চতুঃষ্পদ জন্তুরা এবং তারা নিজেরা আহার করে থাকে, তবু কি তারা দেখতে পায় না?

(২৮) আর এ কাফেররা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল, কখন হবে এই ফয়সালা?

(২৯) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, ফয়সালার দিন কাফেরদের ঈমান আনয়ন তাদের জন্যে উপকারী হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

(৩০) অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদের কথা উপেক্ষা করুন এবং (সেই ফয়সালার) অপেক্ষা করতে থাকুন, তারাও রয়েছে অপেক্ষায়।

তফসীরুল কোরআন

কেয়ামতের দিন হবে ফয়সালা

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"(হে রসূল!) তারা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করছে, আপনার প্রতিপালক সে সম্পর্কে কেয়ামতের দিন ফয়সালা করে দেবেন"।

আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক মোমেন ও কাফেরদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন, কারা দুনিয়াতে হক্বপন্থী ছিল আর কারা বাতিলপন্থী, ফয়সালা তো হয়ে আছে যে ইসলাম হক্ব আর কুফর বাতিল, তবে কেয়ামতের দিন সে ফয়সালা কার্যকর হবে। হক্বের সত্যতা এবং বাতিলের বাতুলতা সেদিন প্রকাশ পাবে, যখন ঈমানদারগণ জান্নাতে যাবে, আর কাফেরদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে তখনই সত্য উদ্ভাসিত হবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আলোচ্য আয়াতে যে ফয়সালার কথা বলা হয়েছে তা হলো, বণী ইসরাঈলের পরস্পরের মধ্যে যে মতানৈক্য ছিল, তাদের মধ্যে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন ফয়সালা করবেন। যেমন কোরআনে করীমেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ

"আর ইহুদীরা বলে খৃষ্টানদের ধর্ম কিছুই না, আর খৃষ্টানরা বলে ইহুদী ধর্ম কিছুই না, অথচ তারা আসমানী গ্রন্থ পাঠ করে"।

তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে তাদের এ মতবিরোধ সম্পর্কে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ফয়সালা দেবেন। অথবা এর অর্থ হলো, কাফেররা মোমেনদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতো, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এর ফয়সালা করবেন, অর্থাৎ মোমেনদেরকে জান্নাতের চির সুখ এবং শান্তি লাভের সুযোগ দান করবেন, আর কাফেরদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দেবেন, যা হবে চিরস্থায়ী।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ফয়সালার কথা বলা হয়েছে তা হলো, আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের মনোনীত নেতাদের মধ্যে। অথবা এ ফয়সালা হবে হক্ব ও বাতিলের মধ্যে, অর্থাৎ কেয়ামতের দিন হক্ব ও বাতিলের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা কার্যতঃ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে।

মূলতঃ সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত হক্ব ও বাতিল তথা সত্য-অসত্যের মধ্যে

১। তানবিরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৪৭

দ্বন্দ্ব বিরাজমান রয়েছে, এ দ্বন্দ্ব কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। একদল লোক হক্বের অনুসারী থাকবেই। পক্ষান্তরে অন্য একদল লোক বাতিলপন্থী হবেই। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এদের মধ্যেই ফয়সালা করে দেবেন, হক্বের সমর্থকদের জান্নাতে এবং বাতিল-পন্থীদেরকে দোযখে প্রেরণের মাধ্যমে এ বিষয়ের মীমাংসা করা হবে।[১]

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ

"তারা কি এর দ্বারাও পথ-নির্দেশ পেলোনা যে আমি তাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি, যাদের বাসস্থানে তারা চলাফেরা করে"।

এ পৃথিবীতে মানুষ অনেক কিছু দেখে শেখে, আবার অনেক কিছু মানুষ শুনেও শেখে। যারা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে ছিল, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়েছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তাদেরকে আখেরাতে অবশ্যই শাস্তি দেবেন। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক দুনিয়াতেও শাস্তি দিয়ে থাকেন, যাতে করে এসব শাস্তি দেখে অন্য মানুষ শিখতে পারে এবং আত্ম-সংশোধনে সচেষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদ ও সামুদ জাতির কথা বলা যেতে পারে। মক্কাবাসী তাদের সিরিয়া সফরের সময় আদ ও সামুদ জাতির এলাকা অতিক্রম করে যেত। আল্লাহ পাকের নাফরমানীর পরিণাম কত ভয়াবহ হয় তা তাদেরকে দেখলেই অনুমান করা যায়। আদ ও সামুদ জাতির নাফরমানী এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখলে সতর্কতা অবলম্বন ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকেনা। তাদের আকাশচুম্বী ইমারতগুলো এখন আর নেই, এগুলোর কারণেই তারা অহংকার করতো, অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হত।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

"নিশ্চয় এতে রয়েছে বহু জীবন্ত নিদর্শন"।

আদ ও সামুদ জাতির ভাগ্য বিপর্যয় হলো, এ নিদর্শন দেখে শিক্ষা গ্রহণ করাই হলো কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য।

أَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ۝

"তবু কি তারা শুনতে পায় না"?

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, ইতিপূর্বে যারা পৃথিবীতে ছিল এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়েছে, অবশেষে আল্লাহ পাক তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, তারাই আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নবী রসূলগণকে মিথ্যা-জ্ঞান করেছে, সবশেষে তাদের উপর নেমে এসেছে আল্লাহর গজব এবং তাদেরকে চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে, তাদের বাড়ী-ঘরের ধ্বংসাবশেষ আজো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে শিক্ষনীয় হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। আজ যারা তাদের বাড়ী-ঘরে আবাদ হয়েছে, তারা পূর্ববর্তী লোকদের

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৩৮-৩৯

ধ্বংসাবশেষ দেখে উপদেশ গ্রহণ করেনা। এসব ঘটনা কি তারা শুনতে পায়না? আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করার, তাঁদের শানে বেআদবী করার পরিণাম কত ভয়াবহ হয় তা কি তারা দেখতে পায়না?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

"তারা কি লক্ষ্য করেনা যে আমি ঊষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি, এরপর তা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করি যা তাদের চতুঃস্পদ জন্তুরা এবং তারা নিজেরা আহার করে থাকে, তবু কি তারা দেখতে পায় না"?

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে জীবন-শ্যামলীমার কথা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জীবন ও মৃত্যু, লাভ ও ক্ষতি সবই আল্লাহ পাকের হাতে। মৃত শুষ্ক জমিনকে জীবন্ত করে তোলা আল্লাহ পাকের মর্জির ব্যাপার, কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তারা কি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের জীবন্ত নমুনা সমূহ দেখেনা? তিনি ঊষর মরুভূমিতে পানি বর্ষণ করেন এবং তাকে শস্য-শ্যামলীমায় পরিপূর্ণ করে দেন। হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! লক্ষ্য কর, বন্ধ চক্ষু উন্মীলিত কর, শুস্ক মৃত জমিন থেকে আল্লাহ পাক যে শস্য উৎপাদন করেন তা তোমরা আহার কর, তোমাদের চতুঃস্পদ জন্তুর জন্যে তা থেকে আহার্য সংগ্রহ কর। তবু কি তোমরা সত্য গ্রহণ করবেনা? আল্লাহ পাকের কুদরতের স্বাক্ষী দেখবেনা? যিনি ঊষর মরুভূমিতে তরুলতা উৎপাদন করেন, তিনি কি মানুষের মরু হৃদয়কে তৃষ্ণার্ত এবং অতৃপ্ত করে রাখবেন? তা তো নয়; বরং যারা খোশনসীব, যারা ভাগ্যবান, তারা করুণাময় আল্লাহ পাকের স্মরণে তাঁর আদেশ পালনে এবং তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে শান্তি লাভ করে। তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"মনে রেখো, আল্লাহ পাকের স্মরণেই অন্তর সমূহ শান্তি লাভ করে"।

এখানে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেকেরই কর্তব্য হলো তাঁর দরবারে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করা, তাঁর প্রতি আজীবন শোকর গুজার থাকা এবং তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত সমূহকে তাঁরই বিধান মোতাবেক ব্যবহার করা। আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামতকে তাঁর নাফরমানীর কাজে ব্যবহার না করা। দান পেয়ে মুগ্ধ হয়ে দাতাকে ভুলে যাওয়া ভদ্রতা নয়, মানবতা নয়, অন্যায় এবং অমানবিক।

এখানে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, যেভাবে আল্লাহ পাক শুস্ক মৃত জমিনে কয়েক ফোঁটা পানি ফেলে তাতে জীবন সঞ্চার করে থাকেন, ঠিক তেমনি মানুষের মৃত্যুর

পরও পুনরায় তিনি মানুষকে পুনর্জীবিত করবেন। কিন্তু কাফেররা একথায় বিশ্বাস করেনা, তারা আপত্তিকর মন্তব্য করে-

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ○

"আর এ কাফেররা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল, কখন হবে এই ফয়সালা"?

অর্থাৎ মক্কার কাফেররা মুসলমানদের প্রতি বিদ্রুপ করে বলতো, 'তোমাদের বিজয় কবে হবে যদি বিজয়ের ব্যাপারে সত্যবাদী হও তবে তারিখ দাও'।

শানে নজুল

এবনে জরীর কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম মুশরেকদেরকে বলতেন, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দুঃখের দিন বদলে যাবে, আমাদের বিজয় আসবে, আল্লাহ্ পাক আমাদের এবং তোমাদের মাঝে অচিরেই ফয়সালা করে দেবেন।

তফসীরতার কালবী (রঃ) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম মনে করতেন এর দ্বারা মক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ)-এর মতে, এর দ্বারা বদরের যুদ্ধ উদ্দেশ্য।

আর আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা কেয়ামতের দিনের ফয়সালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যাহোক, সাহাবায়ে কেরাম মনে করতেন, আল্লাহ্ পাক আমাদের সাহায্যকারী, তিনি তোমাদের উপর আমাদেরকে বিজয়ী করবেন। কাফেররা বিদ্রুপ করে বলতো,

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ○

"তারা একথা বলতো, কবে হবে তোমাদের বিজয় যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও"।

আল্লাহ্ পাক এর জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ

"(হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন, যারা সারা জীবন কুফরী করেছে, বিজয়ের দিন যদি তারা ঈমান আনয়ন করেও তবে তা তাদের জন্য উপকারী হবেনা"।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে আলোচ্য আয়াতে يوم الفتح (বিজয়ের দিন) দ্বারা কেয়ামতের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা কেয়ামতের দিন কাফেরদের ঈমান আনয়ন উপকারী হবে না। যে সব তত্ত্বজ্ঞানী এর দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিন মনে করেন তারা এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, কাফের অবস্থায় যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের সম্মুখে যখন

আজাব এসেছে তখন তাদের ঈমান আনয়ন তাদের জন্যে কোন উপকারী হবে না।

وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

"আর তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না"।

এ পর্যায়ে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল- 'কবে আসবে বিজয়ের দিন'? আর জবাব দেয়া হয়েছে, সেদিন কাফেরদের ঈমান আনয়ন উপকারী হবে না। এমনি জবাব দেয়ার কারণ এই, কাফেরদের প্রশ্ন জ্ঞান অর্জনের খাতিরে ছিল না, ছিল উপহাস করার জন্যে। কারণ তারা তো কেয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাসই রাখেনা। তাই এ জবাব হয়েছে তাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য মোতাবেক। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন কেয়ামতের দিন অবশ্যই আসবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কেয়ামতের দিন শুধু ধ্রুব সত্যই নয়; বরং অপ্রতিরোধ্য। অতএব, তোমাদের ব্যস্ত হলে চলবে না; বরং চিন্তা কর সেদিন তোমাদের অবস্থা কী হবে। সেদিন কোন কাফের ঈমান আনলেও তা তার জন্যে উপকারী হবে না। তোমরা আজ উপহাস করছো, সেদিন যদি অবকাশ চাও তবে তা-ও দেয়া হবে না।

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

(হে রসূল!) এ কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে আপনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাদের হেদায়েত লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব, তাদের চিন্তা বাদ দিন। তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং দ্বীন ইসলামের প্রচারে আপনার কর্তব্য পালন করতে থাকুন।

وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ○

অর্থাৎ আপনি সেই বিজয়ের দিনের অপেক্ষা করুন যেদিনের ওয়াদা আমি করেছি। আর তারাও অপেক্ষা করছে যেন আপনি বিপদগ্রস্ত হন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো, তাদের প্রতি আমার যে আজাব আসবে আপনি তার অপেক্ষা করুন। আর তারাও ঐ আজাবেরই অপেক্ষা করছে।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি অপেক্ষা করুন, তাদের ভয়াবহ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তারাও নিজেদের ধারণা মোতাবেক চরম ধ্বংসেরই প্রতীক্ষা করছে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামকে বলতো, 'আপনারা যে বলেন একদিন আপনাদের বিজয় অবশ্যই হবে, সে বিজয় কবে আসবে'? তারই জবাবে আল্লাহ পাক এ আয়াত এরশাদ করেছেন, বিজয় অবশ্যই আসবে। আর যদি সেদিন তোমরা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮২
তফসীরে রূহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৪০৪১

ঈমান আনয়নও কর তবে তা তোমাদের জন্যে উপকারী হবে না। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন, এ কাফেরদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তাদের পরিণতির অপেক্ষা করতে থাকুন, তারাও তাদের সর্বনাশের অপেক্ষা করছে।[১]

"তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা"-একথার তাৎপর্য হলো কাফেরদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করে ঈমান ও নেক আমলের সুযোগ দেয়া হবেনা।[২]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২৪শে নভেম্বর ১৯৯৪ মোতাবেক ২০শে জমদিউস সানী ১৪১৫ হিজরী, রোজ বৃহঃস্পতিবার বেলা ২-০০ টায় সূরা সজদার তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর আমাদের এ সাধনা এবং তোমার বিশেষ রহমতে তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর, আমীন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১ পৃষ্ঠা-৭১-৭২
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৩৯

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরা আহযাব

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ
وَكِيْلًا ﴿۳﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ
اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ
اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيْلَ ﴿۴﴾

তরজমা

(১) হে নবী! আল্লাহ পাককে ভয় করুন এবং কাফের ও মুনাফেকদের কথা মানবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ, তিনি মহাজ্ঞানী।

(২) আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপনার নিকট যে প্রত্যাদেশ আসে তা মেনে চলুন, তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিশ্চয় অবগত রয়েছেন।

(৩) আর (হে রসূল!) আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন, কার্যসিদ্ধির জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

(৪) কোন মানুষের মধ্যেই আল্লাহ পাক দু'টি হৃদয় রাখেননি, আর তোমাদের স্ত্রীগণ

যাদেরকে তোমরা (জিহার করে) মা বলে বসেছ, সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জননী করেননি, আর তোমাদের পালক পুত্রকেও যাদেরকে তোমরা পুত্র বল, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি, এসব হলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র, আল্লাহ্ পাক সত্য কথাই বলেন, আর তিনিই সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

সূরা আহ্যাব প্রসঙ্গে

এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ, ৯ রুকু বিশিষ্ট এ সূরায় ৭৩ আয়াত, ১,২৮২ বাক্য এবং ৫,৭০০ অক্ষর রয়েছে।

বায়হাকী দালায়েলে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আহযাব মদীনা মুনাওয়্যারায় নাজিল হয়েছে। এবনে মরদবিয়া এবনুজ জোবায়ের থেকে অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

নামকরণ

'আহযাব' শব্দটি 'হিযবুন' এর বহুবচন, এর অর্থ হলো জামাআত বা দল। যেহেতু কাফেররা পঞ্চম হিজরীতে যুক্তফ্রন্ট করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছিল, আর এ সূরায় ঐ যুদ্ধের কথা আলোচিত হয়েছে, এজন্যে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরাতুল আহযাব'। আল্লাহ্ পাক এ জেহাদে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বাতাস এবং ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন। এ জেহাদের আরেকটি নাম হলো 'খন্দক', অর্থাৎ পরীখা, কেননা মদীনা মুনাওয়্যারায় প্রবেশের সমতল পথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরীখা খনন করেছিলেন। এভাবে মুসলমানগণ হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করেন।

মদীনা মুনাওয়্যারায় অবতীর্ণ ৭৩ আয়াতের এ সূরাতে আল্লাহ্ পাক সত্য-সাধক ও নেককারদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, আর মুনাফেকদের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হানাদার দুশমনদের আক্রমণের প্রতি আপনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না এবং এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন।

এ সূরা পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তি স্বরূপ, পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারের উপর সবর অবলম্বনের নির্দেশ ছিল এবং মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছিল। তখন কাফের মুনাফেকরা বলেছিল, এ বিজয় কবে আসবে? আল্লাহ্ পাক সংক্ষিপ্তভাবে তার জবাব দিয়েছিলেন। আর এ সূরায় আল্লাহ্ পাক আহযাবের যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন যাতে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়েছিল, আর তা হয়েছিল প্রকাশ্য উপকরণ ব্যতীত-এক আল্লাহ্ পাকের বিশেষ সাহায্যে। আর এ সাহায্য ছিল

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৪২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৫

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা, যা তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতের দলিল ছিল।

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিজয় এবং সাহায্য লাভের পূর্বশর্ত ছিল যেমন–

(১) তাকওয়া পরহেযগারীর গুণ অর্জন করা,

(২) সবর অবলম্বন করা,

(৩) আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা,

(৪) আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে ভয় না করা,

(৫) আর অন্য কোন কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা।

(৬) আর শুধু আল্লাহ পাকের প্রত্যাদেশের অনুসরণ করা। কাফের মুনাফেকদের কথা না মানা। কেননা কাফের মুনাফেকদের পরামর্শ মেনে চলা ভয়ংকর বিপদের কারণ হতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শুরু এবং শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত ও নবুওয়্যতের বর্ণনা রয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরার প্রারম্ভে এবং পরিসমাপ্তিতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত ও নবুওয়্যতের প্রমাণ এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে কষ্ট দেবে সে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে অভিশপ্ত এবং কোপগ্রস্ত হবে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়, পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে কাফেরদেরকে দুনিয়ার আযাব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এ সূরায় আহযাবের যুদ্ধে তাদের যে শাস্তি হয়েছিল তার বিবরণ রয়েছে।[১]

এ সূরার ফজিলত

যে ব্যক্তি সর্বদা এ সূরা পাঠ করবে ফেরেশতাদের মাঝে তাঁর উপাধি হবে শাকুর অর্থাৎ অনেক বেশী কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

শানে নজুল

জোবায়ের যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কাবাসী কিছু লোক ওলীদ এবনে মুগীরা, শায়বা গং হুজুর সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দালভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬২

আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ প্রস্তাব পেশ করে যে, আপনি এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের যে আহবান জানাচ্ছেন তা বর্জন করুন, তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের অর্থ-সম্পদের একটা বিরাট অংশ দিয়ে দেব। আর মদীনায়ে মুনাওয়্যারায় মুনাফেক এবং ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই বলে সতর্ক করে, যদি আপনি ইসলামের দাওয়াত থেকে বিরত না হন তবে আমরা আপনাকে হত্যা করবো। তখন এ আয়াত সমূহ নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আবু সুফিয়ান এবনে হারব, একরামা এবনে আবু জেহেল, আবুল আওয়ার এবনে সুফিয়ান সালমী সম্পর্কে। ওহোদের যুদ্ধের পর এ তিন ব্যক্তি মদীনা শরীফে এসে মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাইয়ের নিকট অবস্থান করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোকাবেলার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দান করেন। তখন তারা আবদুল্লাহ এবনে উবাই, সা'দ এবং তো'মা এবনে আবিরোক সহ তাঁর খেদমতে হাযির হয় এবং এই আবেদন করে যে আপনি আমাদের লাত, ওজ্জা এবং মানাত নামক দেব-দেবীর সমালোচনা পরিত্যাগ করুন, কেননা এগুলো আমাদের উপাস্য এবং একথা বলুন, যারা এসব মূর্তির পূর্জা করবে তারা তাদের সুপারিশ করবে, যদি আপনি তা করেন তবে আমরাও আপনার প্রতিপালকের সমালোচনা পরিত্যাগ করবো, আর আপনার কাজে আমরা কোন বাধা সৃষ্টি করবো না। তাদের এসব কথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ছিল। তাই হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দান করুন, আমি এদেরকে হত্যা করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি তাদেরকে তাদের প্রাণের নিরাপত্তা দিয়েছি। এরপর তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, তোমরা বেরিয়ে যাও, তোমাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত এবং গজব। এরপর হুজুর সালাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে বহিস্কার করা হয়, তখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এ আয়াত সমূহ নাজিল হয়।[১]

তফসীরুল কোরআন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ

হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন, আর কাফের ও মুনাফেকদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, আর তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর হেকমত মোতাবেকই তিনি আদেশ জারি করেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদিও আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮৮
তফসীরে কুরতবী, খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১১৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দালভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬২

আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কিন্তু উদ্দেশ্য হলো উম্মতকে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো হে নবী! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন, আর আপনি মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বিনষ্ট করবেন না। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা তাকওয়া-পরহেযগারীর উপর কায়েম থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ কখনো কখনো সতর্কবাণীকে অত্যন্ত কঠোর করার জন্যে যারা মর্যাদায় বড় তাদেরকে তাগিদ করা হয়, যাতে করে যারা ছোট তারা আপনা আপনিই সতর্ক হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এরপর এ নির্দেশ উম্মতের জন্যে কত বেশী প্রযোজ্য হবে তা সহজেই অনুমেয়। আলোচ্য আয়াতে কাফের মুনাফেকদের কথা শ্রবণ না করার এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ না করার নির্দেশ রয়েছে, কেননা তাদের কথায় ষড়যন্ত্র নিহিত রয়েছে। প্রকাশ্যে তাদের কথা সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর হলেও এদের চক্রান্ত অত্যন্ত মারাত্মক। অতএব, (হে রসূল!) তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন না।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তার মর্মার্থ হলো, হে নবী! আপনি তাকওয়া পরহেযগারীর উপর কায়েম থাকুন, কাফের মুনাফেকদের কোন কথাই আপনি মানবেন না, তারা হলো ইসলামের শত্রু, তারা আপনাকে প্রতারণা করতে চায়, আর তাদের হুমকি-ধমকির প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করবেন না, আল্লাহ পাক আপনাকে গায়বী মদদ পৌছাবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আপনার নিকট যে পথ-নির্দেশ আসে, আপনি তার উপর আমল করুন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَّاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

"আর (হে রসূল!) আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে যে প্রত্যাদেশ আসে, আপনি তাই মেনে চলুন"।

অর্থাৎ আপনি তওহীদের উপর কায়েম থাকুন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের যে নির্দেশ রয়েছে, এ আয়াত দ্বারা পুনরায় তার তাগিদ করা হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা২১, পৃষ্ঠা-৭৩
আল বাহরুল মুহিত, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১০

নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অতীতে যা কিছু হয়েছে, বর্তমান যা কিছু হচ্ছে, আর ভবিষ্যতে যা কিছু হবে সব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি মানুষের মনের গোপন ও প্রকাশ্য সব কথাই জানেন। অতএব, এক আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকুন, আর যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, দুশমন তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনা। কাফের মুনাফেকরা ছলে-বলে কৌশলে আপনাকে ফাঁদে ফেলতে চায়, আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না, শুধু আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেকই আপনি চলতে থাকুন, এ অবস্থায় যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, পরিস্থিতি যত জটিলই হোক না কেন, আপনি আপনার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে থাকুন।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

"আর এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখুন"।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

"আর কার্যসিদ্ধির জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট"।

তিনিই সর্বশক্তিমান, তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, তাঁর রহমত অনন্ত অসীম, অতএব সব বিষয়ে তাঁর প্রতিই নির্ভর করুন, অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করার কোন প্রয়োজনই নেই।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ

"কোন পুরুষের মধ্যেই আল্লাহ পাক দু'টি হৃদয় রাখেননি"।

শানে নজুল

বগভী এবং এবনে আবি হাতেম সুদ্দী এবং এবনে নাজীহ (রঃ)-এর সূত্রে মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তদানীন্তন কালে আরবে আবু মা'মার জামীল এবনে মা'মার ফাহরী নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ধী-শক্তির অধিকারী। স্মরণশক্তি তার এমনি প্রবল ছিল যে কোন কিছু একবার শ্রবণ করা মাত্রই তার কণ্ঠস্ত হয়ে যেত। কোরায়েশরা বলতো, আবু মা'মারের এমনি স্মরণ শক্তি হওয়ার কারণ হলো, তার দু'টি হৃদয় রয়েছে। সে নিজেও বলতো, 'আমার দু'টি হৃদয় রয়েছে। মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যা কিছু বোঝেন তার চেয়ে বেশী আমার এক হৃদয়েই রয়েছে। আমি এক হৃদয় দ্বারা তাঁর চেয়ে বেশী জানি এবং বুঝি (নাউজুবিল্লাহে মিন জালেক)"। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

বদরের যুদ্ধের দিন কোরায়েশ যখন পরাজিত হয়, আবু মা'মার পলায়ন করে তখন একটি জুতো তার পায়ে ছিল আর দ্বিতীয় জুতোটি তার হাতে ছিল, এ অবস্থায় আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'হে আবু মা'মার! মানুষের অবস্থা কি'? আবু মা'মার

বললো, 'আর অবস্থা কি! পরাজিত হয়ে গিয়েছি'।

আবু সুফিয়ান বললো, 'তোমার অবস্থা কি? একটি জুতো পায়ে আর আরেকটি জুতো হাতে'?

আবু মা'মার বললো, 'আমি তো মনে করেছিলাম, দু'টি জুতোই আমার পায়ে আছে'।

তখন থেকে লোকেরা বুঝতে পারলো যে তার হৃদয় একটিই আছে, দু'টি নয়। যদি তার দু'টি হৃদয়ই থাকতো তবে সে হাতের জুতোর কথা ভুলো যেত না।

এবনে আবি হাতেম সাঈদ এবনে জুবায়ের (রঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং একরামা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তদানীন্তন কালে আরবে এক ব্যক্তি ছিল যাকে লোকেরা দু' হৃদয় বিশিষ্ট বলতো। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

এবনে জরীর উফী (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর, কাতাদা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ঐ বর্ণনায় এতটুকু বাড়তি রয়েছে যে সে বলতো, 'আমার এক হৃদয় আমাকে কোন আদেশ দেয় আর এক হৃদয় আমাকে বাধা দেয়'।

ইমাম তিরমিজী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁর অন্তরে কোন বিষয়ে আশংকা হয়েছে। যে মুনাফেকটি তখন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিল সে বলতে লাগলো যে দেখ এ ব্যক্তির দু'টি হৃদয় রয়েছে। একটি তোমাদের সাথে আরেকটি তাঁর বন্ধুদের সাথে রয়েছে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

জহুরী এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা দু' হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে 'জেহার' করেছে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মা বলে ডেকেছে)। আর ঐ ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে অন্যের সন্তান-সন্ততিকে নিজের সন্তান-সন্ততি বানিয়ে নেয়। এক হৃদয় দিয়ে কখনও ঐ মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে আর দ্বিতীয় হৃদয় দিয়ে তাকে মা বলে। এমনিভাবে এক হৃদয় দিয়ে সে কোন ছেলেকে তাঁর নিজের পুত্র বলে আর একথা ভালভাবে জানে যে সে তার পুত্র নয়; বরং অন্যের পুত্র।

মূলতঃ উদ্দেশ্য হলো, কোন মানুষের যেমন দু'টি হৃদয় হতে পারেনা, ঠিক তেমনি জেহারকারী ব্যক্তির স্ত্রী তার মা হতে পারে না, আর এমনিভাবে কাউকে পুত্র বলে ডাকলেই সে প্রকৃত পুত্র হয় না।[১]

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّٰٓئِي تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ

"আর তোমাদের সে সব স্ত্রীদেরকেও যাদেরকে তোমরা মা বলে বসেছো তোমাদের

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮৮
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৫০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৬

সত্যিকার জননী করেননি"।

বর্বরতার যুগে কতকগুলো কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, যা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং অসুন্দর যেমন, কোন বুদ্ধিমান লোককে বলা হতো, তার হৃদয় দু'টি, এজন্যে সে এমন বুদ্ধিমান। পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআন তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেছে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ্ পাক কোন লোকের মাঝে দু'টি হৃদয় রাখেননি, আর এ আয়াতে অন্ধকার যুগের আরেকটি কুসংস্কারের কথা বলা হয়েছে। আইয়ামে জাহেলিয়াতের লোকেরা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে জেহার করতো, অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে বলতো তুমি আমার মায়ের মত। এই জেহারকে তারা তালাক মনে করতো। ইসলামী শরীয়ত জেহারকে তালাক মনে করেনা; বরং এর জন্যে কাফ্ফারা আদায়ের হুকুম রয়েছে, আর কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত তাদের একত্রে ওঠা-বসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মূলতঃ একই ব্যক্তির দু'টি হৃদয় থাকতে পারেনা, এমনিভাবে একই ব্যক্তির একাধিক পিতা থাকতে পারেনা, একাধিক মা-ও থাকতে পারেনা। স্ত্রীকে মা বললে সে সত্যিকার অর্থে মা হয়ে যায় না। আর এভাবে প্রাক-ইসলামিক যুগে আরও একটি কুসংস্কার ছিল, পালক পুত্রকে তারা একান্ত আপন পুত্র মনে করতো, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

"আল্লাহ্ পাক তোমাদের পালক পুত্রকেও সত্যিকার পুত্র করেননি"।

ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ

অর্থাৎ এগুলো হল তোমাদের মুখের কথা মাত্র।

কোন ছেলেকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেই সে তার পুত্র হয়না, আর এভাবে কেউ কারো পিতাও হয়না কিন্তু অজ্ঞতার যুগের লোকদের ধারণা ছিল, পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে সত্যিকার অর্থেই সে পুত্র হয়ে যায় আর তাদের মাঝে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইসলামী শরীয়ত পালক পুত্রকে সত্যিকার পুত্রের মর্যাদা দেয়না, পালক পুত্র আপন পুত্রের ন্যায় উত্তরাধিকারী হয়না, বিয়ে-শাদীর বিধি-নিষেধও তার প্রতি প্রযোজ্য হয়না। এ আয়াতে উপরোক্ত তিনটি কুসংস্কারের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যার স্মরণশক্তি বেশী তার দু'টি হৃদয় থাকেনা। এমনিভাবে কোন স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে জেহার করে তবে তালাকে বায়েন হয়ে যায় না, আর ঐ স্ত্রী সব সময়ের জন্যে হারাম হয়ে যায়না। এমনিভাবে পালক পুত্র প্রকৃত পুত্র হয়না, যেমন জাহেলিয়া যুগের লোকেরা মনে করতো।

নবুওয়্যত লাভের পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ এবনে হারেসাকে আযাদ করে নিজের পালক পুত্র বানিয়েছিলেন এবং হযরত যায়েদ এবনে হারেসা যখন তাঁর স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহাসকে তালাক দিলেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাঁকে বিবাহ করলেন। মুনাফেকরা বলতে লাগলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু এটি ছিল নিতান্ত মিথ্যা কথা, কেননা পালক পুত্রের স্ত্রী কখনও পুত্রবধু হয়না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ

"এগুলো হল তোমাদের মুখের কথা মাত্র"।

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ

"আর আল্লাহ পাকই সঠিক কথা বলেন"।

وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ○

"আর তিনিই সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন"।

স্মরণযোগ্য, মানুষের মুখের কথা অনেক ক্ষেত্রেই শুধু মুখের কথাই হয়ে থাকে, বাস্তবতার সাথে তার কোন মিল থাকেনা। কোন মেধাবী, ধী-শক্তির অধিকারী ব্যক্তির দু'টি মাথা থাকেনা। মুনাফেকরা দ্বিমুখী কথা বলে, এর অর্থ এই নয় যে, তার দু'টি মুখ আছে। ঠিক এমনিভাবে কাউকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেই সে প্রকৃত পুত্র হয়না, এটিই সত্য, পবিত্র কোরআনে এ সত্যই ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ

"এটি তোমাদের মুখের কথা"।

এর তাৎপর্য হলো এটি তোমাদের মনের কথা নয়, একথা মন থেকে বের হয়নি, আর মনে প্রবেশও করেনি, অতএব একথার কোন গুরুত্ব নেই।

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ

"আর আল্লাহ পাকই হক্ব কথা বলেন"।

অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো হক্ব কথা মেনে চলা, কেননা এটিই হক্ব বা ধ্রুব সত্য।

وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ○

"আর তিনিই সত্য পথ প্রদর্শন করেন"।

অতএব, সত্য পথে চলাই মর্দে মোমেনের কর্তব্য।[২]

তফসীরকারকগণ বলেছেন, প্রাক-ইসলামিক যুগে নারী জাতির প্রতি অকথ্য নির্যাতন চলতো, স্ত্রীকে শুধু একথাটি বলা হতো যে, 'তুমি আমার মায়ের পৃষ্ঠের ন্যায়'। এরপরই

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৯২-৯২
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৯১-৯২

তাকে পরিবার থেকে বহিঃস্কৃত হতে হতো, তার খোরপোষের কোন হক্বও আদায় করা হতো না। আর তাকে স্বাধীন ভাবে ছেড়েও দেয়া হতো না যে সে অন্য কোথাও বিয়ের ব্যবস্থা করে নেবে, তাকে একজন বন্দিনী হিসেবে রাখা হতো।

একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে, সকল অন্যায়-অনাচার দূরীভূত করতে, এজন্যে ইসলাম এসেই এসব কুসংস্কার দূরীভূত করলো এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলো যে, কাউকে মায়ের ন্যায় বললেই সে 'মা' হয়ে যায়না, এমনিভাবে কোন ছেলেকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেই সে 'পুত্র' হয়ে যায় না। অতএব, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে·ওয়াসাল্লাম যায়েদ এবনে হারেসাকে তাঁর পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার কারণেই তিনি তাঁর প্রকৃত পুত্র হননি।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত যায়েদ এবনে হারেসা (রাঃ) সম্পর্কে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবুওয়্যত লাভের পূর্বে তাঁকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁকে যায়েদ এবনে মোহাম্মদ বলা হতো কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এ কুসংস্কার বাতিল ঘোষণা করা হয়, আর এ সূরাতেই এ সম্পর্কে অন্য একখানি আয়াত রয়েছে,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۝

"(হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী, তাঁর মাধ্যমেই নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে"।[১]

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝٦

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৪০

তরজমা

(৫) তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ-পরিচয়ে, আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত, আর যদি তাদের পিতৃ পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই কিন্তু যদি তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকে তবে অপরাধ হবে, আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৬) নবী মোমেনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠতর, আর তাঁর জীবন-সঙ্গিনীগণ তাদের মাতা। আত্মীয়-স্বজনরা মোমেন মোহাজেরদের তুলনায় আল্লাহ্ পাকের কিতাব মোতাবেক একে অন্যের অধিকতর ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের সঙ্গী বন্ধু-বান্ধবের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করতে চাও তবে তা করতে পার, তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

ٱدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ

"তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ-পরিচয়ে, এটিই আল্লাহ্ পাকের নিকট ন্যায়-সঙ্গত"।

শানে নজুল

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আবু হোজায়ফা এবনে উৎবা এবনে রবিয়ার স্ত্রী সাহলা বিনতে সাহল এবনে আমর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আবু হোজায়ফার আযাদ করা গোলাম যাকে আবু হোজায়ফা পালক পুত্র বানিয়ে নিয়েছে, সে আমাদের ঘরে আসা-যাওয়া করে, আমি তখন এক কাপড়েই থাকি, আর সালেমকে পুত্রই মনে করি, এ ব্যাপারে আপনার আদেশ কি? তখন এ আয়াত নাজিল হয়, অর্থাৎ কোন ছেলেকে যদি কেউ আদর করে আপন ছেলে বলে ডাকে, অথবা পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে এতে কোন দোষ নেই, ইসলাম এর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সে ছেলেকে তার সত্যিকার পিতার নামেই ডাকতে হবে, পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করা হলেও পিতার সঙ্গে তার পুত্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবেনা। মৌখিক পুত্র হওয়া এবং বংশগত ভাবে পুত্র হওয়া এক নয়, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ পন্থাই হলো ন্যায়সঙ্গত।

বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পালক পুত্র যায়েদ এবনে হারেসাকে যায়েদ এবনে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেই ডাকতাম, কিন্তু যখন এ আয়াত নাজিল হলো তখন থেকে যায়েদ এবনে হারেসা বলেই ডাকতে

আরম্ভ করলাম।[১]

এ আয়াত দ্বারা একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, যায়েদ এবনে হারেসা যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পালক পুত্র এবং অত্যন্ত স্নেহ-ধন্য ছিলেন কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় তাঁর পুত্র ছিলেন না। কেননা বংশীয়-সূত্রে তিনি কোন পুরুষের পিতা ছিলেন না।

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوٓا اٰبَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ

"যদি তোমরা পালক পুত্রের পিতা কে তা জানতে না পার, তবে তাদেরকে সত্যিকার পুত্র বলবেনা; বরং তাদেরকে দ্বীনিভাই এবং বন্ধু বলবে"।

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ

এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী হবার পূর্বে যদি তোমরা ভুলক্রমে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একজনের পুত্রকে অন্যের পুত্র এবং একজনের পিতাকে অন্যের পিতা বলে ফেল, তবে এতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। কেননা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তিকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে থাকেন। কিন্তু যদি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় কেউ এমন গুনাহ করে তবে তার শাস্তি অবধারিত, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ

অর্থাৎ তোমরা ইচ্ছা করে যা করবে তা ধর্তব্য হবে।

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং হযরত আবু বকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে তার পিতা বলে প্রকাশ করে, তবে তার উপর জান্নাত হারাম। (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, এবনে মাজাহ, আহমদ)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন লোককে পিতা বানায়, অথবা কোন আযাদ করা গোলাম তার মুনীবকে বাদ দিয়ে অন্যকে মুনীব বানায়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের লা'নত তার প্রতি অব্যাহত থাকবে।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৪৭
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৯২
তফসীরে আদদুররুল মানুসর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৫
তফসীরে আদদুররুল মানসর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৬
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৪০

"আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

তিনি গুনাহ্ মাফ করেন এবং গুনাহ্গারের প্রতি দয়া করেন। যেহেতু তিনি অত্যন্ত দয়াময়, এজন্যেই ক্ষমা করেন এবং এরপরও দয়া করেন। যে তওবা করে তার তওবা কবুল করেন এবং দয়া করে মাফ করে দেন। তাঁর দয়া ব্যতীত কেউ বাঁচেনা, বাঁচতে পারেনা। এ পৃথিবীতে যে যা পেয়েছে তা এক আল্লাহ্ পাকের দয়াতেই পেয়েছে।

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

"নবী মোমেনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠতর, আর নবীর স্ত্রীগণ মোমেনদের মাতা"।

শানে নজুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে জেহাদের জন্যে আহ্বান জানাতেন। তখন কোন কোন লোক বলতো, 'আমরা জেহাদের জন্যে প্রস্তুত তবে আমাদের পিতা-মাতাকে একটু জিজ্ঞাসা করা জরুরী মনে করি', তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

নবীর সাথে উম্মতের সম্পর্ক

আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মোমেনদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, উম্মতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সবার উপরে, সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতম। মোমেনের প্রাণের চেয়েও তিনি বেশী প্রিয়। মানুষ কখনও মূর্খতার কারণে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজেরও ক্ষতি করে কিন্তু আল্লাহর নবী সর্বদা কল্যাণকর কাজের আদেশ দেন, অকল্যাণ থেকে বিরত রাখেন। যেমন স্নেহশীল পিতা তার শিশু সন্তানদেরকে ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন, যদিও শিশু সন্তান তা বোঝে না। আর নবী পিতা-মাতার চেয়েও বেশী উম্মতের কল্যাণকামী। এমনকি, তিনি মানুষের প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় এবং ঘনিষ্ঠতর। আগুনে ঝাঁপ দেয়া কারো জন্যে বৈধ নয় কিন্তু নবী যদি এর জন্যে আদেশ দেন তবে আগুনে ঝাঁপ দেয়া ফরজ হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য, পিতা মানুষের দৈহিক জীবনের কারণ হয়; আর রূহানী ও-ঈমানী বা আধ্যাত্মিক জীবনের কারণ হন আল্লাহর নবী। নবীর হেদায়েত ব্যতীত জীবন-সাধন ব্যর্থ, বর্তমান অকেজো, ভবিষ্যত অন্ধকার। এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি আল্লাহর নবী কোন লোককে কোন কাজের আদেশ দান করেন, আর তার মন অন্য দিকে আকৃষ্ট থাকে তবে মনের কথা বাদ দিয়ে নবীর কথা মেনে নেয়া অবশ্য কর্তব্য। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে মানুষের কল্যাণের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। তাই তিনি মোমেনদেরকে এমন কাজের হুকুম দেন যাতে রয়েছে তাদের পরিপূর্ণ সাফল্য এবং সার্বিক কল্যাণ। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

(তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত, পরিপূর্ণ মোমেন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার নিকট আমি তার প্রাণের চেয়ে এবং তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হই।)

এই হাদীস শ্রবণ করার পর হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার সকল আপন-জনের চেয়ে অধিকতর প্রিয় কিন্তু আমার প্রাণের মায়া আমি অধিক অনুভব করি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)-এর বক্ষদেশে তাঁর দস্তে মোবারক স্থাপন করলেন। ক্ষণিকের মধ্যেই হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ অর্থাৎ আমি এখন অনুভব করি, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয়।

তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধে যখন রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলছিল তখন শয়তান এ গুজব রটিয়ে দেয় যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। একথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত ওমর (রাঃ) রণাঙ্গনেই বসে পড়লেন। অথচ চতুর্দিকে তলোয়ার চলছিল। তখন তিনি প্রাণের মায়া করলেন না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ দুঃসংবাদ পাওয়ার পর তাঁর অন্তরে নিজের প্রাণের মায়া ছিল না।

হিজরতের রাতে সওর নামক গুহায় যখন আত্মরক্ষা করার সিদ্ধান্ত হলো তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাকে আগে গুহায় প্রবেশ করতে দিন কেননা সেখানে বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছু রয়েছে। আমি স্থানটিকে পরিস্কার করে নিরাপদ করে নেই অর্থাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর নিজের প্রাণের মায়া করছেন না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যেন কোন বিপদ না হয় এজন্যেই তাঁর যাবতীয় দুঃশ্চিন্তা। ঠিক এমনিভাবে হিজরতের রাতে পথ চলার সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আবু বকর (রাঃ) চলছিলেন, হঠাৎ কখনও তিনি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন, আবার কখনও তিনি পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেন। কখনও ডানে, কখনও বাঁমে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবুবকর! আপনি এভাবে অগ্র-পশ্চাত কেন করছেন"? হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! দুশমন আমাদের অনুসন্ধান করছে। আমি যখন আশংকা করি যে দুশমন আপনার সামনে দিয়ে আক্রমণ করবে তখন আমি আপনার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। আর যখন আশংকা করি আক্রমণ হবে পেছন থেকে তখন আমি পেছনে গিয়ে দাঁড়াই'।

মূলতঃ সাহাবায়ে কেরাম এভাবেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। ওহোদের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বিষাক্ত তীর আসছিল। তখন তিনি এরশাদ করেছিলেন, 'কে আছে যে আমার সামনে দাঁড়াতে পারে'? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহাবী এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে

গেলেন এবং তীর বিদ্ধ হতে লাগলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগে ৮৩টি তীর বিদ্ধ হয়েছে, এর একটিও পৃষ্ঠদেশে নেই।

এ ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্কের অবস্থা যা এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যার বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায় তাঁদের গৌরবোজ্জল জীবনে।

আলোচ্য আয়াতে যে বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হলো নবীর সঙ্গে তাঁর উম্মতের সম্পর্কের বিষয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে নিজেই এরশাদ করেছেনঃ

انما انا لكم بمنزلة الوالد

অর্থাৎ আমি তোমাদের পিতৃস্থানীয়, আর হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বলেছিলেনঃ

وهو اب لهم

(আর তিনি তাদের পিতা)।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ

নবী মোমেনদের নিকট সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতম, পিতা-পুত্রের যে সম্পর্ক তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, পিতা থেকেই পুত্রের অস্তিত্ব, শুধু তাই নয়; পুত্রের লালন-পালনে পিতার স্নেহ-মায়া-মমতা এবং পুত্রের কল্যাণ কামনা অসাধারণ এবং কল্পনাতীত। কিন্তু পিতা-পুত্রের এ সম্পর্কের চেয়েও অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলো নবীর সঙ্গে তাঁর উম্মতের। কেননা উম্মতের আধ্যাত্মিক বা ঈমানী ও রূহানী অস্তিত্ব লাভ হয় নবীর মাধ্যমে। নবীর হেদায়েত ব্যতীত কোন মানুষ সঠিক পথ লাভ করতে পারেনা। পরিণামে মানুষের জীবন দুনিয়াতেই শুধু দুর্বিষহ হয়না; বরং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনেও কোপগ্রস্ত হতে হয়। আর আখেরাতের শাস্তি হয় চিরস্থায়ী। পিতার মাধ্যমে পুত্রের অস্তিত্ব লাভ হয় কিন্তু নবীর মাধ্যমে সে অস্তিত্ব আল্লাহর রহমতের যোগ্য হয়। কেয়ামতের দিন কাফেররা বলবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

"হায়! যদি মাটি মাটিই থাকতাম, (মানব রূপ ধারণ না করতাম)"।

অথবা এর অর্থ হলো, কেয়ামতের দিন যেভাবে জীব-জন্তুকে মাটিতে পরিণত করা হবে, সে দৃশ্য দেখে কাফেররা বলবে, যদি এভাবে আমরাও মাটি হয়ে যেতাম তবে কত ভাল হতো! একথা তারা এজন্যে বলবে যে, দুনিয়ার জীবনে তারা নবীর হেদায়েত মানেনি, যদি নবীর হেদায়েত মেনে জীবন-যাপন করতো তবে একথা বলতে হতো না।

মূলতঃ নূরে নবুওয়্যত থেকে যে আলোকরশ্মির প্রতিবিম্ব এসে থাকে, তা মানব

অন্তরকে আলোকিত করে, ঐ আলো থেকে যে বঞ্চিত হয়, তার রুহানী ও ঈমানী অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়না, যা দুনিয়ার জীবনে সাফল্য, সার্বিক কল্যাণ এবং আখেরাতের নাজাত ও চির শান্তি নিশ্চিত করে, এ কারণেই উম্মতের সঙ্গে নবীর সম্পর্ক সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতম।

আলোচ্য আয়াতে একথাই ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ মোমেনদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় হলেন তাঁদের নবী। কেননা নবীর হেদায়েতের মাধ্যমেই প্রাণ রক্ষা পায়। এজন্যেই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে এবং তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাণ দিতে আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না; বরং এক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন।

وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ

"আর তাঁর জীবন-সঙ্গিনীগণ তাদের মাতা"।

আয়াতের প্রথমাংশে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান, মর্যাদা এবং উম্মতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতংশে এরশাদ হয়েছে যে, যেভাবে আল্লাহর নবী উম্মতের রূহানী পিতা ঠিক তেমনি তাঁর স্ত্রীগণ তাদের রূহানী মাতা, যাঁদের মর্যাদা বংশীয় মাতাদের চেয়েও অধিকতর, সেজন্যে যেভাবে বংশীয় মাতাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম, তেমনি রূহানী মাতাদের সঙ্গেও বিয়ে হারাম এবং তাঁদের প্রতি আদব রক্ষা করা, তাঁদের সম্মান মর্যাদা এবং তা'যীম করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যেভাবে মানুষ নিজের মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে, রুহানী মায়েদের সঙ্গে তার অনুমতি নেই, যেমন কোরআনে করীমেই রয়েছে এ সম্পর্কে নির্দেশঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

"আর যদি উম্মাহাতুল মোমেনীনদের নিকট থেকে তোমাদের কিছু চাওয়ার থাকে, তবে তোমরা পর্দার আড়াল থেকে চাও"।

ইমাম শা'বী মসরুক (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে মা বলেছিলেন, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মা নই, তবে তোমাদের পুরুষদের মা'।

বায়হাকী সুনানে এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এর অর্থ হলো, ঠিক নিজের মায়ের সঙ্গে যেমন বিয়ে হারাম তেমনি রূহানী মায়েদের সঙ্গেও বিয়ে হারাম। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোমেনদের দ্বীনি পিতা, তাই তাঁর স্ত্রীগণ মোমেনদের মাতা। বিশ্বের সকল মুসলমান যে পরস্পর ভাই ভাই তা এ ভিত্তিতেই।

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আত্মীয়-স্বজনরা মোমেন মোহাজেরদের তুলনায় আল্লাহ্ পাকের কিতাব মোতাবেক একে অন্যের অধিকতর ঘনিষ্ঠ"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়্যারায় হিজরত করেন তখন তাঁর পূর্বে এবং পরে অনেক মুসলমান মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে মদীনা মুনাওয়্যারায় হাযির হন। তখন মোহাজেরীনদের পুনর্বাসন একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এর ফলশ্রুতিতে মোহাজেরদের পুনর্বাসন নিশ্চিত হয়েছিল অতি সহজেই। একজন মোহাজের এবং আনসারকে একত্রিত করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই। এ ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কার্যকর হয়েছিল। মদীনাবাসী আনসারী সাহাবীগণ তাঁদের মোহাজের ভাইদের প্রয়োজনের আয়োজনে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি।

পরবর্তীকালে মোহাজেরদের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরাও যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁরা মদীনা তৈয়্যেবায় হিজরত করে চলে আসেন তখন প্রশ্ন ওঠে, বংশীয় সূত্রে যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে, তা অগ্রগণ্য হবে নাকি যে সম্পর্ক মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে গড়ে ওঠেছে তা অগ্রগণ্য হবে। আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে, যে সম্পর্ক মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তা বহাল থাকা সত্ত্বেও বংশগত সম্পর্ক অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে। এ ঘোষণার পর কোন ব্যক্তির এন্তেকাল হলে বংশগত সূত্রের ভাই এবং আত্মীয়-স্বজনরাই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সাহাবায়ে কেরামকে আবদ্ধ করেছিলেন তা-ও সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকে, তাঁদের পরস্পরের প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের মাধ্যমে তা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থাকে।

আলোচ্য আয়াতে كِتٰبِ الله শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তকে বোঝানো হয়েছে, অথবা লওহে মাহফুজ বা কোরআনে করীমের এ আয়াত অথবা উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আয়াতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে অর্থ-সম্পদ রেখে যায়, তার ওয়ারিশানরাই তা পাবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মোহাজের এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন, তার ফলে মোহাজেরগণ আনসারী সাহাবাগণের মৃত্যুর পর তাদের উত্তরাধিকারী হতেন। হযরত জোবায়ের এবনে আওয়াম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা যখন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়্যারায় আসলাম তখন আমাদের নিকট কোন অর্থ-সম্পদ ছিলনা, আনসারী সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ-ক্রমে ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়। তাঁরা উত্তম ভাই বলে প্রমাণিত হন, এমনকি তাঁদের এন্তেকালের পর আমরাই তাঁদের উত্তরাধিকারী হতাম। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ভ্রাতৃত্ব হয়েছিল হযরত

খারেজা বিন যায়েদের সঙ্গে, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ভ্রাতৃত্ব হয়েছিল এক জারকি ব্যক্তির সঙ্গে, আর আমার ভ্রাতৃত্ব হয়েছিল কা'ব এবনে মালেক (রাঃ)-এর সাথে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কাতাদা (রঃ) বলেছেন, মুসলমানগণ হিজরতের ভিত্তিতে একে অন্যের ওয়ারিশ হতেন। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সে প্রথা বিলুপ্ত হয়।

কালবী (রঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। আনসার ও মোহাজের দু'জনকে ভাই ভাই বলে দিতেন, যখন এ আয়াত নাজিল হয় তখন এ প্রথা বাতিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, নিকটতর আত্মীয়-স্বজনকে অন্য মুসলমান ভাইদের তুলনায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু হতো এবং তার কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকতো যাদের মধ্যে উত্তরাধিকার বণ্টন করা যায় তবে এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বায়তুল মালে জমা করা হতো।

إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا

"তবে যদি তোমরা তোমাদের সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করতে চাও, তা করতে পার, তা-কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে"।

পূর্ববর্তী আয়াতাংশে ঘোষণা করা হয়েছে যে আত্মীয়-স্বজন অন্য মোমেনদের উপর প্রাধান্য পাবে। আর এ আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছে, তবে যদি কেউ মোহাজের ভাই বা যে কোন মোমেনের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করতে চায় তথা তাদের জন্যে ওসিয়ত করতে চায় তবে তা বৈধ। ইসলামী শরীয়ত ওসীয়তের ব্যাপারেও বিধান প্রবর্তন করেছে। আর তা এই, যে কোন ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের ওসিয়ত করা যায়, এর চেয়ে বেশী নয়। নিকটাত্মীয়-স্বজনকেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকতর হক্দার বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য ওসিয়তের জন্যে এক তৃতীয়াংশকে ভিন্ন করে রাখা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির এ ওসিয়ত পূর্ণ করার পরই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বিতরণ করা হবে।

كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًا

"এ নিয়ম কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে"।

অর্থাৎ লওহে মাহফুজে অথবা পবিত্র কোরআনে আর কারো কারো মতে তৌরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, অবশ্য এ নিয়ম চিরকাল ধরেই অবশ্য পালনীয় থাকবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৭৮

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرٰهِيمَ
وَمُوسٰى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ⑦
لِيَسْئَلَ الصّٰدِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ⑧
يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا ⑨ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ
زَاغَتِ الْأَبْصٰرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ
الظُّنُونَا ⑩

তরজমা

(৭) আর স্মরণ করুন সে সময়কে যখন আমি সকল নবী থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম (বিশেষতঃ) আপনার নিকট থেকে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মুসা এবং মরিয়ম তনয় থেকেও, আমি তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করি।

(৮) আল্লাহ পাক সত্যবাদীদের সত্যতা সম্বন্ধে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করেন। তিনি কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি।

(৯) হে মোমেনগণ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে; যখন শত্রুর সেনাবাহিনী তোমাদের উপর হামলায় উদ্যত হয়েছিল তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু। আর এমন সৈন্যবাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহ পাক দেখতে পান।

(১০) তারা যখন তোমাদের উপর দিক থেকে এবং তোমাদের নিম্ন দিক থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছিল এবং যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু সমূহ বিস্ফোরিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ পাক সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা পোষণ করছিলে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ হে নবী! আপনি আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে চলুন, কাফের মুনাফেকদের

পরামর্শ গ্রহণ করবেন না।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আমি এমনি অঙ্গীকার সমস্ত নবীদের থেকেই গ্রহণ করেছি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ

আর সে সময়কে স্মরণ করুন, যখন আমি সকল নবী থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি যে তোমরা আমার আদেশ মেনে চলবে, আমার বিধি-নিষেধের প্রচার-প্রসারে অটল অবিচল থাকবে, কাফের-মুশরেকদের তিরস্কার বা নির্যাতনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেনা, কাফের মুনাফেকদের পরামর্শ গ্রহণ করবে না।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ পাক সকল নবী থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে তাঁরা নিজ নিজ উম্মতের মধ্যে এ সত্য প্রচার করবেন যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে এ অঙ্গীকার কখন গ্রহণ করেছিলেন? তফসীরকারগণ বলেছেন, নবুওয়্যত প্রদানের সময় এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, অথবা সৃষ্টির প্রথম দিন যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর সমগ্র মানব জাতির রূহকে একত্রিত করে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

"আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই"? তখন সকলেই বলেছিলেনঃ بَلَى "হ্যাঁ অবশ্যই'। সেদিনই এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল।[১]

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) লিখেছেন, এবনে জরীর, এবনে মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক সৃষ্টির প্রথম দিনই তাঁর নবীদের থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের النبين শব্দের মধ্যে সকল নবীই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরও বিশেষ কয়েকজন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন নূহ, ইব্রাহীম, মুসা এবং ঈসা প্রমুখ। কেননা আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে তাঁরা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তাঁদেরকে স্বতন্ত্র শরীয়ত দেয়া হয়েছে, তাঁদের প্রতি কিতাব এবং ছহীফা নাজিল করা হয়েছে, আর প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশার্থে এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রিয়নবী (দঃ) সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী

এতদ্ব্যতীত সর্বপ্রথম তাঁর উল্লেখ করার আরেকটি কারণ রয়েছে– তিনিই সর্ব প্রথম

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৫৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দালভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬৮
২। তফসীরে আদদুররুল মানুসর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯১

নবী, আর তিনিই সর্বশেষ নবী, আর তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

كنت اول النبين فى الخلق واخرهم فى البعث

"নবীদের মধ্যে সৃষ্টির ব্যাপারে আমি সকলের পূর্বে আর পৃথিবীতে প্রেরণের ব্যাপারে সকলের শেষে"।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

عن ابى ابن كعب مرفوعا بدى بى الخلق وكنت اخر هم فى البعث

"আমাকে দিয়েই সৃষ্টি শুরু করা হয়েছে, আর পৃথিবীতে নবী হিসেবে প্রেরণের ব্যাপারে আমি সবার শেষে"।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

كنت نبيا وادم بين الروح والجسد

"আমি নবী ছিলাম, যখন আদম রূহ এবং দেহের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলেন"।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হয়, আল্লাহ পাক কখন আপনার নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন? এর জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন আদম রূহ এবং দেহের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলেন।[১]

আল্লামা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) সহ সকল নবী রসূলগণের নিকট থেকেই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। এ অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে তাঁদের একে অন্যকে স্বীকার করা, একে অন্যকে সমর্থন করা এবং পরস্পরের সহযোগিতা করাও তাঁদের কর্তব্য। আলোচ্য আয়াতে যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা সকলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে বিশেষভাবে তাঁদের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

আর যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সর্বাধিক, তাঁর নূর সর্ব প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই তাঁর কথাই সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ

১। তফসীরে রূহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৫৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৫৮
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৫৪৩

"আল্লাহ পাক সত্যবাদীদের সত্যতা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করেন"।

অর্থাৎ নবীগণকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা নিজ নিজ উম্মতকে কী বলেছিলে? অথবা কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে অপমানিত এবং নিরুত্তর করার জন্যে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা কি আমার নবীগণকে সত্য-জ্ঞান করেছিলে'? অথবা মোমেনদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা কি তোমাদের অঙ্গীকার রক্ষা করেছিলে'?

মূলতঃ আল্লাহ পাক এমন প্রশ্নের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করতে চান এবং একথা প্রমাণ করতে চান কে সত্য-নিষ্ঠ ছিল, আর কে ছিল বাতিল-পন্থী। এরপর যারা নবীদেরকে মেনে নিয়েছিল তারা আল্লাহ পাকের রহমত, নেয়ামত তথা পুরস্কার লাভ করবে। আর যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাকের অবাধ্য থাকবে তারা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য থাকবে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

"আর আল্লাহ পাক কাফেরদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছেন"।

এর কারণ এই, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাঁর নবী রসূলগণকে জিজ্ঞাসা করবেন, যখন তোমরা তোমাদের জাতিকে আমার বাণী পৌছিয়েছিলে এবং আমার তওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছিলে তখন তারা কি তোমাদের আহবানে সাড়া দিয়েছিল এবং আমার একত্ববাদে বিশ্বাস করেছিল? এ প্রশ্ন যদিও নবী রসূলগণের উদ্দেশেই হবে তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে কাফের-মুশরেকদের নাফরমানীর কথা প্রকাশ করা। যারা দুনিয়াতে নবী রসূলগণের হেদায়েত মানেনি; বরং তাদেরকে মিথ্যা-জ্ঞান করেছে, তাদের উদ্দেশেই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে তাদের জন্যেই আল্লাহ পাক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন। তারা অবশ্যই এ শাস্তি ভোগ করবে।

পক্ষান্তরে, যারা নবী রসূলগণের হেদায়েত মেনে জীবন যাপন করবে, তারা আল্লাহ পাকের রহমত স্বরূপ চির শান্তির কেন্দ্র জান্নাত লাভ করবে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক মোমেনদের থেকে নবী রসূলগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আর নবী রসূলগণের নিকট থেকে দ্বীন ইসলামের তবলীগ এবং প্রচারের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এবং ওলামায়ে কেরাম থেকে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।[১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

"হে মোমেনগণ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে, যখন শত্রুর সেনাবাহিনী তোমাদের উপর হামলায় উদ্যত হয়েছিল, তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দালভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬৯
তফসীরে আজিজী, পৃষ্ঠা-২০২

প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু। আর এমন সৈন্যবাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওনি"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে রয়েছে,

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"আর কাফেররা বলে, কবে হবে এই বিজয় যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।

যেহেতু মোমেনগণ বলতেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন, তখন কাফেররা এ প্রশ্ন করতো, 'কবে হবে তোমাদের বিজয়'? আল্লাহ্ পাক এ আয়াত থেকে কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াত থেকে পরবর্তী দু' রুকু পর্যন্ত খন্দকের যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো একথা প্রকাশ করা যে, যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন। যদি প্রকাশ্য কোন উপকরণ না-ও থাকে তবু আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন এবং দ্বীন ইসলামের সত্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এভাবে যারা সত্যানুরাগী তাদের সত্য-নিষ্ঠা আরো শক্তিশালী হয়। আর যারা বাতিল-পন্থী হয়, তাদের দুর্বলতা এবং বাতুলতা প্রমাণিত হয়।

আহযাব যুদ্ধ

যেহেতু এ যুদ্ধে মদীনা মুনাওয়্যারার সমতল ভূমিতে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পরীখা খনন করা হয়, সেজন্যে এ যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধও বলা হয়।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'এ যুদ্ধে আল্লাহ্ পাক আমাকে ঝঞ্ঝা-বায়ু দিয়ে সাহায্য করেছেন'।

ঘটনার বিবরণ এই, চতুর্থ হিজরীতে বনু নজীর গোত্রের ইহুদীদেরকে তাদের অন্যায়-অনাচারের কারণে মদীনা শরীফ থেকে নির্বাসিত করা হয়। এরপর তারা সমগ্র আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। যে সব ইহুদী এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে ছিল সালাম এবনে আবিল হাকীক, হাই এবনে আখতাব, কেনানা এবনে রবী, এবনে আবিল হাকীক, হাওদা এবনে কায়েস এবং আবু আমের লুআই গং। এরাই মক্কার কোরায়েশদের কাছে যায় এবং কোরায়েশকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানী দেয় আর একথাও বলে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের মূলোৎপাটনে তোমরা এগিয়ে আস, আমরা তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। কোরায়েশের লোকেরা তাদেরকে বলে, 'হে ইহুদীদের দল! তোমরা জ্ঞানী লোক, তোমাদের নিকট গ্রন্থ রয়েছে কিন্তু মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে, তোমরাই বলো আমাদের ধর্ম উত্তম? নাকি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ধর্ম'। ইহুদীরা বললো, 'তোমাদের ধর্ম

উত্তম। তোমরাই সত্যের উপর রয়েছ'।

ইহুদীদের একথা শ্রবণ করে কোরায়েশরা যার পর নাই উল্লসিত হলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। এরপর সিদ্ধান্ত হয় যে, গাতফান এবং বনু ফাজারা সহ অন্যান্য গোত্রকেও এ অভিযানে শরীক করা উচিত এবং এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরবের সকল গোত্রকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। কোরায়েশ এ অভিযানে শরীক হয়েছে খবর পেয়ে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এ সম্মিলিত বাহিনীতে যোগ দেয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, বনু নজীর এবং বনু ওয়ায়েল গোত্রের প্রায় বিশজন ইহুদী কোরায়েশের নিকট হাযির হয়। আবু সুফিয়ান তাদেরকে সম্বর্ধনা জানায়। ইহুদীরা বলে, 'কোরায়েশ গোত্রের তুমি সহ পঞ্চাশ জন নির্বাচন কর এবং এরপর আমরা সহ কা'বা শরীফের ভেতর প্রবেশ করে সমবেত ভাবে শপথ করি যে, আমরা মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবো, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও যদি জীবিত থাকে তবে আমরা যুদ্ধ অব্যাহত রাখবো'। পরামর্শ মোতাবেক এ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

কোরায়েশের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইহুদীরা গাতফান গোত্রের নিকট যায় এবং তাদেরকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে উস্কে দেয়। তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তাহলে খায়বরের বাগানে এক বছরে যা ফল ধরে তা বা তার অর্ধেক তোমাদেরকে দেয়া হবে'। গাতফান গোত্রের নেতা উয়াইনাহ এবনে হোসেইন ফাজারী এ শর্তে ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং এমনিভাবে আরো কিছু গোত্রকে তারা একত্রিত করে।

আবু সুফিয়ান চার হাজার সৈন্য সমবেত করে। এ সৈন্যদের পতাকা ছিল ওসমান এবনে আবি তালহার হাতে। মক্কা থেকে বের হবার সময় তাদের সঙ্গে ছিল তিনশ' ঘোড়া এবং এক হাজার উষ্ট্র। এ চার হাজার সৈন্য 'মাররুজ জাহরান' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। আর এখানেই বনী আসলাম, বনী আসজা, বনী মোররা, বনী কেনানা, বনী ফাজরা, বনী গাতফানের সৈন্যরাও উপস্থিত হয়। এদের সংখ্যা তখন দশ হাজারে উন্নীত হয়। মারুরুজ জাহরান থেকে তারা মদীনা মুনাওয়্যারার দিকে অগ্রসর হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ইহুদী এবং মুশরেকদের এ দলের মদীনা মুনাওয়্যারার দিকে রওয়ানা হবার খবর পান তখন তিনি মদীনা মুনাওয়্যারার বাইরে একটি পরীখা খনন করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এজন্যে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) পরামর্শ দিয়েছিলেন।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) সে যুগে আযাদ ছিলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে থেকে জেহাদে অংশগ্রহণের এই প্রথম সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা যখন পারস্যে ছিলাম, আর শক্ররা যখন আমাদের বাড়ী-ঘর ঘেরাও করতো তখন আমরা পরীখা খনন করতাম'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং পরীখা খননের

কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন কাফেরদের এ সম্মিলিত অভিযানের খবর পৌঁছলো তখন তিনি এরশাদ করলেন,

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"আল্লাহ পাকই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মকর্তা"।

এরপর তিনি আনসার ও মোহাজেরদেরকে একত্রিত করে পরামর্শ করলেন, আর তখনই হযরত সালমান (রাঃ) পরীখা খননের পরামর্শ দিলেন যা গ্রহণ করা হয়। মদীনা শরীফের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত আবদুল্লাহ এবনে উম্মে মাকতুমকে অর্পণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং জেহাদের জন্যে তিন হাজার সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হন। মোহাজেরদের পতাকা বহন করছিলেন যায়েদ এবনে হারেসা (রাঃ) এবং আনসারদের পতাকা বহন করছিলেন হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ)। পনের বছর বয়স্ক ছেলেদেরকে জেহাদে শরীক হবার অনুমতি দেয়া হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনে আওফের পিতা বর্ণনা করেছেন, খন্দকের যুদ্ধের বছর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং মাটিতে রেখা টেনে দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক দশজনের জন্যে চল্লিশ গজ স্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) ছিলেন শক্তিশালী ব্যক্তি। মোহাজের ও আনসার উভয়েই তাঁকে তাঁদের দলভুক্ত করতে চাইলেন, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সালমান আমাদের মধ্যে তথা আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত।

আমর এবনে আওফ বর্ণনা করেন, আমি এবং সালমান (রাঃ), হোজায়ফা (রাঃ) ও নোমান এবনে মেকরান মোজানী এবং আরো ছয়জন আনসারী সাহাবী মাটি কাটা আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণ কাটার পরই একটি শক্ত পাথর পাওয়া গেল যা ভাঙ্গা আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। আমি হযরত সালমান (রাঃ)-কে বললাম, 'তুমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ পাথর সম্পর্কে জানাও। যদি তিনি অনুমতি দান করেন তবে এ পাথরটি এক পার্শ্বে রেখে আমরা পরীখা খনন করবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা আদেশ করবেন তার উপর আমরা আমল করবো, কেননা আমরা তাঁর প্রদত্ত চিহ্নের বাইরে যেতে চাইনা'। হযরত সালমান (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন এবং আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা পরীখা খনন করছিলাম, এমন সময় একটি বড় পাথর এসে পড়েছে, যার কারণে আমাদের পরীখা খননের হাতিয়ারগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে, এখন করণীয় কি?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা শ্রবণ করে সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানে চলে গেলেন এবং কোদাল হাতে নিয়ে আঘাত করলেন, ফলে পাথরে ফাটল ধরলো, আর ঐ আঘাতের কারণে পাথর থেকে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো, যা দ্বারা মদীনা শরীফের দু' দিক আলোকিত হলো, মনে হলো কোন অন্ধকার কক্ষে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে, ঐ মুহূর্তে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

'আল্লাহু আকবর' বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সাহাবায়ে কেরাম উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন, এবার পাথরটি ভেঙ্গে গেল, তখনও বিদ্যুৎ চমকে উঠলো এবং মদীনা শরীফের দু' দিক আলোকিত হলো, মনে হয় কোন অন্ধকার কক্ষে প্রদীপ প্রজ্জলিত করা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে তকবীর বললেন এবং মুসলমানগণও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরপর পুনরায় পাথরে আঘাত করলেন এবং সালমান ফারসীর হাত ধরে তিনি পাহাড়ের উপরে উঠে আসলেন। হযরত সালমান (রাঃ) আরজ কররেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতা মাতা কোরবান হোক, আমি আজ এমন কিছু দেখেছি যা ইতিপূর্বে দেখিনি'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্য লোকদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, 'সালমান যা দেখেছে তোমরাও কি তা দেখেছিলে?' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'জ্বী-হ্যাঁ, সালমান (রাঃ) ঠিকই বলেছেন'। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'আমি যখন প্রথম আঘাত করি তখন তোমরা বিজলী চমকাতে দেখেছ। তখন আমি সে আলোতে দেখেছি, ইরাকের বাদশাহর সিংহাসন এবং তার রাজধানীর অট্টালিকা সমূহ এবং পারস্য রাজের সিংহাসন ও অট্টালিকা সমূহ যা মাদায়েনে রয়েছে, কুকুরের দাঁতের ন্যায় মনে হলো, তখন জীবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, আমার উম্মত হিরা এবং মাদায়েন পর্যন্ত বিজয়ী হবে, আর দ্বিতীয়বার যখন আমি আঘাত করি এবং বিজলী চমকে ওঠে, সে আলোতে আমি দেখি রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানীকে কুকুরের দাঁতের ন্যায়। তখন জীবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, আমার উম্মত এ ইমারতগুলোকে দখল করে নেবে'। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে কথাটি বলেছিলেন, তা এই-.

ان الله زوى لى فى الارض مشارقها ومغاربها سيبلغ ملك امتى مازوالى منها

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাকে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সব কিছু দেখিয়েছেন, আর অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের ক্ষমতা বিস্তার হবে সে সব স্থানে যা আল্লাহ পাক আমাকে দেখিয়েছেন"।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'তোমাদের জন্যে সুসংবাদ', একথা শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, আল্লাহ শোকর আদায় করলেন এবং বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর ওয়াদা সত্য, যিনি আমাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

একথা শুনে মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলতে লাগলো, 'এসব কথা তোমাদের কাছে কি বিস্ময়কর নয়? মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে আশান্বিত করছেন, তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আর একথা বলছেন যে ইয়াসরেব থেকে মাদায়েন পর্যন্ত তিনি দেখেছেন, আর একথা বলছেন যে ঐ সব এলাকার উপর তোমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, অথচ বর্তমানে তোমাদের এ শক্তি

নেই যে তোমরা রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করবে, শত্রুদের ভয়ে তোমরা পরীখা খনন করছো'। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

وَاِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهٗ اِلَّا غُرُورًا

"আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল, তারা বলতে লাগলো, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল যে ওয়াদা করছেন তা প্রতারণা মাত্র (নাউজুবিল্লাহে মিন জালেক)।

এরপরই নাজিল হলো- قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ........

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমতার মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দেন, আর যাকে ইচ্ছা তার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা তাকে অপমানিত করেন, আপনার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ, নিশ্চয় আপনি সর্বোপরি সর্বশক্তিমান"।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরীখা খননের স্থানের দিকে তশরীফ নিয়ে যান, তখন ছিল শীতের সকাল, মোহাজের এবং আনসারগণ পরীখা খনন করছিলেন, সাহাবায়ে কেরামের ক্ষুধা এবং ক্লান্তি লক্ষ্য করে তিনি এরশাদ করলেন,

ان العيش عيش الاخرة ـ فاغفر الانصار والمهاجرة

"প্রকৃত জীবনতো আখেরাতের জীবনই, হে আল্লাহ! আনসার ও মোহাজেরদেরকে ক্ষমা কর"।

সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার জবাবে বললেন,

نحن الذين بايعوا محمدا ـ على الجهاد ما بقينا ابدا

"আমরা সে সব লোক, যারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে জেহাদের বয়আত করেছি সর্বকালের জন্যে, যতদিন আমরা জীবিত আছি"।

আর একথাও বর্ণিত আছে যে হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আহযাবের যুদ্ধের সময় আসে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরীখা খনন করেন, তখন আমি দেখলাম হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং গর্ত থেকে মাটি বের করছেন, তাঁর পেট মোবারকের উপর পর্যন্ত মাটি জমে গেছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেট মোবারকের উপর চুলও ছিল, তখন তিনি এবনে রাওয়াহার রচিত একটি কবিতার পংক্তি পাঠ করছিলেন,

اللهم لولا انت ما اهتدينا ۔ ولا تصدقنا ولا صلينا

"হে আল্লাহ! যদি তোমার তওফিক না হতো তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না, যাকাতও দিতাম না, নামাজও আদায় করতাম না"।

فانزلن سكينة علينا ۔ وثبت الاقدام ان لا قينا

"হে আল্লাহ! আমাদের মনে শান্তি নাজিল কর, আর দুশমনের মোকাবেলায় আমাদেরকে অটল অবিচল রাখ"।

ان الالى قد بغوا علينا ۔ اذا ارادوا فتنة ابينا

"এই লোকেরাই আমাদের উপর জুলুম করেছে, যখন তারা অশান্তি সৃষ্টির ইচ্ছা করে, আমরা তাতে অস্বীকৃতি জানাই"।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) একজন শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, পরীখা খননে তিনি একা দশজনের সমান কাজ করতেন। আর একথাও বর্ণিত আছে, তিনি দৈনিক পাঁচ হাত গভীর এবং পাঁচ হাত লম্বা স্থানে পরীখা খনন করতেন। তাঁর উপর কায়েস এবনে আবি সা'সা নামক এক ব্যক্তির নজর লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কায়েসকে আদেশ দিলেন, 'কোন পাত্রের উপর তুমি অজু কর, আর ঐ পানি দ্বারা সালমানকে গোসল করাও, এরপর ঐ পাত্রটিকে তোমার পেছনে উল্টিয়ে নিক্ষেপ কর'। এ আদেশ পালন করা হয় এবং হযরত সালমান (রাঃ) সুস্থ হন।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা খন্দকের দিন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পরীখা খনন করছিলাম। এর মধ্যে একটি পাথর আসলো, লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসলো, পাথরটির ব্যাপারে কি করা যায় তা জানতে চাইলো। তিনি এরশাদ করলেন, 'আমি নিজেই সেখানে যাব', একথা বলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, তখন ক্ষুধার কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেটে পাথর বাঁধা ছিল, তিন দিন যাবত আমরাও কিছু খেতে পাইনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোদাল হাতে নিয়ে যখন পাথরের উপর আঘাত করলেন তখন পাথর ভেঙ্গে গেল। আমি তখন ঘরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম, তাঁর অনুমতি লাভ করে আমি ঘরে পৌছলাম। আমার স্ত্রীকে বললাম, 'আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে এসেছি, আমি এ অবস্থা সইতে পারিনি, তোমার কাছে কিছু আছে কি?' সে তখন একটি থলে বের করলো, যাতে চার সের যব ছিল, আমাদের একটি বকরীর বাচ্চাও ছিল, আমি তা জবেহ করে দিলাম। স্ত্রী যব থেকে আটা তৈরী করতে ব্যস্ত হলো। যে সময়ে আমি বকরীর গোশ্ত ঠিক করলাম, ততক্ষণে সে-ও আটা তৈরী শেষ করলো, আমি গোশ্তের পাতিল চুলোতে চড়িয়ে দিলাম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

খেদমতে হাযির হলাম। যাওয়ার পূর্বে স্ত্রী বললো, 'বেশী লোক এনে আমাকে অপমানিত করোনা'। আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে চুপিসারে আমার বাড়ীতে দাওয়াতের কথা তাঁকে বললাম, আর একথাও বললাম, 'খাবার অতি সামান্য, আপনার সঙ্গে দু' একজন নিয়ে নিন'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার খাবার কি পরিমাণ'? আমি তখন বলে দিলাম। তিনি এরশাদ করলেন, 'অনেক পবিত্র' এবং আমাকে বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, 'আমার উপস্থিতির পূর্বে চুলা থেকে পাতিল যেন না সরিয়ে রাখে এবং রুটি বানানো শেষ না করে'। এরপর উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে সকলকে বললেন, 'জাবের তোমাদের জন্যে খাবার তৈরী করেছে, তোমরা চল'। আমি তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে গিয়ে বললাম, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকল লোক নিয়ে আসছেন, এখন কি করবো'? স্ত্রী বললেন, 'তোমার সম্পর্কে আল্লাহ পাকের এ হুকুমই রয়েছে', তখন স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি তোমার নিকট খাবারের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন'? আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। তখন স্ত্রী বললেন, 'আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল আমাদের সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন'। যাহোক, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ নিয়ে আসলেন, সাহাবায়ে কেরামকে তিনি বললেন, 'তোমরাও ভেতরে আস তবে খুব ভিড় করবেনা'। আমি আটা এনে সম্মুখে রাখলাম। তিনি একটু মুখের লালা মোবারক দিয়ে দিলেন এবং বরকতের দোয়া করলেন। এরপর তিনি গোশ্তের পাতিলেও মুখের লালা মোবারক দিয়ে বরকতের দোয়া করলেন। এরপর তিনি এরশাদ করেন, 'হে জাবের! তোমার স্ত্রীকে ডাক এবং বল, রান্না শুরু করুক, আর তুমি চুলার উপর পাতিল রেখেই তা থেকে গোশ্ত বের করতে থাক, আর রুটি তৈরী করতে থাক এবং সাহাবাদেরকে দিতে থাক, চুলার উপর রক্ষিত পাত্র ঢেকে রাখ'। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম খাবার গ্রহণ করে তৃপ্তি লাভ করলেন, তাঁদের সংখ্যা তখন এক হাজার ছিল। অথচ সকলেই তৃপ্তি লাভের পর সেখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই, সকলে বিদায় হওয়ার পর দেখা গেল শুরু করার পূর্বে যে পরিমাণ খাবার ছিল পরেও সে পরিমাণই ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জাবেরের (রাঃ) স্ত্রীকে বললেন, 'এবার তুমিও খেয়ে নাও, অন্যদের জন্যেও পাঠিয়ে দাও', অবশেষে তাই করা হল।

এবনে এসহাক (রঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরীখা খননের কাজ সম্পূর্ণ করার পর কোরায়েশরা দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা শরীফে উপস্থিত হয়। আর বনু গাতফান তাদের নজদী সাথীদেরকে নিয়ে ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নেয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিন হাজার মুসলমানকে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নিলেন। পরীখাটি ছিল মুসলমান এবং কাফেরদের মাঝে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তাঁর আদেশক্রমে মুসলমানগণ মহিলা ও শিশুদেরকে পাহাড়ের উপর পৌঁছে দিয়েছিলেন। আল্লাহর দুশমন হাই এবনে আখতাব নজিরী তার ঘর থেকে বের হয়ে কা'ব এবনে আসাদ কারজীর নিকট গমন করলো। কা'ব বণী কোরায়জার তরফ থেকে তার সম্প্রদায়ের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি মৈত্রী

চুক্তি করেছিল। এজন্যে সে তার বাড়ীর ফটক খোলেনি এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ফটক খুলতে অস্বীকার করে। হাইয়ের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও কা'ব তার কথা শোনেনি এবং বলেছে, 'দেখ হাই এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হবে, আমি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ, আমি আমার প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থাতেই ভঙ্গ করবো না। মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তরফ থেকে আমি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গের কোন দৃষ্টান্ত দেখিনি। আমিও কখনো তা করবোনা'। হাই এবনে আখতাব বললো, 'তুমি আমাকে বাইরে রেখে দরজা এজন্যে বন্ধ রেখেছ যে, তোমার আশংকা হলো আমি ভেতরে আসলে তোমার অংশ বন্টন করে ফেলব'। একথা শ্রবণ করে কা'ব অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং ঐ অবস্থায় বাড়ীর ফটক খুলে দিল। হাই ভেতরে প্রবেশ করে বললো, 'কা'ব! আমি সারা পৃথিবীর ইজ্জত নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। জনসমুদ্রকে তার উত্তাল তরঙ্গসহ এখানে একত্রিত করেছি। আমি কোরায়েশদের সকল অধিনায়ক এবং সর্দারদেরকে "মুজতাতামাউল আসবাল" নামক স্থানে অবতরণ করিয়েছি। বণী গাতফানের সকল সর্দার এবং সেনাপতিদেরকে আমি ওহোদ পাহাড়ের পেছনে ক্যাম্প করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তারা সকলে আমার সঙ্গে এ চুক্তি করেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথীদের মূলোৎপাটন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এখান থেকে যাবেনা'।

কা'ব এবনে আসাদ তখন বললো, 'আল্লাহর শপথ! তুমি চিরস্থায়ী অপমান নিয়ে এসেছ, এটি এমন এক মেঘমালা যার পানি ইতোমধ্যে বের হয়ে পড়েছে। এখন এর মধ্যে শুধু বজ্রের গর্জন আর বিদ্যুতের চমক ব্যতীত আর কিছুই রয়নি। তুমি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) ব্যাপারে আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) তরফ থেকে সততা, সত্যবাদিতা এবং অঙ্গীকার রক্ষা করা ব্যতীত কখনো এর বরখেলাফ পাইনি'। হাই তখন কা'বের সম্মুখে নানা যুক্তি পেশ করতে থাকে এবং তাকে প্রতারিত করার প্রয়াস পায়। এরপর কা'বের সম্মুখে আল্লাহ পাকের নামের শপথ করে বলে, 'যদি কোরায়েশরা মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পরাজিত না করে ফেরত চলে যায় তবে তোমার এ প্রাচীরের ভেতরে এসে আমি আশ্রয় গ্রহণ করবো। তোমার যদি কোন দুঃখ হয় তবে তাতে আমি সমান অংশীদার হবো'। এরপর কা'ব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করলো এবং যে ওয়াদা করেছিল তা বিনষ্ট করলো।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আওস গোত্রের নেতা সা'দ এবনে মাআজ আশহালী এবং খাজরাজ গোত্রের নেতা সা'দ এবনে ওবাদা, আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা খাজরাজী এবং খাওয়াত এবনে জুবায়ের ওমরীকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্যে প্রেরণ করলেন এবং তাঁদেরকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেন, 'তোমরা দেখ যে সংবাদ পৌঁছেছে তা সঠিক কি-না। যদি সংবাদ সঠিক হয় তবে আমাকে এমন ভাষায়

জানাও যাতে আমি বুঝি কিন্তু সাধারণ মানুষের সম্মুখে এসব বিষয় প্রকাশ্যে কিছু বলবেনা, যার কারণে তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি হতে পারে, যদি তারা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের উপর অবিচল থাকে তবে তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করতে পার'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ইহুদীদের নিকট গমন করলেন এবং তাদের সম্পর্কে যে সংবাদ ছড়িয়েছিল, তাদের অবস্থা তার চেয়েও মন্দ ছিল দেখলেন। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল এবং পরিস্কার ভাষায় বলেছিল, আমাদের সঙ্গে তাঁর কোন চুক্তি নেই। হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ)-এর মেজাজ একটু কড়া ছিল। তিনি ইহুদীদেরকে মন্দ বলতে শুরু করলেন, তখন সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ) বললেন, 'হে সা'দ এবনে ওবাদা! তাদেরকে গালি দেয়া থেকে বিরত থাক, কেননা তাদের সাথে আমাদের ব্যাপার গালি দেয়ার পর্যায় থেকে অনেক দূরে চলে গেছে'। এরপর তাঁরা সকলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন এবং সালাম দিয়ে আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! এমন রোগ যার কোন ঔষধ নেই। আর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আল্লাহু আকবর, হে মুসলমানগণ! তোমাদের জন্যে সুসংবাদ'।

যাহোক, সাহাবায়ে কেরামের জন্যে পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপদজনক এবং ভয়ের ব্যাপার হয়, দুশমনরা উপরে নিচে, এককথায় চতুর্দিক ঘেরাও করে ফেলে। মুসলমানদের মনে নানা গুঞ্জন সৃষ্টি হয়, কোন কোন মুনাফেক প্রকাশ্যে মন্দ কথা উচ্চারণ করে, এমনকি মা'তাব এবনে কুশাইর ওমরী একথা পর্যন্ত বলে ফেলে, 'মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করছেন যে, তোমরা পারশ্য এবং রোমক সম্রাটের ধন-ভান্ডারের মালিক হবে, অথচ আমাদের অবস্থা এই যে আমরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে জঙ্গলে পর্যন্ত যেতে পারিনা। আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলেন তা ছিল একটি প্রতারণা' (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক)। মুনাফেক আউস এবনে কিবতী বলেছিল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের বাড়ী-ঘরে কোন প্রহরী নেই আর বাড়ী শহরের বাইরে, আমাকে অনুমতি দান করুন, বাড়ীতে ফিরে যাই (অথচ লোকটি এক্ষেত্রে মিথ্যা বলেছিল কেননা তাদের বাড়ী-ঘরে প্রহরার জন্যে তাদের গোত্রের পুরুষদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল)'।

বর্ণিত আছে যে, কা'ব এবনে আসাদ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের অবস্থাই অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, তাদের মধ্যে ছিল জোবায়ের এবনে বলতা, নাবাস এবনে কায়েম, আকাবা এবনে জায়েদ গং। তাদের সকলকে এ সম্পর্কে অবগত করে। তারা এ খবর শ্রবণ করা মাত্র তাকে অত্যন্ত তিরস্কার করে। তারা চুক্তি-ভঙ্গ করাকে আদৌ পছন্দ করেনি, তখন কা'ব তার কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত হয় কিন্তু ঐ সময়ের লজ্জা তার জন্যে উপকারী হয়নি। কেননা বিষয়টি তখন আর তার আওতাধীন ছিলনা, আল্লাহ পাক এ কারণেই বণী কোরায়জা গোত্রকে ধ্বংস করে দেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত জোবায়ের এবনুল আওয়াম (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন এরশাদ করলেন, এমন কেউ আছে কি যে, বণী কোরায়জার খরর এনে আমাকে পৌঁছাতে পারে।

একথা শ্রবণ করে আমি সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হলাম। ফিরে এসে বণী কোরায়জার খবর সমূহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দেই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তোমার উপর আমার পিতা-মাতা কোরবান। হযরত সা'দ এবনে মাআজ এবং হযরত সা'দ এবনে ওবাদাকেও প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে প্রেরণ করা হয়, তাঁদের প্রত্যাবর্তনের পর বণী কোরায়জার প্রস্তুতির অবস্থা জানার জন্যে হযরত জোবায়ের (রাঃ)-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি তাদের অবস্থা দেখে এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন এবং বললেন, 'তারা তাদের দুর্গ মেরামত করছে, পথ এবং সীমান্ত বন্ধ করছে, চতুঃস্পদ জন্তুগুলোকে একস্থানে একত্রিত করছে', এ খবর পেয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (আন্তরিক বন্ধু) হয়, আমার হাওয়ারী হলো জোবায়ের'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, প্রায় বিশ দিনের অধিক সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের মুখোমুখি অবস্থায় থাকেন। এর মধ্যে তীর এবং পাথর বিনিময় হতো। শুধু কোরায়েশের কয়েকজন অশ্বারোহী যেমন একরামা এবনে আবু জেহেল মখজুমী, হোবায়রা এবনে ওহাব মখজুমী, নওফেল এবনে আবদুল্লাহ, জেরার এবনে খেতাব, মিরদাস এবনে লুআই গং বণী কেনানার নিকট গমন করে তাদেরকে বলে, প্রস্তুত হও, আজ প্রমাণিত হবে কে প্রকৃত বীর, এরপর পরীখার কথা উল্লেখ করে বলে যে আল্লাহর শপথ! এমন ব্যবস্থা ইতিপূর্বে আরবরা কখনো করেনি।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আমর এবনে আবদুদ যে একা এক হাজার অশ্বারোহীর মোকাবেলা করতো, কোরায়েশরা এ যুদ্ধে তাকেও নিয়ে এসেছিল। সে হুংকার দেয়-

هل من مبارز

"আছে কেউ এমন যে আমার সাথে লড়তে পারে"?

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর তরবারীটি হযরত আলীকে (রাঃ) দান করেন। হযরত আলী (রাঃ) পরীখা অতিক্রম করে তার মোকাবেলায় যখন আসলেন, সে দেখল, হযরত আলী (রাঃ) অত্যন্ত অল্প বয়স্ক যুবক, তাই সে বললো! হে ভ্রাতস্পুত্র! 'তোমাকে আমি হত্যা করতে চাইনা', হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'আমি কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইনা, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই, আর আমি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাই'। সে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৯৯-৩০৮

বললো, 'আমার এর প্রয়োজন নেই', সে আরো বললো, 'তুমি আক্রমণ কর', হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'মুসলমান প্রথমে আক্রমণ করেনা'। এরপর সে আঘাত করলো, হযরত আলী (রাঃ) তাঁর ঢাল দিয়ে তার আঘাত ফিরিয়ে দিলেন। এরপর হযরত আলী (রাঃ) এত জোরে তার উপর আঘাত হানলেন যে, তার ঢালটি দু'ভাগ হয়ে তার বক্ষদেশ পর্যন্ত দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে তার সঙ্গে যে ক'জন ছিল সকলেই পলায়নে বাধ্য হলো। নওফেল এবনে আবদুল্লাহ এবনে মগীরা মখজুমী যখন পরীখায় অবতরণ করলো তখন মুসলমানগণ উপর থেকে বৃষ্টির ন্যায় প্রস্তর বর্ষণ করলো, তখন সে চিৎকার করে বললো, 'হে আরব জাতি! যুদ্ধের এ কেমন পন্থা'! একথা শ্রবণ করে হযরত আলী (রাঃ) দ্রুত তার মুখোমুখি হলেন্ এবং ক্ষণিকের মধ্যে তাকে হত্যা করলেন। এভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বিপর্যয় ঘটতে লাগল। কাফেররা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ পয়গাম প্রেরণ করলো যে, যদি আমাদেরকে আবদুল্লাহর লাশ ফেরত দেয়া হয় তবে আমরা তার মূল্য আদায় করতে রাজী আছি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'আমরা মৃত লাশের মূল্য গ্রহণ করিনা, তোমাদের লাশ তোমরা বিনামূল্যে নিয়ে যাও'। এরপর তাঁর অনুমতি লাভ করে তারা লাশ নিয়ে গেল।[১]

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা বণী হারেসার দুর্গে ছিলাম। এটি ছিল অত্যন্ত সংরক্ষিত দুর্গ, সা'দ এবনে মাআজও (রাঃ) আমাদের সঙ্গে ঐ দুর্গেই ছিলেন, এ ঘটনা পর্দার আদেশ নাজিল হবার পূর্বে ঘটেছিল। সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ) ক্ষুদ্রাকারের একটি বর্ম পরিধান করে বের হয়েছিলেন, তাঁর হাতগুলো উন্মুক্ত ছিল, আর এক হাতে একটি বর্শা ছিল, আর একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন যার মর্ম এই,

'যদি আমার উষ্ট্র যুদ্ধ পেয়ে যেত তবে কত ভাল হতো'!

'মৃত্যুর সময় তো নির্ধারিত আছেই, আমার মরণের কোন ভয় নেই'।

সা'দের মাতা বললেন, 'বৎস! দ্রুত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হও, তুমি বিলম্ব করে ফেলেছ, পেছনে পড়ে যাবে তুমি'। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন বললাম, 'হে সা'দের মাতা! সা'দ অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকারের বর্ম পরে রয়েছে, আমার আশংকা হয় যে, তার উন্মুক্ত হাতের উপর কোন তীর নিক্ষিপ্ত না হয়, তার উচিত বড় আকারের বর্ম ব্যবহার করা'। সা'দের মাতা বললেন, 'যা আল্লাহ পাকের হুকুম হবে তাই হবে'। অবশেষে সা'দের দেহে একটি তীর বিদ্ধ হলো। তাতে তাঁর একটি রগ কেটে গেল। এ তীরটি নিক্ষেপ করেছিল হাইয়ান এবনে কায়েস গারফা আমেরী। সা'দ তাকে এভাবে বদদোয়া দিলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে দোযখে পৌঁছে

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৫৫-৫৬
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩০৯-১০

দাও'। এরপর এভাবে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! যদি তুমি ভবিষ্যতেও কোরায়েশের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যবস্থা রাখ তবে আমাকে সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে জীবিত রাখ। কেননা কোন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করার আমার এত আকাংক্ষা নেই, যতটা কোরায়েশের সঙ্গে রয়েছে, কেননা তারা তোমার প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে মিথ্যা-জ্ঞান করেছে ও তাঁকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। আর যদি আমাদের এবং কোরায়েশদের যুদ্ধ এখানেই শেষ করা তোমার মর্জি হয় তবে এ ক্ষতকেই আমার শাহাদতের কারণ বানিয়ে দাও। কিন্তু বণী কোরায়জার ধ্বংস দেখে আমার অন্তর শীতল না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর'।

উল্লেখ্য প্রাক-ইসলামী যুগে হযরত সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ)-এর গোত্র এবং বণু কোরায়জা পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

মুজাহেদ এবং মোহাম্মদ এবনে এসহাক, ইয়াহইয়া এবনে এবাদ এবনে আবদুল্লাহ, এবনে জুবায়ের এবাদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত সফীয়্যা বিনতে আবদুল মোত্তালেব বর্ণনা করেন, আমরা হাস্‌সান এবনে সাবেত সহ একই দুর্গে ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, জনৈক ইহুদী দুর্গের কাছে ঘোরাফেরা করছে, তখন ইহুদীদের সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। হযরত রসূলুল্লাহ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি আমাদের দিকে আসতে পারছেন না। এমন অবস্থায় এ ইহুদী হয়তো কোন চক্রান্ত করতে পারে। আমি তখন হাস্‌সানকে বললাম, 'তুমি লক্ষ্য করছো, একজন ইহুদী এখানে ঘোরাফেরা করছে, আমার আশংকা হচ্ছে সে অন্য ইহুদীদের এখানে নিয়ে আসবে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুশমনের মুখোমুখি রয়েছেন, তিনি এসে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন না, অতএব তুমি বের হও এবং ইহুদীটিকে হত্যা কর'। হাস্‌সান বললেন, 'হে আবদুল মোত্তালেবের কন্যা! আল্লাহ পাক আপনাকে মাফ করুন, আপনি তো জানেন আমি এ কাজটি করার যোগ্য নই'। আমি এ জবাব শ্রবণ করে উপলব্ধি করলাম যে হাস্‌সানের ভেতর ইহুদীকে হত্যা করার সাহস নেই, তখন আমি তাঁবুর একটি কাষ্ঠ খন্ড হাতে নিলাম এবং ঐ ইহুদীর গর্দানে এমন প্রচন্ড আঘাত করলাম যে সে নিহত হলো। তার কাজ শেষ করার পর আমি দুর্গে প্রত্যাবর্তন করে হাস্‌সানকে বললাম, 'এখন তুমি গিয়ে তার পোশাক এবং হাতিয়ার খুলে নাও, এ কাজ আমি করতে পারিনা'। হাস্‌সান বললেন, 'তার আসবাব পত্রের আমার প্রয়োজন নেই'।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদী গোত্র বণু কোরায়জার লোকেরা রাতের অন্ধকারে মদীনার উপর হামলা করতে চেয়েছিল এবং এজন্যে কোরায়েশদের সাহায্য কামনা করেছে। ইহুদীদের এ চক্রান্তের খবর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলো তখন তিনি সালমা এবনে আসলামের নেতৃত্বে দু'শত লোক এবং যায়েদ এবনে হারেসার নেতৃত্বে তিনশত লোককে মদীনা শরীফের হেফাজতের দায়িত্ব অর্পণ

করলেন। আর একথাও বর্ণিত আছে যে এব্বাদ এবনে বশীর (রাঃ) তাঁর সাথীদের নিয়ে প্রত্যেক রাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাঁবুর প্রহরায় থাকতেন। মুশরেকরা পরীখা পার হওয়ার চেষ্টা করতো কিন্তু মুসলমানগণ তাদের উপর পাথর এবং তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে বাধা দিতেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ বিষয় দেখাশুনা করতেন।

মুসলিম ও বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়্যারায় আগমন করে এক রাত জাগ্রত ছিলেন এবং এরশাদ করেন, 'যদি এমন একজন নেককার লোক থাকতো এবং প্রহরায় রত হতো', একটু পরে হঠাৎ আমরা অস্ত্র-শস্ত্রের শব্দ শ্রবণ করলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?' জবাব আসলো, 'সা'দ'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এসেছো'? হযরত সা'দ (রাঃ) বললেন, আমার অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে একটু আশংকা হলো, তাই আমি প্রহরায় রত হওয়ার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে হাযির হলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দের জন্যে দোয়া করলেন, এরপর তিনি নিদ্রিত হলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, পরীখায় এমন একটি স্থান ছিল যেখানে কাফেরদের পরীখা অতিক্রম করার আশংকা ছিল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ স্থানটির প্রহরার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিলেন। শীতের তীব্রতার কারণে কখনো আমাদের নিকট এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় তিনি ঐ স্থানে চলে যেতেন। আর একথাও এরশাদ করতেন, 'এ স্থানটির ব্যাপারেই আমার আশংকা যে দুশমন এদিক দিয়ে প্রবেশ করতে পারে'। একবার তিনি আমার নিকট আগমন করলেন ক্ষণিকের জন্যে বিশ্রাম করতে, তখন এরশাদ করলেন, 'যদি আজ রাত কেউ আমার স্থলে প্রহরায় রত থাকত, তাহলে আমি নিদ্রিত হতে পারতাম'। ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত্রের শব্দ শ্রবণ করলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?' জবাব আসল, সা'দ। সা'দ বললেন, 'আমরা এ স্থানে পাহারা দিচ্ছি'। এ জবাব শ্রবণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিদ্রিত হলেন এমনকি, আমি তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং প্রহরারত থাকতেন। তুহীন শীত ছিল তখন। এক রাতে তিনি নামাজ আদায় করলেন, এরপর প্রহরায় রত হয়ে এরশাদ করলেন, 'মুশরেকদের কিছু অশ্বারোহী পরীখার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে', এরপর এবাদ এবনে বশীরকে ডাকলেন, তিনি জবাব দিলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! হাযির'। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নিকট আর কেউ আছে কি?' এবাদ (রাঃ) বললেন, 'জ্বী-হ্যাঁ, আমার গোত্রের কিছু লোক প্রহরায় রত রয়েছে'। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'তোমার গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে যাও, পরীখার কাছে কিছু মুশরেক রয়েছে, তারা রাতে হামলা করতে চায়, তোমরা তাদের চক্রান্ত নস্যাত করে দাও এবং তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য কর'। এবাদ

(রাঃ) তাঁর লোকদেরকে নিয়ে খন্দকের দিকে গমন করলেন। তিনি দেখলেন, আবু সুফিয়ান এবং তার কিছু মুশরেক সঙ্গী পরীখার সংকীর্ণ স্থান দিয়ে ঢুকে পড়েছে এবং মুসলমানগণ তাদেরকে তীর মেরে এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করে বাধা দিচ্ছে। এবাদ (রাঃ) তখন সেখানে পৌঁছলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি অন্য মুসলমানদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কাফেরদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করলাম, অবশেষে তারা পলায়নে বাধ্য হলো। এরপর আমি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলাম। তিনি তখন নামাজে রত ছিলেন। নামাজ শেষে আমি ঘটনা বর্ণনা করলাম।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিদ্রিত হলেন। এমনকি, আমি তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দও শ্রবণ করলাম। হযরত বেলাল (রাঃ)-এর ফজরের আযান দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিদ্রিত ছিলেন। আযানের পর তিনি বাইরে তশরিফ আনলেন এবং সকলকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। উম্মে সালমা (রাঃ) তখন বললেন, 'হে আল্লাহ! এবাদ এবনে বশীরের প্রতি রহমত নাজিল করুন'।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরো বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, অর্ধেক রাত অতিবাহিত হবার পর কিছু শব্দ শ্রুত হলো, আমি শ্রবণ করলাম, লোকেরা বলছে, 'হে আল্লাহর অশ্বারোহীগণ! তোমরা আরোহন কর'। এ জেহাদে এটিই ছিল মোহাজেরদের শ্লোগান।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'কাফেররা যদি রাতে তোমাদের উপর হামলা করে তবে তোমাদের বিশেষ শ্লোগান হবে, حٰمٓ لا ينصرون দু'টি বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, এ শ্লোগানটি ছিল আনসারদের আর পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে তা ছিল মোহাজেরদের। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে তাঁবুর বাইরে তশরীফ আনলেন এবং লক্ষ্য করলেন, কিছু লোক তাঁর তাঁবুর পার্শ্বে প্রহরায় রত রয়েছে। তন্মধ্যে এবাদ এবনে বশীরও (রাঃ) ছিলেন। তখন তিনি এবাদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ শব্দগুলো কিসের ছিল'? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবাদকে নির্দেশ দিলেন এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁকে জানাতে। এবাদ (রাঃ) চলে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময় তিনি ফিরে আসলেন এবং আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! কাফেরদের একটি দল মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করছে'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁবুর ভেতর তশরীফ নিলেন এবং অস্ত্র হাতে নিয়ে অশ্বে আরোহন করলেন ও সাহাবায়ে কেরামের একটি দল নিয়ে রণাঙ্গণের দিকে রওয়ানা হলেন। অল্পক্ষণ পরই তিনি ফিরে আসলেন এবং এরশাদ করলেন, 'আল্লাহর শোকর যে তিনি দুশমনদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তাদের অনেকেই আহত অবস্থায় পলায়ন করেছে'। এরপর তিনি বিশ্রাম করলেন, কিছুক্ষণের জন্যে তিনি নিদ্রিত হলেন, তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ হতে লাগল। এরপর পুনরায় কিছুটা শোরগোল শ্রুত হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন। এবাদ (রাঃ)-কে বললেন, দেখ কি কারণে

শোরগোল হচ্ছেঃ এবাদ (রাঃ) সেদিকে চলে গেলেন এবং ফিরে এসে আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! জেরার এবনে খেতাব মুশরেকদের একটি দল নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে তীর এবং পাথর মেরে যুদ্ধ করছে'। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তাঁবু থেকে বের হয়ে আসলেন এবং কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধরত হলেন, এ অবস্থায় রাত্রি ভোর হলো। তিনি এরশাদ করলেন, 'কাফেররা আহত হয়ে পলায়ন করেছে'।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি মারিসা, খায়বর, হোনায়েন এবং মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ সমূহে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের ন্যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে এত কঠিন কোন যুদ্ধ ছিলনা। এ যুদ্ধে মুসলমানদের অনেকেই আহত ছিলেন, সময় ছিল প্রচন্ড শীতের, আর্থিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত মন্দ। যখন মুসলমানদের কষ্ট চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন, আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেন।

বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আহযাবের যুদ্ধে সমবেত কাফেরদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেন, তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! হে কিতাব নাজিলকারী! হে অতি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী! এ দলগুলোকে পরাজিত কর'।

হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হানাদার কাফেরদের বিরুদ্ধে একাধারে তিন দিন বদদোয়া করেন। আর কোন কোন বর্ণনায় একথাও রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার বদ দোয়া করেন। বুধবার দিন জোহর এবং আসরের মধ্যে আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেন, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারার মধ্যে আমরা তখন খুশীর ভাব লক্ষ্য করেছি।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এরপর নাঈম এবনে মাসউদ এবনে আমের এবনে গাতফান গোপনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি মুসলমান হয়ে গেছি কিন্তু আমার সম্প্রদায় এ সম্পর্কে অবগত নয়, এ অবস্থায় আপনি যা ইচ্ছা আদেশ করতে পারেন, আমি সে আদেশ পালন করবো'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'তুমি আমাদের দলে একা, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে একটি কাজ তুমি করতে পার, তা হলো একত্রিত বিভিন্ন দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দাও, যাতে করে তারা এ যুদ্ধ থেকে বিরত হয় এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে একে অন্যকে সাহায্য না করে, কেননা, যুদ্ধ নামই হলো গোপন কৌশলের'।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, নাঈম আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি যেন যা ইচ্ছা তা বলতে পারি'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার অনুমতি দান করলেন। এরপর নাঈম বণী কোরায়জার নিকট গমন করলেন।

প্রাক-ইসলামী যুগে তাদের সাথে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব। নাঈম বণী কোরায়জাকে বললেন, 'তোমরা ভাল করেই জান, আমি তোমাদের বন্ধু'। বণী কোরায়জা বললো, 'তুমি ঠিক বলেছো, আমাদের দৃষ্টিতে তুমি সন্দেহভাজন লোক নও'। নাঈম বললেন, 'তাহলে শোন, কোরায়েশ এবং গাতফান যুদ্ধের জন্যে এসেছে, তোমরা তাদের সাহায্যকারী কিন্তু তাদের অবস্থা তোমাদের অবস্থার ন্যায় নয়, এ শহর তোমাদের, এখানে রয়েছে তোমাদের অর্থ-সম্পদ, রয়েছে তোমাদের পরিবারবর্গ, তোমরা তাদেরকে ছেড়ে অন্য শহরে যেতে পারবেনা। কোরায়েশ এবং গাতফান এখানকার অধিবাসী নয়, তাদের অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতি এখান থেকে অনেক দূরে, যদি যুদ্ধে সাফল্য লাভ হয় তবে তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে চলে যাবে, আর যদি তা না হয় তবে এমনিতেই চলে যাবে। আর তোমাদেরকে এই ব্যক্তির মোকাবেলায় একা ছেড়ে যাবে, এই ব্যক্তি তোমাদেরই শহরের অধিবাসী, তোমরা একা তাঁর মোকাবেলা করতে সক্ষম নও, অতএব উচিত হলো আস্থা স্থাপনের জন্যে কোরায়েশদের কিছু সর্দারকে রেহান স্বরূপ তোমাদের কাছে রেখে দাও, যাতে তারা তোমাদেরকে একা ফেলে পলায়ন না করে, যদি তারা তা করে তবে তাদের সাথে মিলে মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আর যদি তারা তা না করে তবে এ সত্য উপলব্ধি কর যে তাদের নিয়ত ভাল নয়'। বণী কোরায়জা বললো, 'তুমি সঠিক পরামর্শ দিয়েছ'। এরপর নাঈম কোরায়েশের নিকট গমন করেন। আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কোরায়েশী সর্দারকে তিনি বলেন, 'তোমরা জান যে আমি তোমাদের বন্ধু, আর মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে আমি যে মত পোষণ করি, সে সম্পর্কেও তোমরা অবগত রয়েছ। আমি তোমাদের কল্যাণার্থে একটি সংবাদ তোমাদেরকে পৌঁছে দেয়া আমার একান্ত কর্তব্য মনে করি কিন্তু আপাতত এসব কথা তোমরা গোপন রেখো', কোরায়েশরা বললো 'আমরা তাই করব'।

'তোমরা হয়তো জান, ইহুদীরা এখন তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত অনুতপ্ত। মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিকট তারা এ পয়গাম পাঠিয়েছে যে, আমরা যা কিছু করেছি,তার জন্যে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, লজ্জিত। তবে আমরা এর ক্ষতিপূরণ করতে চাই। আমরা কোরায়েশ এবং গাতফান গোত্রের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে আপনার হাতে তুলে দিতে চাই যেন আপনি তাদেরকে হত্যা করেন। আপনি কি তাতে রাজী হবেন? এরপর আমরা আপনার সঙ্গে মিলে অবশ্যই লোকদের মোকাবেলা করবো। মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জবাবে এ প্রস্তাবকে উত্তম বলেছেন। (অর্থাৎ আমরা এ শর্তে তোমাদের সাথে মীমাংসা করতে প্রস্তুত রয়েছি) অতএব, যদি ইহুদীরা তোমাদের নিকট এ পয়গাম প্রেরণ করে আর তোমাদের সরদারদেরকে তাদের নিকট বন্ধক রূপে রাখতে চায় তবে তোমাদের একটি লোকও তাদের নিকট সোপর্দ করবেনা'। এরপর নাঈম গাতফান গোত্রের নিকট গিয়ে বলেন, 'হে গাতফান গোত্রের লোকেরা! আমরা একই গোত্রের লোক। আর তোমরা আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমরা আশা করি তোমরা আমাদেরকে সন্দেহভাজন মনে করবেনা। গাতফান জবাব দিল, 'তুমি ঠিকই বলেছো' (অর্থাৎ তুমি আমাদের প্রকৃত বন্ধু)।

নাঈম বললেন, 'তবে কি, কথা যা বলবো গোপন রাখবে'।

এরপর নাঈম গাতফানকে সে-কথাই বলেন যা ইতিপূর্বে কোরায়েশকে বলেছেন এবং তাদের নিকট সে আশংকাই ব্যক্ত করেন যা কোরায়েশের নিকট করেছেন।

হিজরী পাঁচ, মাস শওয়াল, শনিবার দিবাগত রাতে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রসূলকে এভাবে সাহায্য করেছেনঃ আবু সুফিয়ান ওয়ারাকা এবনে গাতফান, একরামা এবনে আবু জেহেলের সাথে গাতফান গোত্র এবং কোরায়েশের আরও কয়েকজনকে বণী কোরায়জার নিকট প্রেরণ করে। তারা গিয়ে বণী কোরায়জাকে বলে, 'আমরা এখানে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্যে আসিনি। আমাদের উষ্ট্র এবং অশ্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনারা যুদ্ধের জন্যে তৈরী হোন যাতে করে আমরা রীতিমত বের হয়ে মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি এবং সে ঝগড়া থেকে নিস্কৃতি পেতে পারি যা তাঁর সাথে বিদ্যমান রয়েছে'।

এরপর ইহুদীরা এ পয়গাম পাঠালোঃ 'আজ শনিবার। শনিবার দিন আমরা কোন কাজ করিনা। আমাদের মধ্যে কিছু লোক শনিবারের দিন কিছু বেদআতের কাজ করেছিল যার দরুণ তারা যে শাস্তি পেয়েছিল তা তোমাদের কাছে গোপন নেই। আর একটি কথা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নিকট তোমরা কিছু লোক বন্ধক স্বরূপ না রাখবে ততক্ষণ আমরা তোমাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করবো না। তোমরা যদি তা কর তবে আমরা তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আমাদের আশংকা হচ্ছে, যদি যুদ্ধে তোমাদের ক্ষতি হয় এবং যুদ্ধ ঘোরতর হয় তখন তোমরা আমাদেরকে ছেড়ে তোমাদের বাড়ী–ঘরে চলে যাবে, আর আমরা এখানে থাকবো; অথচ তাদের সঙ্গে আমরা একা যুদ্ধ করতে পারবো না'।

বণী কোরায়জার এ জবাব নিয়ে প্রতিনিধি দল যখন প্রত্যাবর্তন করলো তখন কোরায়েশ এবং গাতফানের লোকেরা বললো, 'তোমাদের জানা উচিত নাঈম এবনে মাসউদ যা বলেছিল তা সম্পূর্ণ সঠিক'। এরপর তারা বনু কোরায়জাকে সাফ জানিয়ে দেয়, 'আমরা আমাদের একজন লোককেও তোমাদের নিকট সমর্পণ করবোনা, তোমাদের এ শর্ত মানবোনা, যদি নিঃশর্তে যুদ্ধ করতে রাজি হও তবে বের হয়ে আস'।

এ খবর পেয়ে বণু কোরায়জার লোকেরা বললো, 'নাঈম এবনে মাসউদ যা বলেছিল তা ঠিকই বলেছে। এরা চায় যদি বিজয় হয় তবে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ ভোগ করবে, অন্যথায় মালপত্র গুটিয়ে তারা বাড়ী চলে যাবে, আর তোমাদেরকে এই ব্যক্তির মোকাবেলায় একা ছেড়ে যাবে'। তাই বণী কোরায়জা কোরায়েশ ও গাতফানের পয়গামের প্রতি-উত্তরে জানিয়ে দেয় যে আমাদের মনের সান্ত্বনার জন্যে তোমাদের কয়েকজন সর্দারকে অবশ্যই বন্ধক হিসেবে রেখে দিতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করবো না। কোরায়েশরা তাদের এ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করলো। এভাবে আল্লাহ্ পাক তাদের পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করলেন। তুহীন শীতের রাত ছিল। আল্লাহ পাক এর উপর ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করলেন। তাদের চুলোয় যে পাতিলগুলো চড়ানো

হয়েছিল তা উল্টে গেল এবং তাদের তৈজসপত্রগুলো এদিক সেদিক নিক্ষিপ্ত হলো।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের মতবিরোধের খবর পেয়েছিলেন। তাই তিনি হোজায়ফা এবনে ইয়ামান (রাঃ)-কে রাতের ঘটনা সম্পর্কে খবর সংগ্রহের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক যায়েদ এবনে যিয়াদের সূত্রে মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আহযাবের যুদ্ধের এক রাত্রে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, শীতের তীব্রতা ছিল বর্ণনাতীত। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'এমন কেউ আছে কি, যে আমাদের জন্যে তাদের খবর নিয়ে আসবে, যে এ কাজটি করবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'। একথা শ্রবণ করেও আমাদের মধ্য থেকে কেউ উঠলো না। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত নামাজ পড়তে লাগলেন। নামাজ শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসে ঐ কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু সকলেই নীরব ছিল, আমাদের মধ্য থেকে কেউ উঠলোনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় অনেকক্ষণ নামাজ পড়তে থাকলেন, এরপর বললেন, যে ব্যক্তি যাবে এবং আমাদের কাছে এসে কাফেরদের কথা বলবে যে তারা কি কি করছে, সে জান্নাতে আমার সাথী হবে। একথা শ্রবণ করেও কেউ উঠলো না। শীতের তীব্রতা, ক্ষুধার জ্বালা এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা, এসব কারণেই কেউ উঠছেনা। ঐ অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তলব করে বললেন, হোজায়ফা! তখন আমার আর না উঠে উপায় ছিল না। আমি আরজ করলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হাযির'। শীতের কারণে আমার পাঁজর দু'টি কাঁপছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় এবং চেহারায় হাত বুলিয়ে দিলেন, এরপর এরশাদ করলেন, 'কাফেরদের নিকট গিয়ে তাদের খবর নিয়ে আস কিন্তু আমার নিকট পৌঁছার পূর্বে কারো সঙ্গে লড়াই করোনা'। এরপর আমার জন্যে এভাবে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! অগ্র-পশ্চাতে, ডানে-বামে, উপরে এবং নিচ থেকে তাকে তোমার হেফাজতে রেখে দিও'। আমি আমার তীর এবং অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে রওয়ানা হলাম। বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম শীত দূরীভূত হয়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম এবং দুশমনদের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আল্লাহ পাকের হুকুমে তাদের উপর ঝড়ো হাওয়া এবং গায়বী সৈন্য বাহিনী এসে পড়েছিল, আল্লাহ পাকের এ সৈন্যরা তাদের সঙ্গে এ ব্যবহার করেছেন যে, তাদের চুলোর উপর থেকে পাতিলগুলো এবং চুলোর মধ্যের আগুন এবং তাদের সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিয়েছিলেন। আগুনের উত্তাপে বসেছিল আবু সুফিয়ান। আমি তীর বের করলাম এবং তাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেছিলাম। যদি আমি তীর নিক্ষেপ করতাম তবে ঠিক তার গায়েই লাগতো কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা মনে পড়লো, তিনি এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। তাই আমি তীরটি যথাস্থানে রেখে দিলাম। আবু সুফিয়ান এ ধ্বংসলীলা দেখে বললো, 'হে কোরায়েশ গোত্র! তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে তার সঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তির হাত ধরে রাখ এবং দেখ সে কে? যাতে করে শত্রুর কোন চর প্রবেশ

করতে না পারে'। আমি তখন আমার সঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তিটির হাত ধরে ফেললাম, আর জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কে?' সে জবাব দিল, 'সোবহানাল্লাহ! আমি অমুকের ছেলে অমুক, হাওয়াজেন গোত্রের লোক'। আবু সুফিয়ান বললো, 'হে কোরায়েশ গোত্র! এটি আমাদের আবাসস্থল নয়, অর্থাৎ সর্বদা আমরা এখানে থাকবোনা, এদিকে আমাদের উষ্ট্র এবং অশ্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। বণী কোরায়জা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা এমন পয়গাম পাঠিয়েছে যা আমাদের নিকট অপছন্দনীয়। অন্যদিকে ঝড়-তুফানের কারণে আমাদের যে দুর্গতি হয়েছে তা তোমরা দেখছো। অতএব, আমরা এখান থেকে চলে যাব, আমি তো এখনই রওয়ানা হচ্ছি', এরপর আবু সুফিয়ান উঠে দাঁড়াল, উষ্ট্রের নিকট পৌঁছল, উষ্ট্রের পা বাঁধা ছিল, আবু সুফিয়ান তার উপর আরোহণ করলো এবং উষ্ট্রকে প্রহার করতে শুরু করলো।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি শুনলাম কোরায়েশরা যে পন্থা অবলম্বন করলো গাতফান গোত্রের লোকেরাও তাই করলো এবং তারাও প্রত্যাবর্তন করতে লাগলো। এমন অবস্থায় আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলাম। সামান্য শীতও অনুভব করলাম না। আমি এমন সময় হাযির হলাম যখন তিনি নামাজে রত ছিলেন। যখন তিনি নামাজের সালাম ফেরালেন তখন তাঁর খেদমতে আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাসলেন, অন্ধকার রাতেও তাঁর দাঁত মোবারক দেখা গেল। যখন আমি তাঁর খেদমতে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম তখন পূর্বের ন্যায় পুনরায় প্রচন্ড শীত অনুভব করলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর কদম মোবারকের কাছে টেনে আনলেন, তাঁর চাদরের কিছু অংশ আমার উপর রাখলেন, আমার বক্ষের উপর তাঁর কদম মোবারকের তালু রাখলেন। এভাবে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ভোর হলো তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'হে নিদ্রাগামী! এবার ওঠ'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এবনে জরীর কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন মুশরেকদের উপর আল্লাহ পাক ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করলেন, আর ফেরেশতাগণ 'আল্লাহু আকবর' বলতে লাগলেন তখন তলিহা এবনে খোয়াইলাদ আসাদী বললো, 'হে লোক সকল! মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের উপর যাদু করা শুরু করেছে, অতএব অতি দ্রুত এখান থেকে পালিয়ে যাও'। একথা শ্রবণ করে যুদ্ধ ব্যতীতই সকলে পলায়ন করলো।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ সম্পর্কে একটি কথা লিখেছেন, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রহমতুল্লিল আলামীন না হতেন, তবে সেদিনের ঝড়ো হাওয়া প্রত্যেকটি কাফেরকে খন্ড-বিখন্ড না করে ছাড়তো না, যেমন হয়েছিল আদ জাতির পরিণতি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন কাফেরদের অবস্থা দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাবর্তন

করছিলাম। তখন পথিমধ্যে দেখলাম, বিশজন অশ্বারোহী, তাঁদের মাথায় সাদা আমামা ছিল, তাঁরা আমাকে বললেন, 'তোমাদের সাথীকে এ সংবাদ দিও, আল্লাহ্ পাক আপনার কাজ করে দিয়েছেন এবং দুশমনকে হটিয়ে দিয়েছেন'।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, আহ্যাবের যুদ্ধের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'কে আমাকে কাফেরদের সৈন্যদের খবর এনে দিতে পারে?'

তখন হযরত জোবায়ের (রাঃ) বললেন, আমি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন, তাদের খবর কে আমাকে এনে দিতে পারে? তখনও হযরত জোবায়ের (রাঃ) বললেন, আমি। তৃতীয়বার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কে আমাকে তাদের খবর এনে দিতে পারে? হযরত জোবায়ের (রাঃ) বললেন, আমি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (প্রকৃত বন্ধু) থাকে, আমার হাওয়ারী হলো জোবায়ের (রাঃ)'।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত সোলায়মান এবনে সারদ বলেছেন, কাফেরদের দলগুলো যখন একের পর এক (আহ্যাবের যুদ্ধের দিন) চলে গেল তখন আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আগামীতে আমরা জেহাদ করতে যাবো, তারা আর এখানে এসে যুদ্ধ করবেনা, আমরাই তাদের দিকে যাব'।

বোখারী শরীফে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন জেহাদ থেকে অথবা হজ্জ বা ওমরাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে শহরে পৌঁছতেন তখন তিন বার 'আল্লাহু আকবর' বলে এ দোয়াটি পাঠ করতেনঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

"এক আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই ক্ষমতা, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্যে, সব কিছুর উপর তাঁরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী; আমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী করি, আমরা শুধু তাঁকেই সেজদা করি, আমরা সকলে তাঁরই প্রশংসাকারী, আল্লাহ্ পাক তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন, তাঁর বন্দাকে বিজয়ী করেছেন আর সমস্ত দলকে তিনি পরাজিত করেছেন"।

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধে ছয়জন মুসলমান শহীদ হয়েছেন এবং ছয় কাফের নিহত হয়েছে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩০৯-১০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৮০-৮৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দালভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭২-৭৬

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ

অর্থাৎ হানাদার কাফের বাহিনী যখন তোমাদের ওপর দিক থেকে এসেছে তথা পূর্ব দিক থেকে এসেছে। এরা ছিল বণী আসাদ, বণী গাতফান এবং বণী কোরায়জার লোকেরা। মালেক এবনে আউল নজরী, ওয়াইনা এবনে হুসাইন ফাজারী এক হাজার গাতফানী লোক নিয়ে পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে। এদিকে বণী আসাদ গোত্রের লোকেরা তলিহা এবনে খোয়াইলাদের নেতৃত্বে সেখানে উপস্থিত ছিল। আর বণী কোরায়জা গোত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছিল হাই এবনে আখতাব।

وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

আর নিম্ন দিক থেকে অর্থাৎ বাতনে ওয়াদী থেকে (পশ্চিম দিক থেকে) দুশমনরা আক্রমণ করেছিল। এ আক্রমণকারীরা হলো বণী কেনানা এবং কোরায়েশ। এদের সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। আর আবুল আ'ওয়ার আমর এবনে সুফিয়ান সালামী পরীখার দিকে মোতায়েন ছিল। এভাবে দুশমনেরা মদীনা মুনাওয়্যারা আক্রমণ করেছিল। আর পরবর্তী আয়াতে এ যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এভাবেঃ

وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

অর্থাৎ যখন তোমাদের চক্ষু-সমূহ বিস্ফারিত হয়েছিল আর তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ পাক সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা পোষণ করছিলে।

মূলতঃ এ বাক্যে তখনকার ভয়াবহ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ভয়ে-আতংকে একান্ত আপনজনও যখন চোখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কাটিয়ে চলতে চায়, শুধু তাই নয়, তখন এত বেশী ভীতি সঞ্চার হয়েছিল, প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হয়েছিল। চরম ভীতিকর অবস্থার একটি দৃষ্টান্ত হলো প্রাণ কণ্ঠাগত হওয়া। আর তখন এ অবস্থাই হয়েছিল।

وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

"আর আল্লাহ্ পাক সম্বন্ধে তোমরা নানা প্রকার ধারণা পোষণ করছিলে"।

যারা প্রকৃত, খাঁটি মুসলমান ছিলেন তাঁরা আল্লাহর ওয়াদায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং বিজয় অবশ্যই মুসলমানদের হবে। কিন্তু দুর্বল চিত্ত মুসলমানগণ ভীত হয়ে এ আশংকা করতেন যে, হয়তো আমরা বিপদগ্রস্তই হয়ে যাব। এবারকার পরীক্ষা যে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা এ ব্যাপারে তাঁদের কোন সন্দেহ ছিল না। আর মুনাফেকরা তাদের আসল চেহারা দেখিয়ে দেয়। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলতো, 'মুসলমানদেরকে যে সোনালী স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল তা আর কীভাবে বাস্তবায়িত হবে?

এখনতো তাদের পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে'। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে চরম সংকটময় মুহূর্তও মুসলমানদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

নিরাশাব্যঞ্জক কথা-বার্তাও বলা অনুচিত, বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশা করাই কর্তব্য। বিপদে সবর অবলম্বন করা, নেয়ামতের শোকর আদায় করা এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশা করা মর্দে মোমেনের বৈশিষ্ট্য।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ
يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا
فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ
لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ
مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

তরজমা

(১১) ওখানেই তো মোমেনদের যাচাই করা হয়, আর তারা অত্যন্ত কঠিনভাবে কেঁপে ওঠে।

(১২) আর সে সময়কে স্মরণ কর, যখন মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলে ওঠে, আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূল আমাদেরকে যে সমস্ত কথা দিয়েছিলেন এ সবই প্রতারণা মাত্র।

(১৩) আর সে সময়কে স্মরণ কর, যখন তাদের একটি দল বলে, হে ইয়াসরেববাসী! তোমাদের কোন ঠাঁই নেই, তোমরা প্রত্যাবর্তন কর এবং একথা বলে তাদের একদল পয়গম্বরের নিকট বিদায় লাভের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারা একথা বলে, আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে, প্রকৃত অবস্থা এই যে তাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত অবস্থায় নেই; বরং তারা পলায়ন করতে চায়।

(১৪) যদি শহর প্রান্ত থেকে কেউ তাদের নিকট অনুপ্রবেশ করে এবং তাদেরকে স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করতে বলে তবে তারা তখনই তা মেনে নেবে, অতি সামান্য সময়েই তারা তাতে বিলম্ব করবে।

(১৫) আর নিশ্চয় তারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ পাকের সাথে এ অঙ্গীকার করেছিল যে তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।

তফসীরুল কোরআন

هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا○

আহ্যাবের যুদ্ধেই মোমেনদের কঠিন পরীক্ষা হয়। আর পরীক্ষা এজন্যে নেয়া হয় যেন কার ঈমান শক্তিশালী এবং কার ঈমান দুর্বল একথা প্রমাণিত হয়, কে সত্যের উপর সম্পূর্ণ অটল অবিচল থাকে, আর কে দুর্বল চিত্তের পরিচয় দেয় একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। এক কথায় কে খাঁটি মোমেন, আর কে মুনাফেক তার বহিঃপ্রকাশ হয়। খাঁটি স্বর্ণ অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। খন্দকের যুদ্ধে ছিল সেই অগ্নি পরীক্ষা, যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস ছিল, তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত রয়েছেন। পক্ষান্তরে, যারা প্রকৃত মোমেন ছিল না, তারা কঠিন পরীক্ষার সময় আত্মরক্ষার লক্ষ্যে আত্মগোপনে সচেষ্ট হয়েছে, তাদের কথাবার্তাও ছিল অত্যন্ত আপত্তিকার। যেমন পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

"আর সে সময়কে স্মরণ কর যখন মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা বলে ওঠে, আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূল আমাদেরকে যে সমস্ত কথা দিয়েছিলেন এর সবই প্রতারণা মাত্র (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)"।

যে মুনাফেকদের কথা এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তারা হলো আবদুল্লাহ্ এবনে উবাই এবনে সলুল এবং মা'তাব এবনে কোশায়ের গং। এরাই এসব আপত্তিকর মন্তব্য করেছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এসব কথা শুধু মুনাফেকরাই বলেছে, তারা বলেছে, 'মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে সিরিয়া এবং পারশ্য রাজার মহল বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন। অথচ আমাদের অবস্থা এত করুণ যে আমরা ভয়ের কারণে নিদৃষ্ট স্থান থেকে এদিক সেদিক যেতে পারিনা। আল্লাহর শপথ! আমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয় (নাউজুবিল্লাহে মিন জালেক)'।

এবনে আবি হাতেম সুদ্দী (রঃ)-এর সূত্রে একথা বর্ণনা করেছেন যে, বশীর এবনে মা'তাব নামক এক মুনাফেক এ মন্তব্য করেছে।

وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ

"স্মরণ কর সেই সময়কে যখন মুনাফেকদের একটি দল বলে, "হে ইয়াসরেববাসী! তোমাদের কোন ঠাঁই নেই"।

আওস এবনে রোমান বলেছেনঃ এ মুনাফেকদের মধ্যে ছিল আউস এবনে কিবতী এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা। তারা বলেছিল, 'হে ইয়াসরেববাসী! সময় থাকতে এখান থেকে পলায়ন কর, কেননা সারা আরববাসী একত্রিত হয়ে আক্রমণ করেছে, অতএব তোমাদের আশ্রয় কোথায়? এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তোমরা রণাঙ্গন থেকে পলায়ন কর'।

فَارْجِعُوا

অর্থাৎ বাড়ীতে ফিরে চল, মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে থাকা মহা বিপদের কারণ হবে, অতএব এখান থেকে ভালোয় ভালোয় নিরাপদ স্থানে চলে যাও।

অথবা এর অর্থ হলো, মুসলমান হিসেবে এখানে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, কেননা সমস্ত আরববাসী তোমাদের শত্রু হয়ে পড়েছে, কোথাও তোমাদের ঠাঁই নেই, তাই ইসলাম ছেড়ে দিয়ে পুনরায় শেরকের দিকে ফিরে যাও, যাতে করে নিরাপদ থাকতে পার।

فَارْجِعُوا

অথবা এর অর্থ হলো, ইয়াসরেবে তোমাদের কোন আশ্রয়-স্থল নেই, অতএব ইসলাম এবং মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বর্জন কর, তাহলে নিরাপদ থাকতে পারবে।[১]

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, যারা এসব মন্দ কথা বলেছিল, তারা হলো আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল ও তার দল।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, তারা হলো বনু সালমা গোত্রের লোক।

আর কেউ কেউ বলেছেন, তারা ছিল বণু হারেসা গোত্রের লোক।[২]

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'ইয়াসরেব' শব্দটি দ্বারা মদীনা মুনাওয়্যারাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

'ইয়াসরেব' নামটি বর্জনীয়

আবু ওবায়দা (রঃ) বলেছেন, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইয়াসরেব নামটি পরিবর্তন করেছেন, তাই এ নামটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

আহমদ, এবনে আবি হাতেম, এবনে মরদবিয়া হযরত বরা এবনে আজেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মদীনা শরীফকে ইয়াসরেব বলবে, আল্লাহ পাকের দরবারে তার তওবা

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩২২
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৬০
২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৬৯

এস্তগফার করা উচিত, কেননা এটি হলো তোয়াবা।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

لا تدعونها يثرب فانها طيبه يعنى المدينة- الحديث

'তোমরা এ শহরকে ইয়াসরেব বলবেনা, এটি হল তৈয়্যেবা অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়্যারা, আর যে এ শহরকে ইয়াসরেব বলবে, তার কর্তব্য হলো তিনবার আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার করা, আর এ শহরটি হলো তৈয়্যেবা, তৈয়্যেবা, তৈয়্যেবা'।

বর্ণিত আছে, আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির নাম ছিল ইয়াসরেব আর তার নামেই এ শহরের নামকরণ করা হয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, তৌরাতে এ শহরটির ১১টি নাম উল্লেখিত হয়েছে। যথা-১. মদীনা, ২. তোয়াবা ৩. মিসকীনা, ৪. যাবেরা, ৫. মুহীব্বা, ৬. মাহবুবা ৭. কাসেমা ৮. মজবুরা ৯. আযারা ১০. মরহুমা ১১. তৈয়্যেবা।

আল্লামা আলুসীও (রঃ) এ নামগুলোর উল্লেখ করেছেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, 'ইয়াসরে'ব নামটি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এজন্যে অপছন্দনীয় ছিল যে ইয়াসরেব শব্দের অর্থ তিরস্কার করা, কোন লোককে লজ্জিত করা এবং কোন অপরাধের কারণে কাউকে অপমানিত করা। আর মোছরেব সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে দান-দক্ষিণায় অভ্যস্ত নয় তথা কৃপণ। যাহোক, মুনাফেকরা রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে উদগ্রীব হলো, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ

আর মুনাফেকদের এক দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট রণাঙ্গন থেকে সরে যাওয়ার জন্যে অনুমতি পার্থনা করে, তারা বলে আমাদের ঘর-দুয়ার অরক্ষিত, যে কোন সময় দুশমন আক্রমণ করতে পারে, অথবা অর্থ-সম্পদ চুরি হতে পারে।

তাদের এসব কথা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন, বানোয়াট, একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী আয়াতাংশে।

وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيدُونَ اِلَّا فِرَارًا

মূলতঃ তাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত নয়, তারা এসব মিথ্যা কথা বলে শুধু রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করতে চায়, পলায়নের উদ্দেশেই তাদের এসব বানোয়াট কথা।

বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৫৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা ২১, পৃষ্ঠা-৮৫

দিয়েছিলেন, তিনি জানতেন যে তারা মিথ্যা কথা বলে পলায়ন করতে চায়, এতদসত্ত্বেও তাদেরকে রণাঙ্গন থেকে সরে পড়ার অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন, কেননা মুসলমানদের সাহায্য আসে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, কখনো অমুসলিম, মুনাফেক, মুরতাদ বা কোন কাফের থেকে মুসলমানগণ সাহায্য পান না। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুমতি প্রার্থনাকারী মুনাফেকদেরকে অনুমতি প্রদানে এতটুকু বিলম্ব করেননি।

ঈমানের পরীক্ষা

মূলতঃ এ যুদ্ধে ঈমানের পরীক্ষা হয়েছে। যারা প্রকৃত ও খাঁটি মোমেন, তারা এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছেন। আর যারা মুনাফেক তারা হয়েছে ব্যর্থ। প্রচণ্ড শীত, রসদের অভাব, জঠর-জ্বালা, এতদ্ব্যতীত পাথুরে মাটি কাটা, মাটির বোঝা ওঠানো, যাদের সঙ্গে ছিল শান্তি চুক্তি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, রক্ত পিপাসু হাজার হাজার দুশমনের মোকাবেলা করা নিতান্ত সহজ কাজ নয়। কঠিনতম এই কাজের জন্যে প্রয়োজন প্রকৃত, খাঁটি, পরিপূর্ণ ঈমানের। শুধু ঈমানী শক্তি দ্বারাই এমনি বিপদের মোকাবেলা করা যায়, যার কারণে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে থাকে। কারো অন্তরে যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ঈমানের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, আর সে যখন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ-পবিত্র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়, এমন ভাগ্যবান লোকের পক্ষেই ঈমানের এমনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়।

পক্ষান্তরে, যারা প্রকৃত ঈমানদার নয়; বরং ঈমানের দাবীদার তারা কখনও এমনি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনা।

এ আয়াত সমূহে মুনাফেকদের এ অবস্থারই বর্ণনা রয়েছে। আর পরবর্তী আয়াতেও এমনি আরও কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا...

"যদি শহর প্রান্ত থেকে কেউ তাদের নিকট অনুপ্রবেশ করে এবং তাদেরকে স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করতে বলে তবে তারা তখনই তা মেনে নেবে, অতি সামান্য সময়েই তারা তাতে বিলম্ব করবে"।

অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়্যারার কোন প্রান্ত থেকে যদি শত্রুপক্ষ তাদের বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করে এবং তাদেরকে বলে, তোমরা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার কর তবে তারা এতটুকু বিলম্ব করবে না; বরং কাফেরদের আহবানে বিনা দ্বিধায় সাড়া দেবে। এ হলো তাদের প্রকৃত অবস্থা, তাই বাড়ী-ঘর অরক্ষিত রয়েছে, এ সব হলো তাদের মিথ্যা বানোয়াট কথা। প্রকৃত অবস্থা এই যে তাদের ঈমানই নেই। এ কারণে তারা রণাঙ্গনে টিকতে পারেনি। কোন রকম টালবাহানা করে তারা রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করেছে। যেমন, বনু হারেসা বলেছিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের বাড়ী খালি, মাল-পত্র চুরি হওয়ার আশংকা, তাই আমাদেরকে বাড়ীতে ফেরত যাওয়ার অনুমতি দিন। আর আওস এবনে

কিবতী বলেছিল, আমাদের বাড়ীতে দুশমনের ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে, আমাকে বাড়ীতে ফিরে যেতে দিন। তাদের এসব কথা মিথ্যা, প্রতারণা মাত্র। তাদের অবস্থা হলো, যদি কাফেররা তাদের বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করতো এবং তাদেরকে ঈমান বর্জন করার এবং কুফরী ও নাফরমানীর পথ অবলম্বন করার জন্য আহবান করতো, তবে তারা তাতে বিলম্ব করতো না।

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ

"আর নিশ্চয় তারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ পাকের সাথে এ অঙ্গীকার করেছিল যে তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবেনা, আর আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, ওহোদ যুদ্ধের পর অনেকেই অঙ্গীকার করেছিল যে, আর কখনও রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করবে না। কিন্তু আজ তারা তাদের সে অঙ্গীকার ভুলে গেছে। তাদের জানা উচিত কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তাদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا
لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ
اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ
لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾ اَشِحَّةً
عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ
اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا
فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

তরজমা

(১৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমাদের পলায়ন কোন প্রকার উপকারে আসবেনা,

যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর। আর এমন ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অতি সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

(১৭) (হে রসূল!) আপনি বলুন, কে আছে যে তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাক থেকে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের অকল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন। অথবা যদি তিনি তোমাদের প্রতি রহমত করতে ইচ্ছা করেন, কে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে? আর তারা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।

(১৮) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয়। আর তাদের ভাইদের বলে, আমাদের সঙ্গে চলে আস, তারা অতি অল্পই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

(১৯) তোমাদের ব্যাপারে যারা কার্পণ্য করে, তবে ভয়ের সময় উপস্থিত হলে তুমি তাদেরকে দেখবে তোমার দিকেই চেয়ে আছে, মৃত্যুকালীন সংজ্ঞাহীন মানুষের ন্যায় তাদের চক্ষু দু'টি ঘুরপাক খাচ্ছে। আবার যখন ভয় দূরীভূত হয় তখন (দেখবে) অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসায় তারা তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। মূলতঃ তারা ঈমান আনেনি, তাই আল্লাহ্ পাক তাদের আমল সমূহ বাতিল করে দিয়েছেন, আর আল্লাহ্ পাকের পক্ষে তা সহজ।

তফসীরুল কোরআন

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِالْقَتْلِ ....

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, মুনাফেকরা যদিও লোক দেখানোর জন্যে প্রথম দিকে আহযাবের যুদ্ধে শরীক হয়েছিল কিন্তু পরে তারা বিভিন্ন ওজর-আপত্তি দেখিয়ে পলায়ন করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে রণাঙ্গনে থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দান করেন নির্দ্বিধায়, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এ মুনাফেকদের সম্পর্কেই ঘোষণা করেছেন যে, তাদের পলায়ন কোন্ কাজে আসবে না, কোন ভাবেই তা তাদের জন্যে উপকারী হবেনা, তারা মৃত্যু অথবা যুদ্ধ থেকে পলায়ন করলে তাদের জীবনের সামান্য কয়েক দিনই তারা ভোগ করতে পারবে। কেননা, মৃত্যুর দিন, ক্ষণ নির্ধারিত রয়েছে, মৃত্যু তার আগে আসবেনা, এতে বিলম্বও হবে না, নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু হবে অবধারিত, অতএব রণাঙ্গন থেকে পলায়ন মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষার কারণ হতে পারেনা। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

"যখন তাদের মৃত্যুর সময় আসে তখন তাতে এতটুকু বিলম্ব হয়না, আর তা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আসেনা"।

অতএব, রণাঙ্গন থেকে পলায়ন সম্পূর্ণ নিরর্থক। যুদ্ধে অংশ নিলেই মৃত্যু হবে এমন নয়। যদি যুদ্ধে মৃত্যু লিপিবদ্ধ না থাকে তবে অবশ্যই তা হবে না, আর বাড়ীতে বসে থাকলেও মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। যার সময় যতদিন থাকে, ততদিন তাকে এ পৃথিবীতে থাকতেই হবে।

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ط

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, কে আছে যে তোমাদেরকে আল্লাহ পাক থেকে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের অকল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, অথবা যদি তিনি তোমাদের প্রতি রহমত করতে ইচ্ছা করেন, কে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে? আর তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা"।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জির পরিপন্থী কেউ কিছু করতে পারেনা। যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চান, তবে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে তাঁর ইচ্ছাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং তাঁর আজাব বা গজব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। কোন প্রকার কৌশল বা তদ্বির তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা।

পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি রহমত নাজিল করতে চান, তোমাদের প্রতি দয়া করতে ইচ্ছুক হন, এমন অবস্থায় কেউ তাতেও বাধা দিতে পারেনা। অতএব, সুখে-দুঃখে অথবা রণাঙ্গনে বা বাড়ী-ঘরে, সর্বত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিই কার্যকর হয়। একথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করাই মর্দে মোমেনের কর্তব্য। কল্যাণকামী বাস্তববাদী মানুষের এটিই হলো নীতি। মুনাফেকদের যেহেতু ঈমান খাঁটি নয়; তাই তারা লোক দেখানোর জন্যে রণাঙ্গনে হাযির হতো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে প্রতারণার অপচেষ্টা করতো তারা, আর এজন্যে যখন যুদ্ধ ঘোরতর হতো তখন তারা পলায়নপর হতো। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন, তাই তারা রণাঙ্গন থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি বিনা দ্বিধায় তাদেরকে অনুমতি দান করতেন। আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

"আর তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা"।

অতএব পলায়ন করেও কোন লাভ হবেনা।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ

"তোমাদের মধ্যে যারা বাধা দেয় এবং নিজেদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের নিকট

চলে আস, আল্লাহ পাক নিশ্চয় তাদেরকে ভাল ভাবে জানেন, তারা যুদ্ধে খুব কমই এসে থাকে"।

আলোচ্য আয়াতের اخوان শব্দটি দ্বারা মদীনাবাসীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কাপুরুষ মুনাফেকরা মদীনাবাসীকে বলতো, আমাদের নিকট চলে আস, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গ বর্জন কর, তাঁর সাথে মিলে যুদ্ধ করতে যেওনা, কেননা এতে তোমাদের মৃত্যুর আশংকা রয়েছে, এভাবে মুনাফেকরা মানুষকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সহযোগিতা করতে বাধা দিত, তারা তাদের আপনজনদের বলতো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথীরা হলো গোশ্তের মত, আর আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছে তারা এদেরকে লোকমা করে খেয়ে ফেলবে, তাদের পরিণতি ধ্বংস, তাদের সাথে যাওয়ার পরিণতি হবে ধ্বংস।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, ইহুদীরা মুনাফেকদের নিকট একটি পয়গাম প্রেরণ করে। ঐ পয়গামে তারা বলে, তোমরা আবু সুফিয়ান এবং তার সৈন্যবাহিনী দ্বারা নিজেদেরকে ধ্বংস করতে কেন ইচ্ছুক হলে! যদি আবু সুফিয়ান বিজয়ী হয় তবে তোমাদের একজনকেও জীবিত ছাড়বেনা, তোমরা আমাদের ভাই, আমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের ব্যাপারে আমাদের আশংকা হলো, সামগ্রিক ভাবে তোমাদের ধ্বংস আসন্ন। আর এ ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে তোমরা আমাদের নিকট চলে আস, রণাঙ্গন থেকে সরে না পড়লে তোমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই।

ইহুদীদের এ পয়গাম পেয়ে মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে। এ মুনাফেকরা নিজেরা তো যুদ্ধে যায়ইনি, অধিকন্তু মোমেনগণকে জেহাদ থেকে বিরত রাখার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে বলে, যদি আবু সুফিয়ান একটু সুযোগ পায় তবে তোমাদের একজনকেও জীবিত রাখবেনা। এতদ্ব্যতীত, তোমরা লক্ষ্য কর যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অর্থ-সম্পদ নেই, অথচ আমাদের সঙ্গে মিলিত হলে আমরা তোমাদেরকে ইহুদীদের নিকট নিয়ে যাব।

মুনাফেকদের এসব অপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, কেননা কোন মোমেন তাদের এসব কথায় জেহাদ পরিত্যাগ করেননি; বরং মোমেনগণের ঈমান হয়েছে আরো সুদৃঢ়। আল্লাহ পাকের রাহে আরো অটল অবিচল হয়ে তাঁরা ত্যাগ-তিতিক্ষার অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

"আর মুনাফেকরা খুব কমই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো"।

কেননা তারা সর্বদা কোন ওজর বা অসুবিধা দেখিয়ে জেহাদকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো।

অথবা এর অর্থ হলো, তারা মুসলমানদের সঙ্গে যদিওবা কখনো যেত কিন্তু তাদের

উদ্দেশ্য থাকত শুধু লোক দেখানো, তাদের অংশগ্রহণ হতো বানোয়াট, তারা কখনো যুদ্ধ করতো না; বরং রণাঙ্গনেও তারা আত্মরক্ষার জন্যেই ব্যস্ত থাকতো। আত্মত্যাগের কোন উদ্দেশ্যই এতে ছিলনা, কেননা তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি সঠিক বিশ্বাস রাখতো না, এজন্যে জেহাদের জন্যে তারা কোন সওয়াবের আশা করতোনা। শুধু চক্ষু-লজ্জার খাতিরেই তারা মুসলমানগণের সঙ্গে যেত; মুসলমানগণ যখন আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে প্রাণ উৎসর্গ করে জেহাদে রত হতেন তখন তারা বাড়ীতে বসে আয়েশ করতো এবং নিজেদেরকে মনে করতো অনেক ভাগ্যবান! এ মর্মে যে তাদের জীবন নাশের কোন ঝুঁকি নেই, তারা হয়েছে আশংকামুক্ত, নিশ্চিন্ত।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ আয়াতাংশ মুনাফেকদের কথার শেষাংশ, এর অর্থ হলো মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথীরা বেশীক্ষণ যুদ্ধে টিকতে পারবেন না, কেননা তাদের সংখ্যা অতি সামান্য, তারা মাত্র তিন হাজার আর আবু সুফিয়ানের বাহিনীর সংখ্যা প্রায় বার হাজার, আর তারা সর্বাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। আর মুসলমানদের সে অবস্থা নেই।[১]

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ মুসলমানদের সাহায্য করার ব্যাপারে তাদের যত কার্পণ্য। তারা অত্যন্ত কৃপণ, কখনো আল্লাহর রাহে তারা ব্যয় করেনা, অর্থ-সম্পদ দ্বারা ইসলামের কোন খেদমত তারা করেনা। অথবা এর অর্থ হলো তারা তোমাদের ব্যাপারে অত্যন্ত কৃপণ এ মর্মে যে, তারা কখনো আল্লাহর রাহে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত নয়। শুধু যে আর্থিক ক্ষেত্রেই তারা কার্পণ্য করে তাই নয়; বরং কায়িক পরিশ্রম করেও যে ইসলামের খেদমেত করবে, এ গুণও তাদের মধ্যে নেই। অতএব, আর্থিক এবং শারীরিক সর্বক্ষেত্রেই তারা কৃপণ, আর মুসলমানগণের বিজয়ও তাদের নিকট একান্ত অপ্রিয়।

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতাংশের এ দু'টি অর্থই বর্ণনা করেছেন।[২]

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, মুনাফেকরা কখনো জান-মাল দিয়ে মুসলমাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হতোনা, কেননা তারা ছিল অত্যন্ত লোভী, তারা যদি কখনো যুদ্ধে যেত তখন শুধু যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের লোভেই যেত।[৩]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার কাতাদা (রঃ) আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মুনাফেকরা শুধু যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ অর্জনের লোভেই কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো।[৪]

আল্লামা মাজেদী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, প্রথমতঃ মুনাফেকরা খুব কম জেহাদে

১। তফসীরে মাজাহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩২৫
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২০১
৩। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দালভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪৭
৪। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৬৫

শরীক হতো, কালে-ভদ্রে যদি কখনও যাওয়া হতো, তা শুধু গণিমতের মাল তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের লোভে, কেননা মুসলমানগণ সমস্ত যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ পেয়ে যাবেন, এ-ও তাদের নিকট ছিল অসহনীয়।[১]

فَاِذَا جَاۤءَ الْخَوْفُ

"তবে ভয়ের সময় উপস্থিত হলে তুমি তাদেরকে দেখবে তোমার দিকেই চেয়ে আছে, মৃত্যুকালীন সংজ্ঞাহীন মানুষের ন্যায় তাদের চক্ষু দু'টি ঘুরপাক খাচ্ছে"।

পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মদীনা শরীফের আনসারদেরকে জেহাদ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতো, নিজেরা শুধু লোক দেখানোর জন্যে জেহাদে অংশগ্রহণ করতো, খুব কমই তারা জেহাদে শরীক হতো, যদি কখনো শরীক হতোও তবে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ লাভের লোভেই তারা রণাঙ্গণের দিকে যেত।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, যুদ্ধকালীন সময়ে যখন কোন ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হতো তখন মৃত্যু-পথের যাত্রী যেভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, ঠিক তেমনি তারাও সংজ্ঞাহীন লোকদের ন্যায় হয়ে যেত, ভয়ে তাদের চোখগুলো ঘুরপাক খেত। মূলতঃ যুদ্ধকালীন অবস্থায় কাপুরুষ মুনাফেকদের এ অবস্থাই হতো। কেননা আল্লাহ পাকের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্রও ঈমান ছিলনা, ঈমানই মোমেনের শক্তির মূল উৎস, আর এ মুনাফেকরা সে মূল উৎস থেকে হতো বঞ্চিত।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মুনাফেকরা ছিল কৃপণ, আর এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তাদের কৃপণতার কারণ। এরশাদ হয়েছে যে, তারা যেহেতু অত্যন্ত কাপুরুষ, সেজন্যে তারা কৃপণ। আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান না থাকার কারণে তাদের কোন সৎ সাহস নেই, আর এ কারণে তাদের মধ্যে রয়েছে কার্পণ্য, তাই তারা আল্লাহ পাকের রাহে ব্যয় করতে পারেনা। আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও তারা করেনা। ফলে বীরত্ব, সৎসাহস এবং এমনি গুণাবলী থেকে মুনাফেকরা হয় চির বঞ্চিত। এসবই হলো মুনাফেকদের বৈশিষ্ট্য।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যখন কোন মানুষের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শক্তিগুলো শেষ হয়ে যায়, সে ঘর্মাক্ত হয়, তার বুদ্ধি-বিবেচনা শেষ হয়ে যায়, সে ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে একদিকে চেয়ে থাকে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় মুনাফেকদের ঠিক এ অবস্থাই হয়।

فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

"আর যখন ভয় দূরীভূত হয় তখন (দেখবে) অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসায় তারা তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে"।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৪৩

অর্থাৎ যখন বিপদ কেটে যায়, ভয় দূরীভূত হয়ে যায় তখন তাদের বাহাদুরী দেখার মতো হয়, তারা এগিয়ে এসে বড় বড় বুলি আওড়ায়, ধারালো ভাষায় তখন তারা কথা বলে, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে চায় এবং মুসলমানদের প্রতি কটাক্ষ করতে দ্বিধাবোধ করেনা।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মুনাফেকরা মুসলমানদের সমালোচনায় লিপ্ত হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ করে, এমনকি মুসলমানদের প্রতি তীক্ষ্ণ-বাক্যবান নিক্ষেপ করতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না।

أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ

অর্থাৎ মুনাফেকরা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের ব্যাপারে অত্যন্ত লোভী হয়, মুসলমানদের বিজয়ের পর তারা মুসলমানদের অত্যন্ত কষ্টদায়ক কথা বলে, তারা একথাও বলে, 'আমরা সঙ্গে ছিলাম বলেই বিজয়টা হলো। অতএব আমাদেরকে গণীমতের মাল তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের সমান অংশ দিতে হবে'।

আলোচ্য আয়াতের 'খায়ের' শব্দটির অর্থ ধন-সম্পদ, পবিত্র কোরআনে এ শব্দটি এ অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম কুরতবী (রঃ) আলোচ্য শব্দটির এ ব্যাখ্যা করেছেন।

أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ

মূলতঃ তারা ঈমানই আনেনি, এজন্যে আল্লাহ্ পাক তাদের কার্যাবলীকে বিফল করে দিয়েছেন, কেননা তাদের নিকট প্রকৃত ঈমান ছিলনা, এখলাস ছিল না তথা তাদের নিয়ত সঠিক ছিল না আর নিয়ত সঠিক না হলে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমলের কোন গুরুত্ব নেই। বোখারী শরীফে সংকলিত প্রথম হাদীস হলো,

انما الاعمال بالنيات

অর্থাৎ নিয়তের উপরই আমলের ফলাফল নির্ভরশীল।

তফসীরকার মুজাহেদ (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন।

وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"আর বাতিল-পন্থীদের আমল বিফল ও ব্যর্থ করা আল্লাহ্ পাকের পক্ষে অতি সহজ"।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যাদের ঈমান নেই তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারে, তাদের ঈমানবিহীন নেক আমল সম্পূর্ণ প্রাণহীন, অকেজো। তারা জীবন-সাধনাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছে, নিজেরাই নিজেদের প্রতি আঘাত করেছে। আল্লাহ্ পাকের রহমত অনন্ত অসীম, তিনি নিজে অকারণে কারো আমল বরবাদ করেন না কিন্তু হতভাগারা নিজেরাই নিজেদের আমল বিনষ্ট করেছে।

يَحْسَبُونَ
الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم
بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا
قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَأَى
الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ
صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

তরজমা

(২০) তারা মনে করে, (কাফেরদের) সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি, আর যদি ঐ সমস্ত সৈন্যবাহিনী ফিরে আসে তবে তারা এই কামনা করবে যে, যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সঙ্গে থাকতো এবং তোমাদের সংবাদ সংগ্রহ করতো তবে কত ভালো হতো! আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করতো তবু তারা খুব সামান্যই যুদ্ধ করতো।

(২১) নিশ্চয় আল্লাহ পাকের রসূলের পূতঃপবিত্র জীবনে রয়েছে এক উত্তম নমুনা, তাদের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করা এবং আখেরাতের দিনেরও আশা করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ করে।

(২২) আর যখন মোমেনগণ সম্মিলিত হানাদার বাহিনীকে দেখলো তখন তারা বলে উঠলো এ-তো তাই, যার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল। এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছেন, আর এতে মোমেনদের ঈমান ও আনুগত্য আরো বেড়ে গেলো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুনাফেকদের চারিত্রিক দুর্বলতার বিবরণ ছিল, এ আয়াতেও তাদের চারিত্রিক দুর্বলতার কথাই বর্ণিত হয়েছে। তারা এমনি ভীরু এবং কাপুরুষ ছিল যে, যখন সম্মিলিত হানাদার বাহিনী মদীনা শরীফ থেকে তাদের ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে যায় তখনও কাপুরুষ মুনাফেকরা একথা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, বাতিল শক্তি তাদের অবস্থান ছেড়ে চলে গেছে, সত্যের জয় হয়েছে, অসত্য বিদায় নিয়েছে, আর এমন বিদায় যার দৃষ্টান্ত বিরল। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিন এরশাদ

করেছিলেন, 'এরপর আর কখনো ইসলামের দুশমনরা প্রাণের মদীনা আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখাবেনা। এখন থেকে তাদের বিরুদ্ধে ইনশাআল্লাহ আমরাই যাব'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথাটি বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং হচ্ছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও মদীনা শরীফের মুনাফেকরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি তাদের ভীরুতা এবং কাপুরুষতার কারণে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۚ

মুনাফেকরা মনে করে কাফের সৈন্যরা এখনো ফিরে যায়নি, শুধু তাই নয়; বরং তাদের অন্তরে এ ভয়ও ছিল, যদি সম্মিলিত বাহিনী আবারো আসে, তখন কি অবস্থা হবে? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ

অর্থাৎ যদি ঐসব সৈন্যরা আবার ফিরে আসে তখন এ কাপুরুষ মুনাফেকরা কামনা করবে যে, তারা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাবে এবং সেখানে থেকেই পথিক মুসাফিরদের নিকট তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নেবে, যুদ্ধের পরিণতি কি হয়েছে, সে সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবে। যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার তো প্রশ্নই ওঠেনা, এমনকি যুদ্ধের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখারও তাদের সাহস নেই, এমনি অবস্থায় তারা কামনা করে মরুভূমিতে নিরাপদ দূরত্বে থেকে পথিক মুসাফিরের মাধ্যমে তোমাদের খবর নেবে।

وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ○

অর্থাৎ যদি এ মুনাফেকরা সুদূর মরুভূমিতে না-ও যায়, তোমাদের মাঝেই থাকে, তবু কিছুই যায় আসেনা, কেননা অতি সামান্য মাত্রায়ই তারা যুদ্ধ করবে, এমন কাপুরুষদের দ্বারা যুদ্ধ করা সম্ভব হয় না, এতদ্ব্যতীত তারা যুদ্ধের জন্যে রণাঙ্গনে যায় না; বরং যায় শুধু লোক দেখানোর জন্যে; মুখ রক্ষার খাতিরে। এমন অবস্থায় এ ধরনের দুর্বলচিত্ত লোকদের দ্বারা কোন উপকার হওয়ার কথা নয়। তাই মুনাফেকদের অসহযোগিতার কারণে মুসলমানদের ক্ষতির কোন আশংকা নেই।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ

"আর নিশ্চয় আল্লাহ পাকের রসূলের পূতঃপবিত্র জীবনে রয়েছে এক উত্তম আদর্শ তাদের জন্যে, যারা আল্লাহ পাকের মোলাকাতের এবং কেয়ামতের দিনে সওয়াবের আশা করে"।

'উসওয়াতুন' শব্দটির অর্থ হলো নমুনা, দৃষ্টান্ত, আদর্শ। সমগ্র কোরআনে হাকীমে এ শব্দটি মাত্র তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃপবিত্র জীবনে রয়েছে এক মহান অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ, যা তোমাদের জন্যে একান্ত অনুসরণীয়, যেমন যুদ্ধে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং অটুট ভরসা রেখে দুশমনের মোকাবেলায় অটল অবিচল রয়েছেন। এটি শুধুমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য, এটিই তাঁর মহান আদর্শ। বীরত্ব, সৎসাহস, সত্য-নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সহনশীলতা তাঁরই আদর্শ, তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণেই নিহিত রয়েছে চির সাফল্য লাভের রহস্য। এ জীবনের সাফল্য লাভের এবং পরজীবনে কামিয়াবী অর্জন করার একমাত্র পথই হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের বিপদগ্রস্ত হওয়ার একমাত্র কারণ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থেকে বিরত থাকা।

প্রিয়নবী (দঃ) সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র আদর্শ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবনে মানব জাতির জন্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। কিন্তু একথা এখানেই শেষ নয়; বরং এটিও সর্বকালের জন্যে সত্য যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র আদর্শ। তাঁর আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত জীবন-সাধনার সাফল্যের আর কোন বিকল্প পন্থা নেই। সূরায়ে মুমতাহেনায় 'উসওয়ায়ে হাসানা' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে। আর আলোচ্য আয়াতে হয়েছে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, আর যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত সর্বকালের জন্যে, কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমন হবে না, তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে সমস্ত নবী রসূলগণের নবুওয়্যত ও রেসালতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্যে তাঁর নবুওয়্যতই সুপ্রতিষ্ঠিত। আজানের মাধ্যমে প্রতিদিন তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতের ঘোষণা হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত এ ঘোষণা অব্যাহত থাকবে। যেদিন এ ঘোষণা থাকবে না সেদিন এ পৃথিবীর অস্তিত্বও থাকবে না। এ কারণেই যেভাবে তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালত সর্বকালের মানুষের জন্যে, ঠিক তেমনি সমস্ত মানুষের জন্যে তিনিই একমাত্র আদর্শ, পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে আল্লাহ পাক একথাই ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, একই ব্যক্তি সর্বশ্রেণীর সকল পেশার মানুষের জন্যে একমাত্র আদর্শ কি করে হবেন? একজন সার্থক বিচারক আরেকজন বিচারকের জন্যে আদর্শ হতে পারেন। একজন ব্যবসায়ী আরেকজন ব্যবসায়ীর জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই আদর্শ হতে পারেন। একজন রাষ্ট্রনায়ক আরেকজন রাষ্ট্রনায়কের জন্যে আদর্শ হতে পারেন কিন্তু অন্য একজন ব্যবসায়ীর জন্যে তিনি আদর্শ হতে পারেন না। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে একমাত্র আদর্শ, আর এটিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু যে নবী ও রসূল তাই নন, বরং তিনি নবী ও রসূলগণের দলপতি, তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন। এর পাশাপাশি তিনি প্রথম জীবনে ব্যবসাও করেছেন। তিনি মদীনা মুনাওয়্যারার প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। তাঁর বিচারালয়ে পেশকৃত দু' হাজার মোকদ্দমার বিবরণও সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক, তিনিই একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, সুদীর্ঘ দশটি বছর তিনি এ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রনায়কদের জন্যে তিনি আদর্শ হয়ে রয়েছেন। শুধু তাই নয়; তিনিই ছিলেন সেনাপতি। ২৭টি যুদ্ধ তিনি সরাসরি পরিচালনা করেছেন। এমনিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যে তিনি আদর্শ রেখে গেছেন, তাঁর অনুসরণ ব্যতীত মানব জীবনে সাফল্যের অন্য কোন পথ নেই।

لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ

অবশ্য এ আদর্শের অনুসরণ সে সব লোকই করতে পারে, যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, যারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর দরবারে হাযিরী দেয়ার এবং আখেরাতের নেয়ামত লাভ করারও আকাংক্ষা করে। যাদের মধ্যে এ গুণ নেই তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করেনা, করতে পারেনা।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে, যে আল্লাহকে ভয় করে এবং কেয়ামতকেও ভয় করে, যখন মানুষকে তার সারা জীবনের কৃতকর্মের বদলা দেয়া হবে।

মোকাতেল (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের يرجوا শব্দটি ভয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ○

আর যারা আল্লাহ পাককে স্মরণ করে অধিক পরিমাণে, তারাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়। সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় যারা আল্লাহ পাককে স্মরণ করে, আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে, আল্লাহ পাকের আনুগত্যের আকাংক্ষা করে, তারাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে পারে।[১]

প্রিয়নবী (দঃ)-এর অনুসরণ একান্ত কর্তব্য

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ একান্ত কর্তব্য। সত্য-সাধনায়, সংকল্পের দৃঢ়তায়, দুশমনের মোকাবেলায়, বীরত্ব ও সাহসিকতায়, ধৈর্য ও সহনশীলতায়, এক কথায় জীবনের সকল

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৫৮

অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা, কাজ ও অনুমোদন সবই একান্ত অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে ধৈর্য ও সহনশীলতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা ও সংকল্পের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। সম্মিলিত হানাদার বাহিনী যখন প্রাণের মদীনা আক্রমণ করে তখন মদীনাবাসী স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত অস্থির ও আতংকগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকল অবস্থায় অটল অবিচল ছিলেন। একদিকে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, অন্যদিকে আল্লাহ পাকের দরবারে রহমতের আশা করে মিনতি প্রকাশ করছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে বলেছেন, তোমরা কেন আমার নবীর অনুসরণ কর না, কীভাবে তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় দুশমনের মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কৃত চক্রান্তগুলো কীভাবে নস্যাত হচ্ছে, তা-ও তোমরা দেখ। তিনি আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারও কাছে আশা করেন না, আল্লাহ পাক ব্যতীত কাউকে তিনি ভয়ও করেন না। সারা আরব যখন তাঁর বিরুদ্ধে হাযির হয়েছে তখনও তিনি তাঁর আদর্শে অনঢ় রয়েছেন, তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তায় এতটুকু ভাটা পড়েনি, তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। অতএব তিনি প্রতিটি সত্য-সন্ধানী কল্যাণকামী মানুষের জন্যে একমাত্র আদর্শ। আর তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা প্রকৃত মোমেন, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার আকাংক্ষা ও আখেরাতে সওয়াব লাভের আশা এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ করা হলো কল্যাণকামী মানুষের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাক এমন লোকদেরকেই তাঁর পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের তওফিক দান করেন।[২]

বস্তুতঃ চরম বিপদ মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিভাবে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রেখে দুশমনের মোকাবেলায় অবিচল ছিলেন তা শুধু চিরস্মরণীয়ই নয়; বরং চির অনুকরণীয়। দ্বিতীয়তঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণেই জীবন-সাধনা সার্থক সুন্দর হয়, তাঁর আদর্শের সামান্যতম বরখেলাফ করেও কেউ সাফল্যের আশা করতে পারেনা। এজন্যেই মরমী কবি বলেছেন,

خلاف پیمبر کسے رہ گزید ۔ کہ ہرگز بمنزل نخواهد رسید

অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথ ব্যতীত অন্য কোন পথে চললে কেউই মনজিলে মকসুদে পৌঁছতে পারেনা।

এটিই আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ

"মুসলমানগণ যখন সৈন্যবাহিনী দেখতে পায় তখন তারা বলে উঠে, আল্লাহ পাক ও

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা- ৮৪৪
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা- ৮৮

তাঁর রসূল আমাদেরকে যে কথা বলেছিলেন এটি তাই, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছেন, এর দ্বারা তাদের ঈমান এবং আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পায়"।

অর্থাৎ মোমেনগণ যখন কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী দেখলেন তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার স্থলে তারা একথা বলে উঠলেন, 'এ-তো সেই সৈন্যবাহিনী যে সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছেন এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও এ সম্পর্কে আমাদেরকে বলেছেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছেন'।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের যে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ তোমরা কি এ ধারণা করেছো যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর ইতিপূর্বে যারা পৃথিবীতে এসেছিল এবং যে কষ্ট তারা ভোগ করেছে, তা তোমাদের ভোগ করতে হবে না? (অবশ্যই সে কষ্ট তোমাদের ভোগ করতে হবে)। তবে

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

"মনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ পাকের সাহায্য অতি নিকটবর্তী"।

অর্থাৎ যদিও মুসলমানদের উপর বিপদ আসবে কিন্তু অবশেষে তারা আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করবে। আর যারা আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য হয়, তাদের সাফল্য হয় সুনিশ্চিত। তাই প্রকৃত মোমেন যখন দুশমনের মোকাবেলা করে তখন তার ঈমানী শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ○

অর্থাৎ এভাবে আল্লাহ পাকের প্রতি মোমেনদের ঈমান এবং আনুগত্য বৃদ্ধি পায় কেননা তারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের কথার সত্যতা হাতে কলমে দেখতে পায়। আর তাদের ঈমান ও আনুগত্য বেড়ে যায়।

মোমেন ও মুনাফেকের মধ্যে পার্থক্য

এ আয়াত সমূহে প্রথমে মুনাফেকদের অবস্থা এবং পরে মোমেনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এভাবে মুনাফেক ও মোমেনের মধ্যেকার যে পার্থক্য প্রকাশিত হয়েছে তা হলো ১. মুনাফেকরা যদিও ঈমানের দাবীদার হয় কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় তারা ঈমানদার নয়। আর একারণেই ২. তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে কিছু আশা করেনা এবং তাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের মোলাকাতের আকাংক্ষাও থাকেনা, ৩. তারা অত্যন্ত ভীরু এবং কাপুরুষ হয়, ঈমানী শক্তির অভাবেই তাদের এ অবস্থা হয়। ৪. কার্পণ্য তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৫. তাদের অন্তরে যা থাকে তা প্রকাশ করেনা; আর যা প্রকাশ করে তা অন্তরে

থাকেনা। ৬. যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাদের ভীতি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুকে তারা অত্যন্ত ভয় করে, এজন্যে রণাঙ্গন থেকে তারা সর্বদা পলায়নপর থাকে।

পক্ষান্তরে, মোমেনদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। ১. আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাদের ঈমান পরিপূর্ণ থাকে। ২. তারা সর্বদা আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশা করেন। ৩. মোমেনের মনের নিভৃত কোণে দরবারে এলাহীতে হাযিরী দেয়ার আকাংক্ষা থাকে, ৪. বীরত্ব, সৎসাহস, সত্যবাদিতা এবং বদান্যতা মোমেনদের বৈশিষ্ট্য। ৫. যুদ্ধকালীন অবস্থায় বা সত্য-সংগ্রামে আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁদের ঈমান ও আনুগত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৬. আল্লাহর রাহে জেহাদে তারা সর্বদা তৎপর থাকেন। এতে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভই তাদের কাম্য হয়, লোক দেখানো নয়। ৭. ইসলামের খেদমতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে যদি কোন বিপদও আসে তবে সে বিপদকে আলিঙ্গন করতে মোমেনগণ এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না।

এজন্যেই মরমী কবি বলেছেনঃ

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق مین گم ہے
مؤمن کی یہ پہچان کہ گم ہین اس مین آفاق

(কাফেরের পরিচয় হলো, সে এ ক্ষণস্থায়ী জগতেই হারিয়ে যায়, আর মোমেনের পরিচয় হলো এই যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তার মাঝেই হারিয়ে যায়।)

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ
مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ لِّيَجْزِيَ
اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ
يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۗ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا
تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ
اَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾

তরজমা

(২৩) মোমেনদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তিই আছে যারা আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো (শাহাদতের মাধ্যমে) তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করে গেছে, আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কিছুমাত্রও পরিবর্তন করেনি।

(২৪) কেননা আল্লাহ পাক সত্য-নিষ্ঠ লোকদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্যে পুরস্কৃত করেন, আর তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফেকদেরকে শাস্তি দেন, অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(২৫) আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে তাদের রুদ্ধ আক্রোশ সহ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করেন, আর তাদের হাতে কোন কল্যাণই আসেনি। যুদ্ধে মোমেনদের জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট ছিলেন, আল্লাহ পাক যে সর্বশক্তিমান, তিনি পরাক্রমশালী।

(২৬) আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফেরদেরকে সাহায্য করেছিল, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে অবতরণে বাধ্য করেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। তাদের কিছু লোককে তোমরা হত্যা করছো এবং কিছু লোককে তোমরা বন্দী করছো।

(২৭) আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের অধিকারী করলেন, এমন ভূমি যা তোমরা এখনো পদানত করোনি। আর আল্লাহ পাক সর্বোপরি, সর্বশক্তিমান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। এরপর মোমেনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে তারা তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। আমৃত্যু তারা সত্য ও ন্যায়ের জন্যে লড়াই করেছেন। জীবন উৎসর্গ করতে তারা এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। এ আয়াতেও মোমেনদের ত্যাগ-তিতিক্ষা সহ অন্যান্য গুণাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ মোমেনগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে সত্য করেছেন। ভয়াবহ অবস্থায় তারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে জেহাদে অবিচল ছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক জেহাদে শাহাদাত বরণ করে তাদের অঙ্গীকার রক্ষার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আর তাদের কিছু লোক আত্মোৎসর্গের সুযোগের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। উভয় দলই সত্যের উপর অবিচলিত। ঈমান ও বিশ্বাসে সুদৃঢ় রয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাথে এ অঙ্গীকার

করেছিলেন যে, তারা জেহাদে দৃঢ় সংকল্প ও অটল থাকবেন। আলোচ্য আয়াতে সে অঙ্গীকারেরই উল্লেখ রয়েছে যে সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন ইসলামের হেফাজতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহযোগিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি।

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ

তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো (শাহাদতের মাধ্যমে) তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করে গেছে এবং তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, যেমন হযরত হামযা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ

আর তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা আসন্ন সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে যে, কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করার সুযোগ পেলেই প্রাণ দিয়ে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

"আর তারা অঙ্গীকার রক্ষায় কোন রকম পরিবর্তন করেনি"।

অথচ মুনাফেকরা তাদের কথা রক্ষা করেনি, তারা রণে ভঙ্গ দিয়েছে।

এ আয়াত সম্পর্কে একটি বর্ণনা

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি যখন পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম তখন একখানি আয়াত পাওয়া যাচ্ছিল না, অথচ আয়াতখানি আমি স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক থেকে শ্রবণ করেছিলাম। অবশেষে হযরত খোজায়মা এবনে সাবেত (রাঃ)-এর নিকট এ আয়াতখানি পাওয়া গেল। তিনি সে মহান ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন যে খোজায়মা একাই দু' স্বাক্ষীর সমান। সে আয়াতখানি হলো আলোচ্য আয়াত

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ....

এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আনাস এবনে নজর (রাঃ) সম্পর্কে।[১]

মোমেনদের ত্যাগ-তিতিক্ষা

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ, তিরমিজী, এবনে আবি শায়বা, আবু দাউদ এবং আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আনাস এবনে মালেকের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আনাস এবনে মালেক (রাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আনাস এবনে নজর (রাঃ) বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। এ বিষয়টি ছিল তাঁর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এজন্যে তিনি

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৮৯-৯০

বলেছিলেন, 'হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম যে যুদ্ধ করেছেন তাতে যে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি এজন্যে অত্যন্ত বড় আক্ষেপ, যদি ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক আমাকে মুশরেকদের বিরুদ্ধে কোন জেহাদে শরীক হওয়ার তওফিক দান করেন, তবে আমার কর্ম তৎপরতা আল্লাহ পাক দেখবেন'।

তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটে, তখন হযরত আনাস এবনে নজর (রাঃ) বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের সাথীরা যা কিছু করেছেন, আমি সেজন্যে তোমার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। আর কাফেররা যা করেছে তার জন্যে আমি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি'। কিছু আনসার ও মোহাজের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে এক স্থানে চিন্তিত অবস্থায় বসেছিলেন। হযরত এবনে নজর (রাঃ) তাঁদেরকে বললেন, 'এখানে আপনারা কেন বসে রয়েছেন'? তারা জবাব দিলেন, 'হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন'। এবনে নজর (রাঃ) বললেন, 'হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাহাদাতের পর জীবিত থেকে কি করবে? ওঠ, যে দ্বীন ইসলামের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়েছেন, তার জন্যে তোমরাও প্রাণ উৎসর্গ কর'। এরপর তিনি কাফেরদের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওহোদের পশ্চাত দেশে হযরত সা'দ এবনে মাআজের (রাঃ) সাথে সাক্ষাত হলো। হযরত সা'দ (রাঃ) বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে আছি'।

হযরত সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'হযরত আনাস এবনে নজর (রাঃ) কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন তা আমি করতে পারিনি'। হযরত আনাস এবনে নজর (রাঃ) আমাকে বললেন, 'হে আবু আমর! জান্নাতের বাতাস আসছে, নজরের প্রতিপালকের শপথ! আমি ওহোদের নিকট জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি'। এরপর বীর বিক্রমে তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর দেহে তরবারী এবং তীরের আশিটির উপর জখম হয়েছিল। এভাবে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কাফেররা হযরত এবনে নজরের (রাঃ) নাক কান সহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলেছিল। এজন্যে লোকেরা তাঁকে সনাক্ত করতে পারেনি। অবশেষে তাঁর ভগ্নি বাশামা তাঁর আঙ্গুল দেখে চিনতে পেরেছিলেন।

আলোচ্য আয়াত رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ তাঁর সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত খোবাব এবনে আরত (রাঃ) বলেছেন, আমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করেছি, আমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং নিজেদের সাধনার ফল (দুনিয়াতে) ভোগ করেননি, তন্মধ্যে মাসাআব এবনে উমায়ের (রাঃ) অন্যতম, তিনি ওহোদের দিন শহীদ হয়েছিলেন। একটি চাদর ব্যতীত তাঁর কাফনের জন্যে আর কোন কাপড় পাওয়া যায়নি, আর চাদরটি এমন ছিল যে তার দ্বারা মাথা ঢাকা হলে পা খোলা থাকতো, আর পা ঢাকা থাকলে মাথা খোলা থাকতো। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্ল'হু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তোমরা চাদর দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও, আর এজখির (এক প্রকার ঘাস) দ্বারা তার পা ঢেকে দাও'।

ইমাম তিরমিজী হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, (একবার) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত তালহা এবনে ওবায়দুল্লাহকে দেখে বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে দেখা পছন্দ করে যে জীবন্ত বলন্ত অবস্থায় রয়েছে এবং তার মানত পুরা করেছে (জান্নাতী হয়ে গেছে) তাহলে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে (তালহা এবনে ওবায়দুল্লাহকে)'।

ইমাম বোখারী (রঃ) বর্ণনা করেন, কায়েস এবনে হাজেম (রাঃ) বলেছেন, আমি দেখেছি হযরত তালহার একটি হাত অবশ হয়ে গেছে। ওহোদের যুদ্ধের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তিনি আড়াল করে রাখেন, দুশমনের আক্রমণ হাত দ্বারা ঠেকাতে থাকেন, যে কারণে তাঁর হাত অবশ হয়ে যায়।[১]

لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ

"আল্লাহ পাক এই সত্য-নিষ্ঠ লোকদেরকে তাদের সত্যবাদিতার বিনিময় দান করতে ইচ্ছা করেন"।

এ আয়াতে صدق শব্দ দ্বারা তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সত্য-সাধনা, এই হক্ব ও বাতিলের জেহাদ অকারণে নয়; বরং আল্লাহ পাক সত্য-সাধকদের তাদের সাধনার জন্যে সওয়াব দিতে চান, তাদেরকে পুরস্কৃত করতে চান।

وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ

আর মুনাফেকদেরকে তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন অথবা তিনি দয়া করে তাদেরকে তওবার তওফিক দেবেন এবং মাফ করবেন। আল্লাহ পাকের রহমত অনন্ত অসীম, হয়তোবা তিনি মুনাফেকদেরকে খাঁটি মোমেন হওয়ার তওফিক দেবেন এবং এরপর মাগফেরাত দান করবেন, এটি তাঁর মর্জির ব্যাপার। মুনাফেক যদি তার বর্তমান অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তার জন্যে আজাব অবধারিত। পক্ষান্তরে, যদি মুনাফেক তওবা করে এবং খাঁটি মোমেন হয় তবে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করতে পারেন।

মূলতঃ শাস্তি প্রদান অথবা তওবার তওফিকের মাধ্যমে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান উভয়ই নিতান্ত আল্লাহ পাকের মর্জির উপর নির্ভর করে।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-৮৯-৯০
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩২৯-৩০
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৭০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলবী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৭
তফসীরে আদ্‌দুররুল মনছুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০৭

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

তাঁর দয়ার কারণেই তিনি গুনাহগারদেরকে মাফ করে থাকেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন তবে মুনাফেকদেরকে তাদের নেফাক অবস্থায়ই মৃত্যু দেন, আর তখন তাদের শাস্তি হয় অবধারিত। অথবা তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মুনাফেকী থেকে তওবা করার তওফিক দান করেন এবং তারা প্রকৃত মোমেন হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়, এভাবে আল্লাহ পাকের রহমত লাভে ধন্য হয়।

যুদ্ধের তাৎপর্য

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ আয়াতে যুদ্ধের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ এ যুদ্ধটি ছিল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একটি পরীক্ষা, যার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ পাক সত্য-নিষ্ঠ লোকদেরকে তাদের সত্য-সাধনার সওয়াব দানে ধন্য করতে চান। আর মুনাফেক ও মিথ্যাবাদীদেরকে শাস্তি দিতে চান। অথবা তাদেরকে তওবার তওফিক দিয়ে ক্ষমা করতে চান, সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার।

অবশেষে যুদ্ধের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا

"আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে (ব্যর্থ-মনোরথ করে) তাদের রুদ্ধ আক্রোশ সহ ফিরে যেতে বাধ্য করেন। তারা কোন প্রকার কল্যাণই লাভ করতে পারেনি"।

দুশমন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল

এ আয়াতে আল্লাহ পাক আহযাবের যুদ্ধের পরিণতি এবং শেষ অবস্থা বর্ণনা করছেন যে অবশেষে কাফেররা ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে তাদের মনের আক্রোশ নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আল্লাহ পাকই তাঁর কুদরত হেকমতে তাদের বিরাট আয়োজনকে ব্যর্থ করে দেন। তারা সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করে বিজয়ী হবার যে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখেছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি, আর কখনো হবেনা। দুশমনের এমনি আয়োজন সত্ত্বেও তাদের বিজয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি সামান্য অর্থ-সম্পদও তারা লাভ করেনি।

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ

"আর আল্লাহ পাক মোমেনদের যুদ্ধকে নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেন"।

ঝড়ো হাওয়া এবং ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করে তিনি মুসলমানগদের সাহায্য করেন এবং প্রায় যুদ্ধ ব্যতীতই আল্লাহ পাক বিজয় দান করেন।

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ

এ আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে কোরায়েশদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ এখানেই শেষ হয়েছে, কেননা আল্লাহ পাক যখন সরাসরি মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন তখন আর কখনো কোরায়েশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দুঃসাহস দেখাবে না। ইতিহাস সাক্ষী! এরপর আর কখনো কোরায়েশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেনি।

وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا

"আর আল্লাহ পাকই সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী"।

তিনি যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা করেন। অবাধ্য লোকদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি সর্বদা সম্পূর্ণ সক্ষম এবং এ উদ্দেশে কারো সাহায্য গ্রহণেরও তাঁর প্রয়োজন নেই।

অবশেষে আল্লাহ পাক ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেরদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করার তওফিক দান করেছেন। যা পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের উপকরণ হিসেবে পরিণত হয়। অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে মক্কা বিজয় দান করেন। এভাবে আল্লাহ পাকের কুদরত ও রহমতে সারা আরব থেকে কুফর ও শেরক দূরীভূত হয়। আর মক্কা বিজয়ের দিনই আল্লাহ পাক এ সত্য ঘোষণা করেছিলেনঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

"আর (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, আর মিথ্যা বিদায় নেয়ারই যোগ্য"।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ

"আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা (বণী কোরায়জা) সম্মিলিত হানাদার বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে আনেন"।

وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا

"আর আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করেন। তাদের কিছু লোককে তোমরা হত্যা করছিলে আর কিছু লোককে তোমরা বন্দী করছিলে"।

অর্থাৎ বণী কোরায়জার পুরুষদেরকে তোমরা হত্যা করছিলে, আর শিশু ও মহিলাদেরকে তোমরা বন্দী করছিলে।

বণী কোরায়জার শোচনীয় পরিণতি

এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাক বণী কোরায়জার শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করেছেন। আহযাবের যুদ্ধের সময় বণী কোরায়জা গোত্রের ইহুদীরাই প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কেননা তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে। হাই এবনে আখতাবের উস্কানিতেই এসব কিছু

হয়। এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন দুশমনের মোকাবেলা করছিলেন তখন এ দূরাত্মা ইহুদীরা মদীনা মুনওয়্যারায় শিশু ও মহিলাদের উপর আক্রমণ করার অপচেষ্টা করেছিল। তাই অবশেষে বিশ্বাসঘাতক বণী কোরায়জার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

ইমাম আহমদ (রঃ) ইমাম বোখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) সংক্ষেপে এবং বায়হাকী ও হাকেম সঠিক সূত্রের উল্লেখ করে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আবু নাঈম এবং বায়হাকী অন্য সূত্রেও এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আবদে এবনে হুমায়েদ এবনে হেলালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এবনে জরীর হযরত এবনে আউফার সূত্রে এবং বায়হাকী ওরওয়ার সূত্রে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

মুশরেকরা যখন পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে গেল তখন বণী কোরায়জার ইহুদীরা তাদের কীর্তিকলাপের পরিণতি সম্পর্কে ভয় করলো এবং বিপদ উপলব্ধি করে তারা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলো। এদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় মদীনা মুনাওয়্যারায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেললেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে পানি আনিয়ে মাথা মোবারক ধৌত করতে লাগলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি আমাকে সালাম করলেন। আমি ঘরের ভিতর ছিলাম। ঐ ব্যক্তি জানাযা রাখার স্থানে দন্ডায়মান ছিলেন। সে ডাক দিয়ে এভাবে বললেন, 'হে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী! আপনি অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলেছেন? অথচ আল্লাহর ফেরেশতাগণ এখনও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত'। একথা শ্রবণ করেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। আমি তাঁর পেছনে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি দেখলাম দাহিয়া কালবীর আকৃতিতে এক ব্যক্তি, যিনি মাথা থেকে বালি ঝেড়ে ফেলছিলেন'।

এবনে এছহাক বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমামা পরিহিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এত শিগ্‌গির অস্ত্র খুলে ফেললেন? আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন! ফেরেশতাগণ এখনও অস্ত্র খুলেননি। আমরা হামরাউল আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করেছি। এখন সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আল্লাহ পাক তাদেরকে পলায়নে বাধ্য করেছেন এবং আপনাকে আদেশ দিয়েছেন বণী কোরায়জার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আমি ফেরেশতা সাথীদেরকে নিয়ে সেদিকেই যাচ্ছি। এখনই যেতে হবে'।

হুমায়েদ এবনে হেলালের বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'আমার সাথীগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, কয়েকটি দিন অবকাশ দিলে উত্তম হতো'। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, 'আপনি তাদের প্রতি অভিযান শুরু করুন'।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গৃহে তশরীফ আনলেন, আমি আরজ করলাম, 'যার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন তিনি কে ছিলেন'? তিনি এরশাদ করলেন, 'তুমি কি তাকে দেখেছিলে'? আমি আরজ করলাম, 'জ্বী-হ্যাঁ'। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'তোমার ধারণায় ঐ ব্যক্তি কার ন্যায় ছিল'? আমি আরজ করলাম, 'দাহিয়া কালবীর ন্যায় ছিল'। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তিনি আমাকে বলেছেন এখনই বণী কোরায়জার বিরুদ্ধে অভিযান করতে'। এরপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে চলে গেলেন। বণী গণম গোত্রের গলিতে তাদের গমনের সময় বালি উড়তে লাগলো। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'এখনও আমার চোখের সামনে সে বালিগুলো ভাসছে'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে বণী কোরায়জার বিরুদ্ধে অভিযানের কথা ঘোষণা করলেন। হযরত বেলাল (রাঃ)-কে এ'লান করার জন্যে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ আদেশও দেয়া হলো যে প্রত্যেকে যেন আসরের নামাজ বনু কোরায়জার বস্তিতে পৌঁছে আদায় করে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে তলব করলেন এবং পতাকা অর্পণ করলেন।

মোহাম্মদ এবনে আমর, হিশাম এবং বালাজুরির বর্ণনা এই, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ এবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-কে (তাঁর নিজের স্থলে) মদীনা মুনাওয়্যারার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তিনি পঞ্চম হিজরীর ২৩শে জিলক্বদ মদীনা শরীফ থেকে বের হন। অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হন, বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করেন, অশ্বে আরোহণ করেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল ছত্রিশ জন। আর অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম পদব্রজে। এবনে সা'দের বর্ণনা মোতাবেক তিন হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে বনু কোরায়জার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়।

তেবরানী, আবু রাফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন বণী কোরায়জার বস্তির নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি একটি গাধার উপর আরোহন করলেন, তার নাম ছিল ইয়াফুর।

হাকেম, বায়হাকী এবং আবু নাঈম হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'সাওরাইন' নামক স্থান অতিক্রম করার সময় দেখলেন যে সেখানে বণী নাজ্জারের কিছু লোক একত্রিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে হারেসা এবনে নোমানও ছিলেন, তারা সকলে সুসজ্জিত ছিলেন এবং সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের এদিক থেকে কোন লোক ইতিপূর্বে অতিক্রম করেছে কি'? আনসারগণ বললেন, 'জ্বী-হ্যাঁ'। দাহীয়া কালবী খচ্চরের উপর আরোহণ করে এদিক দিয়ে অতিক্রম করেছেন, খচ্চরের উপর মোটা রেশমী চাদর পড়েছিল, আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন

আমরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হই, আমরা তাই এভাবে কাতারবন্দী হয়ে রয়েছি, তিনি একথাও বলে গেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এখনই আগমন করবেন'। হারেসা এবনে নোমান বর্ণনা করেছেন, 'আমরা দু'টি কাতারে দাঁড়িয়েছিলাম', হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তিনি জীবরাঈল ছিলেন, যাকে বণী কোরায়জার দুর্গগুলোতে ভূমিকম্প এবং তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে'।

হযরত আলী (রাঃ) কিছু মোহাজের এবং আনসারদের দল নিয়ে পূর্বেই এসেছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) ছিলেন।

মোহাম্মদ এবনে আমর বর্ণনা করেন, হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) বলেছেন, আমরা যখন বণী কোরায়জার নিকট পৌছলাম তখন তারা একথা বিশ্বাস করলো যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। হযরত আলী (রাঃ) তাদের দুর্গের ভিত্তিতে ইসলামী পতাকা উত্তোলন করলেন। তারা তাদের দুর্গের মধ্য থেকে আমাদেরকে গালি দিতে লাগলো। এমনকি, স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পূণ্যাত্মা স্ত্রীগণকেও গালি দিল কিন্তু আমরা নীরব ছিলাম, আমরা বলে দিয়েছিলাম আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে তরবারী দ্বারা। এমন সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন, তাদের দুর্গের কাছেই তিনি অবতরণ করলেন। হযরত আলী (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখে আমাকে আদেশ দিলেন যেন আমি পতাকা হাতে নিয়ে নেই, আমি তাই করলাম। হযরত আলী (রাঃ) পছন্দ করছিলেন না যে ইহুদীদের গাল-মন্দের শব্দ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করুন। এজন্যে আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আপনি এ দূরাত্মাদের কাছে না যান তবে কোন ক্ষতি নেই'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তুমি কি আমাকে প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দিচ্ছ? আমার ধারণা এই যে, তুমি তাদের কোন মন্দ কথা শ্রবণ করেছ'। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'জ্বী-হ্যাঁ'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'যদি তারা আমাকে দেখতো তবে এসব কথা বলতো না'।

যাহোক, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বণী কোরায়জার দুর্গের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হযরত ওসায়েদ এবনে হোজায়ের (রাঃ) ছিলেন সকলের সম্মুখে। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমনরা! যতক্ষণ তোমরা জঠর-জ্বালায় মরে না যাবে, আমরা এ স্থান থেকে সরে যাব না, তোমরা গর্তে বন্ধ থাক, আমরা তোমাদেরকে অবরোধ করে রাখবো'। বণু কোরায়জা বললো, 'হে এবনে হোজায়ের! খাজরাজের মোকাবেলায় আমরা তোমাদের সাথে শান্তি চুক্তি করেছিলাম, তুমি আমাদের মিত্র ছিলে'। হযরত ওসায়েদ (রাঃ) বললেন, 'এখন তোমাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে কোন চুক্তিও নেই, কোন সম্পর্কও নেই'।

এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের দুর্গের কাছে চলে গেলেন এবং এত উচ্চ স্বরে ইহুদী সর্দারদের নাম ধরে ডাকলেন যে তারা তাঁর ডাক শ্রবণ

করলো। তিনি এরশাদ করলেন, 'হে বানর ও শুকরের ভাইয়েরা, হে মূর্তি বা শয়তানের পূজারীরা! আমার কথার জবাব দাও, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে অপমানিত করেছেন, তোমাদের প্রতি আজাব নাজিল করেছেন, তোমরা কি আমাকে গালি দিচ্ছ'? তারা শপথ করে বললো, 'হে আবুল কাসেম! আমরা এমনটি করিনি, আপনি তো আমাদের সম্পর্কে অজ্ঞ নন'।

সন্ধ্যায় সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সমবেত হলেন। হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু খেজুর প্রেরণ করলেন, আর সে খেজুরই ছিল সেদিনের আহার্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'খেজুর হলো উত্তম খাবার'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের শেষ প্রহরে উঠে গেলেন এবং তিরন্দাজদেরকে পূর্বেই প্রেরণ করলেন। তারা ইহুদীদের দুর্গগুলোকে অবরোধ করলেন এবং তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করা শুরু করে দিলেন। দুর্গের ভেতর থেকে ইহুদীরাও তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকলো। এভাবে দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। যখন সন্ধ্যা হলো তখন থেকে সারা রাত দুর্গ অবরোধ করে রাখা হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা রাত তীর নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন। এমন অবস্থায় ইহুদীরা তাদের ধ্বংস নিশ্চিত মনে করলো। তারা তীর নিক্ষেপ করা বন্ধ করলো এবং মুসলমানদেরকে বললো, 'আপনারা লড়াই বন্ধ করুন, আমরা কথা বলতে চাই'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'ভাল কথা'। ইহুদীরা দুর্গ প্রাচীরের উপর দিয়ে নাবাশ এবনে কায়েমকে প্রেরণ করলো। সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে কথাবার্তা বললো। সে বললো, 'বণী নজির যে সব শর্তে আপনাদের সাথে মীমাংসা করেছে, আমরাও সে সব শর্তে আপনাদের সাথে মীমাংসা করতে চাই। শর্তগুলো হলো, আমাদের নগদ অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র আমরা নিয়ে যাব, আমাদের স্ত্রীলোক এবং শিশুদেরকে আমরা নিয়ে যাব এবং এ বস্তি ছেড়ে যাব, আর অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত যত মাল উটের পিঠে বহন করা যায় তা-ও নিয়ে যাব'। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসব শর্ত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। ইহুদীরা বললো, 'ঠিক আছে আমরা অর্থ-সম্পদ নেবোনা, এসবের আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে নিয়ে যাব'। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ শর্তও মানলেন না এবং এরশাদ করলেন, 'বিনা শর্তে তোমাদেরকে দুর্গ থেকে বের হয়ে আসতে হবে, আর তোমাদের ব্যাপারে আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব তা তোমাদের মেনে নিতে হবে'। নাবাশ এ জবাব নিয়ে বণী কোরায়জার নিকট ফিরে গেল, আর যা কথা হয়েছে তা তাদেরকে শুনিয়ে দিল। তখন কা'ব এবনে আসাদ বললো, 'হে বণী কোরায়জা! তোমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা তোমরা স্বচক্ষে দেখছো, এখন আমি তোমাদের সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব রাখছি, এর যে কোন একটি তোমরা গ্রহণ কর', বনী কোরায়জা বললো, 'সেই তিনটি প্রস্তাব কি?' কা'ব বললো (১) 'তোমরা এই ব্যক্তির হাতে বয়আত কর, তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস কর, কেননা আল্লাহর শপথ! তিনি আল্লাহর নবী, যাঁর আলোচনা তোমাদের গ্রন্থেও রয়েছে, আর একথা

তোমাদের নিকটও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, যদি আমার এ প্রস্তাব গ্রহণ কর তবে তোমাদের জান-মাল-স্ত্রীলোক সবই সংরক্ষিত থাকবে'।

'আল্লাহর শপথ! তোমরা ভাল করেই জান মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সত্য নবী, আমরা কেন তাঁর সাথী হতে পারি না? এ পথে বাধা কি? একমাত্র বাধা হলো আমাদের হিংসা, যা আমাদের অন্তরে রয়েছে যে তিনি আরব, তিনি বণী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নন কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়্যতের এই সম্মান দান করেছেন, বিশ্বাসঘাতকতা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আমার একান্ত অপছন্দনীয় ছিল কিন্তু এ বিপদ এই ব্যক্তির (হাই এবনে আখতাব) কারণে হয়েছে, যে এখানে বসে আছে। যখন কোরায়েশ এবং বনী গাতফানের লোকেরা ব্যর্থ হয়ে চলে যায় তখন হাই এবনে আখতাব কা'ব এবনে আসাদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা মোতাবেক বনী কোরায়জার দুর্গে এসেছিল, কা'ব তার দিকে ইঙ্গিতে করেছে, এরপর সে বলেছে, 'এবনে জাওয়াসের কথা কি তোমাদের মনে নেই, যা সে তোমাদের সঙ্গে বলেছিল'। ইহুদীরা জিজ্ঞাসা করলো, 'কোন্ কথা?'

তখন কা'ব বললো, এবনে জাওয়াস বলেছিল, 'এ বস্তিতেই একদিন একজন নবীর আবির্ভাব হবে, যদি আমার জীবদ্দশায় তাঁর আবির্ভাব হয় তবে আমি তাঁর অনুসারী হবো এবং তাঁর সাহায্য করবো, আর যদি আমার মৃত্যুর পর তাঁর আবির্ভাব হয় তবে তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে, খবরদার! এ ব্যাপারে কারো দ্বারা তোমরা বিভ্রান্ত হয়োনা, তাঁর সাহায্যকারী এবং বন্ধু হয়ো, যদি তোমরা তা কর তবে দু'টি কিতাবের উপর তোমাদের ঈমান আসবে, প্রথম কিতাবের উপর এবং শেষ কিতাবের উপরও, তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিও এবং তাঁকে একথা জানিয়ে দিও যে আমি তাঁকে সত্য নবী মনে করি এবং তাঁর প্রতি আমি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করি'।

কা'ব বললো, 'হে ইহুদী সম্প্রদায়! আস, আমরা সকলে তাঁর হাতে বয়আত করি আর তাঁর সত্যতার কথা স্বীকার করি'।

বণী কোরায়জা বললো, 'আমরা কখনও তৌরাতের আদর্শ পরিত্যাগ করবো না, আর তৌরাতের শরীয়তের স্থলে অন্য কোন শরীয়ত গ্রহণ করবো না'। কা'ব বললো, 'যদি তোমরা একথা পছন্দ না কর তবে (২) আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, আস আমরা সকলে আমাদের নিজ নিজ স্ত্রী এবং শিশুদের হত্যা করি, এরপর মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, অবশেষে আল্লাহ আমাদের মধ্যে এবং মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন, এ অবস্থায় আমরা মৃত্যু বরণ করবো এবং আমাদের পেছনে কাউকে ছেড়ে যাবনা, যাদের সম্পর্কে আমাদের চিন্তিত হতে হয়। যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে অন্য স্ত্রী এবং তাদের মাধ্যমে সন্তান আমরা পেয়েই যাব'। ইহুদীরা বললো, 'আমরা এ অসহায় স্ত্রীলোক এবং শিশুদের কিভাবে হত্যা করতে পারি? এতদ্ব্যতীত আপন-জনদের মৃত্যুর পর আমাদের বেঁচে থাকার কি স্বাদ থাকবে?' কা'ব বললো, 'যদি আমার এ প্রস্তাবও তোমরা মেনে নিতে রাজি না হও, তবে (৩) আমার তৃতীয় প্রস্তব হলো আজ শনিবার রাত, মোহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গীরা আমাদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবে যে, ইহুদীরা আজ আর আক্রমণ করবে না, চল নিচে অবতরণ করি, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাথীদের গাফলত অবস্থায় আক্রমণ করি, হয়তো এ অবস্থায় আমরা সাফল্য লাভ করতে পারি'। ইহুদীরা জবাব দিল, 'আমরা শনিবারের পবিত্রতা সম্পর্কে আদেশ অমান্য করতে পারিনা, আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ আদেশ অমান্য করার কারণে বানরে পরিণত হয়েছিল, তাদের উপর আল্লাহর আজাব আপতিত হয়েছিল, যার কারণে তারা ধ্বংস হয়েছিল, এজন্যে আমরা এমন কাজ করতে পারিনা'। তখন কা'ব বললো, 'তোমাদের কেউই যখন থেকে তোমাদের মায়েদের উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছ, একদিনের জন্যেও বুদ্ধিমান হওনি'।

সা'লাবা এবনে সাঈদ, উসায়েদ এবনে সাঈদ এবং আসাদ এবনে ওবায়েদ বললো, 'হে বনী কোরায়জা গোত্র! ইনি আল্লাহ পাকের সত্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), তাঁর আকৃতি এবং গুণাবলী কিতাবে উল্লেখিত আছে যা আমাদের এবং বণু নজীরের আলেমগণ বর্ণনা করে থাকেন। এবনে হাইয়ান আমাদের নিকট অত্যন্ত সত্য-নিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন, এই হাই এবনে আখতাবও তার সম্পর্কে অবগত রয়েছে। এবনে হাইয়ান মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর আকৃতি ও গুণাবলী বর্ণনা করে গেছেন'। কিন্তু বণু কোরায়জার লোকেরা বললো, 'আমরা তৌরাতের শরীয়ত ত্যাগ করবোনা'। যখন সা'লাবা এবং উসায়েদ দেখলো যে বণী কোরায়জা তাদের কথা মানবেনা তখন ঐদিনই ভোর হওয়া মাত্র তারা দুর্গ থেকে বের হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এভাবে তাদের জান-মাল এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলকে নিরাপদ করে নিলেন।

আমর এবনে মাসউদ বললো, 'হে ইহুদী গোত্র! তোমরা মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে যে সব বিষয়ে চুক্তি করেছিলে, সে সব বিষয়ে অবগত রয়েছ অথচ তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করেছ, আমি চুক্তি করার সময়ও তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না, আর ভঙ্গের সময়ও ছিলাম না তোমাদের সঙ্গে, এখন যদি তোমরা মুসলমান হতে রাজী না হও, তবে জিযিয়া কবুল কর, আর ইহুদী হিসেবেই থাক'। বনু কোরায়জা বললো, 'আমরা আরবদেরকে জিযিয়া দেয়ার অবমাননা সইতে পারবোনা। এর চেয়ে তো নিহত হওয়া উত্তম'। তখন আমর এবনে মাসউদ বললো, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আর নেই'। একথা বলে ঐ রাতেই সাঈদের দু'টি সন্তান সহ বের হয়ে পড়লো।

ইসলামী ফৌজের নিরাপত্তা বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন মোহাম্মদ এবনে মুসলেমা। আমর এবনে মাসউদ যখন ইহুদীদের থেকে বের হয়ে আসলো তখন তিনি বললেন, 'তুমি কে?' আমর এবনে মাসউদ তার পরিচয় দেয়। মোহাম্মদ এবনে মুসলেমা বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে সম্মানিত ব্যক্তিদের সংসর্গ থেকে বঞ্চিত করোনা। এরপর আমর এবনে মাসউদকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমর ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং সেখানে রাত্রি যাপন করলো। সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ জানত না সে এতক্ষণ কোথায় ছিল।

যাহোক, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক তাকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে রক্ষা করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করে যে, আমাদের ব্যাপারে আবু লোবাবা (রাঃ)-এর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই, আপনি তাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করুন।

হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) হযরত আমর এবনে আওফ (রাঃ)-এর বংশের লোক ছিলেন এবং ইহুদী আওস গোত্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু লোবাবা (রাঃ)-কে তাদের নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানে পৌঁছলে ইহুদী পুরুষরা দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়, আর মহিলা ও শিশুরা তাঁর সম্মুখে কাঁদতে থাকে। এ অবস্থায় তাদের প্রতি তাঁর দয়া হয়। ইহুদীরা বললো, 'হে আবু লোবাবা! আমরা কি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কথায় দুর্গ থেকে বের হয়ে আসব? আপনার কি মত'? হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) মুখে বললেন, 'হ্যাঁ'। কিন্তু হাতে কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করলেন, অর্থাৎ তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।

হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি ঐ স্থান থেকে সরতে পারিনি। এমন সময় আমার অন্তরে একথা আসলো যে, আমি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) সেখান থেকে বের হয়ে মসজিদে আসলেন এবং মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন না এবং বললেন, 'আমি এ স্থান থেকে যাব না; হয় এখানেই আমার মৃত্যু হবে অথবা আল্লাহ পাক আমার গুনাহ মাফ করে দেবেন। আমি অঙ্গীকার করছি যে, বনু কোরায়জার এলাকায় আর কখনো যাব না'। হযরত আবু লোবাবার (রাঃ) এ ঘটনা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানানো হয় তখন তিনি এরশাদ করলেন, তাকে এ অবস্থায় থাকতে দাও, যে পর্যন্ত আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তার ব্যাপারে কোন আদেশ না আসে। যদি সে আমার কাছে আসত তবে আমি তার ক্ষমা লাভের জন্যে দোয়া করতাম কিন্তু সে আমার নিকট আসেনি, নিজেই চলে গেছে। অতএব তার বিষয় এখন আল্লাহ পাকের দরবারে ছেড়ে দাও, আর এ সম্পর্কেই পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াত নাজিল হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

এরপর হযরত আবু লোবাবা (রাঃ)-এর তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কীয় ওহী নাজিল হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) ঘরে ছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাসির শব্দ শুনেছি, তাই আমি আরজ করেছি, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক

ছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাসির শব্দ শুনেছি, তাই আমি আরজ করেছি, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক আপনাকে সর্বদা হাসি-খুশী রাখুন, আপনি কি কারণে হাসছিলেন, তিনি এরশাদ করেন, আবু লোবাবার (রাঃ) তওবা কবুল হয়েছে। আমি আরজ করলাম, আমি কি তাঁকে এই সুসংবাদ দেব? তিনি এরশাদ করলেন, তোমার ইচ্ছা হলে তুমি তা করতে পার। তখন আমি উঠলাম, ঘরের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছলাম (এ ঘটনা পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বের) এরপর বললাম, 'আবু লোবাবা! তোমাকে সুসংবাদ, আল্লাহ পাক তোমার তওবা কবুল করেছেন'। একথা শ্রবণ করা মাত্র লোকেরা তাঁকে খুলে দেয়ার জন্যে দৌড়ে গেল। তখন হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমাকে কেউ যেন না খুলে দেয়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দস্তে মোবারকে আমাকে খুলবেন'। ফজরের নামাজের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে আগমন করলেন এবং আবু লোবাবাকে (রাঃ) মুক্ত করে দিলেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মুসলমানগণ বণী কোরায়জাকে ২৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। দীর্ঘ অবরোধের কারণে তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে দেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিদের্শে তারা দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে। তাদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হয়। মোহাম্মদ এবনে মুসলেমাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে একদিকে সরিয়ে নেয়া হয়। আর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)-এর উপর। এরপর তাদের আসবাবপত্র একত্রিত করা হয়। এর মধ্যে ছিল ১৫০০ তরবারি, তিনটি বর্ম, দু' হাজার বল্লম, দেড় হাজার চামড়ার ছোট ছোট ঢাল এবং অন্যান্য অনেক ঘরোয়া আসবাবপত্র। এতদ্ব্যতীত, বহু উট এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু পাওয়া যায়। এসব মালামাল একত্রিত করা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আউস গোত্র হাযির হয় এবং আরজ করে, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি জানেন যে, খাযরাজের সর্দার এবনে উবাইয়ের সঙ্গে বণী কিনকা গোত্রের শান্তি চুক্তি ছিল। খাযরাজ গোত্রের কারণে আপনি তিনশত বেসামরিক এবং চারশত সামরিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আর এরা হলো সে সব লোক যাদের সঙ্গে আমাদের শান্তি চুক্তি রয়েছে। আমাদের কারণে দয়া করে তাদেরকে মাফ করে দিন'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নীরব ছিলেন। যখন তারা বারংবার অনুরোধ করছিলেন তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি পছন্দ করবে না যে তোমাদেরই একজনের উপর এদের সম্পর্কে ফয়সালার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক'। তখন আউস গোত্রের লোকেরা বললেন, 'অবশ্যই'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'এদের সম্পর্কে ফয়সালা সা'দ এবনে মাআজের (রাঃ) দায়িত্বে অর্পণ করা হলো'।

বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'তোমরা এদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার জন্যে আমার সাহাবাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে মনোনীত

কর'। তারা তখন হযরত সা'দ এবনে মাআজকে (রাঃ) মনোনীত করলো।

রশীদা নাম্নী একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। আর যে আহত ব্যক্তির দেখা-শোনার কেউ থাকতো না তিনি তারও পরিচর্যা করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ-ক্রমে তাঁকে মসজিদের অভ্যন্তরেই তাঁবু দেয়া হয়। হযরত সা'দ (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছিলেন তাঁকে ঐ তাঁবুতে রাখতে, যাতে করে তাঁর দেখা-শোনা সহজ হয়। বণু কোরায়জার অবরোধের সময়ও হযরত সা'দ (রাঃ) রশীদার তাঁবুতেই অবস্থান করছিলেন। যখন বণী কোরায়জার ব্যাপারে হযরত সা'দ (রাঃ)-কে বিচারক মনোনীত করা হয় তখন আউস গোত্রের লোকেরা এখানেই তাঁর নিকট আসে। তাঁকে একটি গাধার উপর আরোহণ করানো হয়, সে গাধার উপর প্রথমে কাপড় তার উপর কম্বল রাখা হয়। গাধার লাগামটিও খেজুর গাছের আঁশের রশির তৈরী ছিল। আউস গোত্রের লোকেরা হযরত সা'দের (রাঃ) চারপার্শ্বে ছিলেন। পথিমধ্যে হযরত সা'দকে (রাঃ) তাঁরা বললেন যে, আবু আমর! আপনার ভাইদের সম্পর্কে ফয়সালার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আপনার প্রতি, যাতে করে তাদের ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আশা করি আপনি তাদের প্রতি কঠোর হবেন না। আপনি দেখেছেন এবনে উবাই তার হালীফদের সঙ্গে কত ভাল ব্যবহার করেছিলেন! তারা হযরত সা'দ (রাঃ)-এর নিকট বণী কোরায়জার পক্ষে সুপারিশ করছিলেন। কিন্তু তিনি নীরব ছিলেন। তাঁরা যখন এক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করছিলেন তখন তিনি বললেন, 'এখন 'সা'দের জন্যে সময় এসে গেছে যে সে আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কোন সমালোচকের সমালোচনাকে পরোয়া করবে না'। একথা শ্রবণ করে যাহ্যাক এবনে খলীফা এবনে সা'বাল আনসারী এবং আরও কিছু লোক একথা বলে উঠলেন, 'হায় আক্ষেপ! এ গোত্রের ধ্বংস এসে গেছে'। হযরত সা'দ (রাঃ)-এর কথা তখনও আউস গোত্রের নিকট পৌঁছেনি, যাহ্যাক বণী কোরায়জাকে তাদের সম্পর্কে মৃত্যুদণ্ডের খবর দেয়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ (রাঃ) যখন মসজিদের নিকট পৌঁছলেন অর্থাৎ সেই মসজিদের নিকট যেখানে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের সময় নামাজ আদায় করেছিলেন, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তোমরা নিজেদের সর্দারের সম্বর্ধনার জন্যে দাঁড়াও'।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে তিনি এরশাদ করেছেন, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম, তার জন্যে দাঁড়াও'।

মোহাজেরগণ মনে করেছেন এ আদেশ শুধু আনসারের জন্য। আর আনসারগণ বলতেন, এ আদেশ সকল মুসলমানের জন্যে।

বণী আবদুল আশআল বর্ণনা করেন, আমরা এ আদেশ পালনার্থে দু'টি কাতারে বিভক্ত হয়ে দণ্ডায়মান হলাম।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'হে সা'দ! তাদের ব্যাপারে ফয়সালা কর'। হযরত সা'দ (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফয়সালা করার অধিক হক্বদার'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'আল্লাহ পাকই তোমাকে আদেশ দিয়েছেন, যাদের সঙ্গে তোমার শান্তি চুক্তি রয়েছে তাদের সম্পর্কে তুমি ফয়সালা কর, আর ভালভাবে কর'। হযরত সা'দ (রাঃ) আওস গোত্রের আনসারদেরক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি বণী কোরায়জার ব্যাপারে আমি যা ফয়সালা করবো তাতে রাযী আছে'? তারা সকলে বললো, 'হ্যাঁ, আমরা তখনও রাযী ছিলাম যখন আপনি এখানে ছিলেন না, আমরা আপনাকেই এজন্যে নির্বাচন করেছিলাম, আর আমাদের এই আশা ছিল যে আপনি আমাদের প্রতি এই এহসান করবেন, যেমন অন্যরা অর্থাৎ এবনে উবাই বণী কিনকা গোত্রের সাথে করেছিল'। হযরত সা'দ (রাঃ) বরেছেন, 'তোমরা কি আল্লাহ পাকের নামে অঙ্গীকার করে বলছো যে আমার ফয়সালা অবশ্য বাস্তবায়নযোগ্য মনে করবে'? সকলে বললো 'হ্যাঁ'। তখন যেদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরিফ রাখছিলেন সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এই ফয়সালা কি তাঁদের প্রতিও হবে যারা এদিকে রয়েছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'হ্যাঁ', তখন সা'দ (রাঃ) বললেন, 'আমি ফয়সালা করছি বণী কোরায়জার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করা হোক এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে বাঁদি-গোলামে পরিণত করা হোক, তাদের অর্থ-সম্পদ বন্টন করা হোক এবং তাদের বাড়ী-ঘরগুলো মোহাজের ও আনসারদেরকে প্রদান করা হোক'।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেন, 'তুমি ফয়সালা আল্লাহ পাকের সে হুকুম মোতাবেক করেছ যা তিনি সপ্তম আসমানের উপর থেকে নাজিল করেছেন'।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'রাতের শেষ প্রহরে আমার নিকট এই হুকুম নিয়ে ফেরেশতা এসেছিল'।

হযরত সা'দ (রাঃ) আহযাবের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! যদি কোরায়েশের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকে তবে আমার এ যখমকে আমার শাহাদাতের কারণ বানিয়ে দাও। কিন্তু বণু কোরায়জার ধ্বংস দেখে যে পর্যন্ত আমার নয়ন যুগল সুশীতল না হয়, সে পর্যন্ত আমার মৃত্যু দিওনা'।

আল্লাহ পাক বণী কোরায়জার শোচনীয় পরিণাম দেখিয়ে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর নয়ন যুগলকে সুশীতল করেছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে ৬ জিলহজ্জ, রোজ বৃহঃস্পতিবার প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর আদেশ মোতাবেক রামলা বিনতে হারেসের বাড়ীতে ইহুদীদেরকে বন্দী রাখা হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকালে বাজারের দিকে গমন করেন এবং সেখানে গর্ত খননের আদেশ দেন, সাহাবায়ে কেরাম গর্ত খনন করতে লাগলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানেই অবস্থান

করলেন, এরপর ঐ গর্তের মধ্যে ইহুদীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। হযরত আলী এবনে আবি তালেব (রাঃ) এবং হযরত জোবায়ের এবনে আওয়াম (রাঃ) তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।

কা'ব এবনে আসাদকে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হয় তখন তাকে লক্ষ্য করে তিনি এরশাদ করলেন, 'এবনে জাওয়াস তোমাকে কি নসিহত করেছিল? সে তোমাকে আমার সম্পর্কে সত্য কথা বলেছিল কিন্তু তুমি তার নসিহত দ্বারা উপকৃত হওনি, সে কি তোমাকে বলেনি যে তুমি আমার অনুসরণ করবে, আর একথাও কি বলেনি যে, যদি আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাত হয় তবে তার তরফ থেকে আমাকে সালাম পৌঁছাবে'।

কা'ব বললো 'অবশ্যই হে আবুল কাসেম! তৌরাতের শপথ! তিনি একথাই বলেছিলেন। যদি আমার এ আশংকা না হতো যে ইহুদীরা আমাকে লজ্জা দেবে এবং বলবে, 'তুমি তলোয়ার দেখে ভয় করেছ তবে আমি অবশ্যই আপনার অনুসরণ করতাম, কিন্তু এখন তো ইহুদী ধর্মেই আছি',। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে থাকে। আর এসব কিছু হযরত সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ)-এর সম্মুখেই হয়েছে, আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছেন।

প্রিয়নবী (দঃ)-এর বিস্ময়কর বদান্যতা

মোহাম্মদ এবনে এসহাক জুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বর্বরতার যুগে বোয়াসের যুদ্ধের দিন জোবায়ের এবনে বাতা কারজী যার উপনাম ছিল আবদুর রহমান, সে সাবেত এবনে কায়েস এবনে সাম্মাস নামক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এবং হত্যা বা গোলামে পরিণত না করে তার চুল কেটে ছেড়ে দেয়।

বণী কোরায়জার এ পরিণতির সময়ে জোবায়ের কারজী অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল, সে ছিল ইহুদী, আর এদিকে সাবেত (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি জোবায়ের কারজীকে বললেন, 'হে আবু আবদুর রহমান! তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ'? সে বললো, 'আমার মত লোক আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে চিনবেনা এমন হতে পারে'? সাবেত (রাঃ) বললেন, 'আপনি আমার প্রতি যে এহসান করেছেন, আমি আজ আপনাকে সে এহসানের বদলা দিতে চাই'। জোবায়ের বললো, 'শরীফ লোকেরা কল্যাণের বদলে কল্যাণই করে'। এরপর সাবেত (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন, 'আমার প্রতি জোবায়রের একটা এহসান ছিল, আমি চাই তার বদলা দিয়ে দেই, ইয়া রসূলাল্লাহ! জোবায়েরের প্রাণ আমাকে দিয়ে দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ করলেন, 'দেয়া হলো'।

সাবেত (রাঃ) এ অধিকার নিয়ে জোবায়েরের নিকট আসলেন এবং বললেন, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার জন্যে তোমার প্রাণ দন্ড মওকুফ করে দিয়েছেন'।

জোবায়ের বললো, 'একজন বৃদ্ধ যার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কিছুই জীবিত নেই, সে জীবিত থেকে কি করবে'? একথা শ্রবণ করে সাবেত (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! জোবায়েরের পরিবারবর্গকে মাফ করুন', তিনি এরশাদ করলেন, 'তা-ও তোমাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে'। সাবেত (রাঃ) জোবায়েরের নিকট গিয়ে বললেন, 'হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমার পরিবারবর্গও আমাকে দান করেছেন, এখন আমি তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি'। জোবায়ের বললেন, 'যে পরিবার আরবে বাস করে এবং তাদের নিকট কোন অর্থ সম্পদ থাকে না, তারা কিভাবে বাঁচবে'? সাবেত (রাঃ) পুনরায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! তার অর্থ সম্পদ দিয়ে দিন। তিনি এরশাদ করলেন, 'তা-ও তোমাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে'। সাবেত (রাঃ) জোবায়েরকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাকে তোমার অর্থ সম্পদও দিয়ে দিয়েছেন'। জোবায়ের বললো, 'সে সুন্দর আয়নাটি কোথায় যার মধ্যে সমগ্র গোত্রের চেহারাটি দেখা যেত' অর্থাৎ কা'ব এবনে আসাদ। সাবেত বললেন, 'তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে'। জোবায়ের বললো, 'সে ব্যক্তিটি কোথায় যে এ শহরের সর্দার ছিল' অর্থাৎ হাই এবনে আখতাব। সাবেত বললেন, 'তাকেও মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে'। এভাবে কয়েকজন সম্পর্কে জোবায়ের জিজ্ঞাসা করলো, ইতোমধ্যে যাদের প্রাণদন্ড কার্যকর হয়েছে। তখন জোবায়ের বললো, 'আমাকেও তাদের কাছে পৌঁছে দাও, আল্লাহর শপথ! তাদের পরে আর জীবনের কোন স্বাদ রয়নি। যে ঘরে তারা বাস করতো সে ঘরে গিয়ে আমি বাস করবো, এটা সম্ভব নয়। কিন্তু সাবেত আমার পরিবারবর্গের দিকে লক্ষ্য রেখ, তোমার সাথীর নিকট আবেদন করো, যেন তাদেরকে মুক্তি দেয় এবং তাদের অর্থ-সম্পদ দিয়ে দেয়'। সাবেত (রাঃ)-এর আবেদনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জোবায়েরের পরিবারকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে দেন, শুধু অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দেয়া হয়। জোবায়ের বললো, 'তোমার উপর আমার যে হক্ব রয়েছে তার কথা মনে করিয়ে বলছি, আমাকে অতি শীঘ্র আমার বন্ধুদের নিকট পৌঁছে দাও, আমি আর বিলম্ব সইতে পারছিনা'।

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, সাবেত (রাঃ) বললেন, 'হে জোবায়ের! তোমাকে হত্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা, আমি কিভাবে তোমাকে হত্যা করবো'? জোবায়ের বললো, 'কে আমাকে হত্যা করলো, আমার নিকট এর কোন গুরুত্বই নেই, তোমার হাত দিয়ে বা অন্য কারো হাত দিয়ে- এতে কোন তফাত নেই'। অবশেষে হযরত জোবায়ের এবনে আওয়াম (রাঃ) তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। জোবায়ের কারজী বলেছিল যে আমাকে আমার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দাও। হযরত আবু বকর (রাঃ) জোবায়েরের একথা শ্রবণ করে বলেছিলেন, 'দোযখের আগুনে তার বন্ধুদের সাথে সর্বদাই সাক্ষাত করতে থাকবে'।

হযরত সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ) প্রসঙ্গে

বণী কোরায়জা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত সা'দ এবনে মাআজ

(রাঃ)-এর উপর। আর এ দায়িত্ব আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে অর্পিত হয়। তাই তাঁর গুরুত্ব বর্ণনাতীত। হাদীস শরীফে তাঁর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন হযরত সা'দ (রাঃ)-এর জানাযা ওঠানো হয় তখন মুনাফেকরা বলে, তাঁর জানাযা কত হালকা! তাদের একথার কারণ হলো, বণী কোরায়জা সম্পর্কে হযরত সা'দই (রাঃ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

কারণ এ-ও যে, বণী কোরায়জা প্রশ্নে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন সেজন্যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ খবর পৌঁছে যে তাঁর জানাযা ফেরেশতাগণ তুলেছেন। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি, হযরত রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'সা'দ এবনে মাআজের মৃত্যুর কারণে আল্লাহ পাকের আরশের মধ্যে কম্পন হয়েছে'। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কাপড়ের একটি জোড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাদীয়া স্বরূপ এসেছে। সাহাবায়ে কেরাম তা স্পর্শ করে দেখলেন কাপড়টি অত্যন্ত মোলায়েম এবং তাঁরা এজন্যে আশ্চর্যন্বিত হলেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা এর উপর বিস্মিত হয়েছ, অথচ জান্নাতে সা'দ এবনে মাআজের (রাঃ) রুমাল এর চেয়ে অনেক উত্তম এবং অনেক মোলোয়েম।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا

"আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি এবং ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছেন, এমন ভূমি যা তোমরা এখনো পদানত করোনি। আর আল্লাহ পাক সর্বোপরি, সর্বশক্তিমান"।

হযরত সা'দ এবনে মাআজের (রাঃ) রায় অনুযায়ী বনু কোরায়জা গোত্রের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দ্বারা মুসলমানদের জীবিকার সংস্থান করা হয়। মুসলমানগণ যে স্থানকে এখনো পদানত করেননি; সে স্থান তাদের হস্তগত হয়।

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

"আর আল্লাহ পাক সব কিছু করতে সক্ষম"।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যে জমীনের উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা আলোচ্য আয়াতে রয়েছে তা হলো রুম এবং পারশ্য সাম্রাজ্য। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, মুসলমানগণ কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু অর্জন করবেন, তা-ই এর দ্বারা উদ্দেশ্য

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২০৫

করা হয়েছে। অথবা বণী কোরায়জাকে বহিঃস্কার করার পর যে স্থান শূন্য হয়েছে, সে স্থানই এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ
ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَٰنِسَآءَ
ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ
لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৮) হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন এবং এখানকার সৌন্দর্য-শোভা কামনা কর তবে এস, আমি তোমাদেরকে ভোগ করার মত কিছু দিয়ে দেই এবং ভদ্রভাবে তোমাদেরকে বিদায় দান করি।

(২৯) আর যদি তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল এবং আখেরাত কামনা কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ পাক নেককার রমনীদের জন্যে বিরাট পুরস্কার রেখেছেন।

(৩০) হে নবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, (আল্লাহ পাকের তরফ থেকে) তাকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। আর আল্লাহ পাকের পক্ষে তা অতি সহজ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কোনভাবে কষ্ট না দেয়ার নির্দেশ ছিল। মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যেভাবে কষ্ট দিত, তার উল্লেখ ছিল। আলোচ্য আয়াত সমূহে ঘটনাচক্রে উম্মাহাতুল মোমেনীন তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের তরফ থেকে যে কষ্ট হয়েছিল, তার উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করেননি কিন্তু তাঁরা খোরপোষের বরাদ্দ বৃদ্ধি করার যে আবদার করেছিলেন, তাতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল।

শানে নজুল

ঘটনার বিবরণ এই, বণী কোরায়জা এবং বণী নজিরের যুদ্ধের পর উম্মাহাতুল মোমেনীন লক্ষ্য করলেন, মুসলমানগণ অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছেন, আর্থিক অনটন বহুলাংশে লাঘব হয়েছে, তাই তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাঁদের খোরপোষের বরাদ্দ আরো বৃদ্ধির প্রস্তাব করলেন। তাঁদের এ প্রয়াস প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অপছন্দনীয় হলো, তিনি মনক্ষুন্ন হয়ে একমাস পর্যন্ত কারো কক্ষে যাবেন না বলে শপথ করেন এবং পার্শ্ববর্তী একটি কক্ষে অবস্থান করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ অসন্তুষ্টির কারণে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। বিশেষতঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) অত্যধিক ব্যাকুল হলেন। কেননা, তাঁদের উভয়ের কন্যাই ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের প্রতি এভাবে অসন্তুষ্ট থাকেন তবে তাঁদের দুনিয়া আখেরাত দু' জাহান বিনষ্ট হবার আশংকা রয়েছে, তাই তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্যে সচেষ্ট হন। এ অবস্থায় দীর্ঘ একটি মাস অতিবাহিত হলো। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।[১]

যদিও খোরপোষের বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দাবী করা অবৈধ ছিলনা কিন্তু নবীর জীবন-সঙ্গিনীগণের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ বা আগ্রহ সৃষ্টি হোক এ অবস্থা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ছিল অসহনীয়, আর এ কারণেই আলোচ্য ঘটনা ঘটেছে।

দুনিয়া ও আখেরাত

মূলতঃ দুনিয়া ও আখেরাত ক্ষেত্র বিশেষে একটি আরেকটির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। আখেরাত কাম্য হলে দুনিয়ার অনেক কিছুই বর্জনীয় হয়ে পড়ে। আর দুনিয়া কাম্য হলে আখেরাতের অনেক বিষয় থেকেই বঞ্চিত হতে হয়। তাই যাঁদেরকে 'মোমেনদের জননী' উপাধি দেয়া হয়েছে, তাঁদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠেও যেন দুনিয়ার প্রতি কোন প্রকার আসক্তি না থাকে, তারই ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

"হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে আপনি বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন এবং এখানকার সৌন্দর্য-শোভা কামনা কর তবে এস, আমি তোমাদেরকে ভোগ করার মত কিছু দিয়ে দেই এবং ভদ্রভাবে তোমাদেরকে বিদায় দান করি"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, যদি তোমরা দুনিয়ার জীবনের

১। তফসীরে কুরতবী, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৬২-৬৩
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৮০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা উদ্রিস কান্দলবী (র), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৯-৮০

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-উল্লাস, আরাম-আয়েশ, মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছেদ, সৌন্দর্য উপকরণ, অলংকার প্রভৃতি কামনা কর তবে আমি তোমাদেরকে ভদ্রভাবে বিদায় দিতে প্রস্তুত রয়েছি, কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ ক্ষণস্থায়ী জগতের লোভ-লালসা থেকে দূরে রেখেছেন। এমন অবস্থায় আল্লাহর নবীর সঙ্গে তোমাদের অবস্থান শান্তিপূর্ণ হবেনা, অতএব তোমাদেরকে ভদ্রভাবে বিদায় দেয়াই হবে সমীচিন। তখন তোমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পার এবং তোমাদের কাম্যবস্তু অর্জনে স্বচেষ্ট হতে পার, আর দুনিয়া-ত্যাগী হবার জন্যে তোমাদেরকে আমি বাধ্য করতে চাই না।

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ

আর যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি কামনা কর, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-সঙ্গিনী থাকার গৌরব লাভ করতে চাও এবং আখেরাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভে ধন্য হতে চাও তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দুনিয়া-ত্যাগী হয়ে সবর অবলম্বন কর। দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী না থাকার কারণে কখনও আক্ষেপ করোনা। একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক পূণ্যবতী স্ত্রীদের জন্যে মহান পুরস্কার রেখে দিয়েছেন যা তোমরা অবশ্যই লাভ করবে। এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-সঙ্গিনী হবার গৌরবের চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে!

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নয়জন স্ত্রী ছিলেন, পাঁচজন কোরায়েশী, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত হাফসা (রাঃ), আবু সুফিয়ানের কন্যা হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ), উমাইয়ার কন্যা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ), জামআ'র কন্যা হযরত সওদা (রাঃ), অবশিষ্ট চারজন অ-কোরায়েশী স্ত্রী হলেন জাহাশের কন্যা হযরত জয়নাব (রাঃ), হারেস হেলালীর কন্যা হযরত মায়মুনা (রাঃ), হাই এবনে আখতাবের কন্যা সফিয়্যা (রাঃ) এবং হারেস মোস্তালিকের কন্যা জোয়াইরিয়া (রাঃ)। আলোচ্য আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বগৃহে তশরিফ নিয়ে গেলেন এবং সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে আল্লাহ পাকের এ ঘোষণা শুনিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) অনতিবিলম্বে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্টি কামনা করলেন। দুনিয়ার জীবনের মায়া-মোহ পরিহার করলেন এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর অনন্ত অসীম নেয়ামতকে প্রাধান্য দিলেন। এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করলেন এবং তাঁর চির সাহচর্য লাভে ধন্য হলেন। অন্যান্য স্ত্রীগণও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অনুসরণ করে বললেন, তাঁরাও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করেছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি শুধু তাঁদের মুখের কথা ছিলনা;

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮১-৮২
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৫৫

বরং তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের কৃত অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন।[১]

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

"হে নবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, (আল্লাহ পাকের তরফ থেকে) তাকে দ্বিগুণ আজাব দেয়া হবে"।

মোমেন-জননীগণ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তখন আল্লাহ পাক তাঁদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে নসিহত করলেন এভাবে; হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের অবস্থান পৃথিবীর সমস্ত নারীদের উপর, তোমাদের প্রাধান্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, দুনিয়া-আখেরাত দু' জাহানে যিনি সর্বোত্তম, তোমরা তাঁরই জীবন-সঙ্গিনী, অতএব তোমাদের মর্যাদা যেমন সর্বোচ্চে, ঠিক তেমনি তোমাদের ভুল-ভ্রান্তিও অত্যন্ত বিপদজনক। তোমরা যদি কোন পাপকার্যে লিপ্ত হও তবে অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হবে। কেননা তোমাদের পাপ কার্যে প্রথমতঃ আল্লাহ পাকের নাফরমানী হয়, দ্বিতীয়তঃ তোমাদের পাপকার্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়। তাই তোমাদের শাস্তিও হবে অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণ।

وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا

আর এ দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান আল্লাহ পাকের পক্ষে অতি সহজ। তোমাদের এ সম্মান, মর্যাদা তথা আল্লাহর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) স্ত্রী হওয়া এবং তাঁর সাহচর্য লাভের ধন্য হওয়া তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করবেনা।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৪ মোতাবেক ১৪ রজব, ১৪১৫ হিঃ রোজ শনিবার রাত-১১-১০ মিঃ তফসীরে নূরুল কোরআনের একুশতম খণ্ডের রচনা সমাপ্ত হলো। আল্লাহ পাকের দরবারে এজন্যে অগণিত শোকর, হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনাকে এবং তফসীরে নূরুল কোরআনকে সুসম্পন্ন করার তওফিক দান কর, তোমার খাছ রহমতে ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দিও, আমীন।